শিশু-মন

রমেশ দাশ

এম. এ., পি-এইচ্. ডি. (লণ্ডন)

ভোলানাথ প্রকাশনী

৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন• কলিকাতা-৬

প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশ
৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

পঞ্চম সংস্করণ—১৯৫২

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মৃণাল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর
শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য
জোনাকি প্রেস
৭৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺ভোলানাথ দাশ মহোদয়ের

পুণ্য স্মরণে—

ভূমিকা

সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করিতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ কার্যকরী সে কথা আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। শিক্ষা, শিল্প এবং মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা ব্যাপারে আধুনিক মনোবিদ্যার দান অপরিসীম। শিল্প ও মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষাদান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য। কারণ প্রত্যেক গৃহেই পিতামাতাকে পুত্রকন্যাকে শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হয়। শিশুমন সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিদ্যা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করিয়াছে সেগুলি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা আজকাল আর সম্ভব নয়।

রমেশ দাশ ছাত্রাবস্থায় শিশুমন ও শিশুশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছিল এবং অধীত বিদ্যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের অভিজ্ঞতাও তার যথেষ্ট আছে। এই পুস্তকখানিতে রমেশ শিশুমন ও শিশু-শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত তথ্যই সহজ সরল ভাষায় অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আমি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। পিতামাতা এবং শিক্ষাব্রতী মাত্রেই যে এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেরূপ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিতভাবে বিষয়গুলি আলোচিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় পুস্তক-খানি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও অনুমোদন করা যায়।

স্নেহভাজন রমেশকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তাহার শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হউক এবং তাহার শ্রম সফল হউক, ইহাই কামনা করি।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে — সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

২৭ জানুয়ারী, ১৯৫২ — অধ্যক্ষ, মনস্তত্ত্ব বিভাগ

প্রাক্ কথা

শিশু-মন আমার সর্ব প্রথম রচনা ; আমার সাহিত্য আরাধনার প্রথম অর্ঘ্য। শিশু-লালনে সহায়তা করবার যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছিলাম বাংলা দেশের জনক-জননী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কাছে সেটি আদৃত হয়েছে দেখে আমার সেই উদ্দেশ্যটিকে বহুল পরিমাণে সফল বোধ করছি।

শিশু-মন রচনার পশ্চাতে কিঞ্চিত ইতিহাস আছে। আনন্দমেলার পরিচালক স্বর্গত বিমল ঘোষ আমার অগ্রজ-প্রতিম "মৌমাছি" ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্ হলে সমাজ-সেবী, আনন্দমেলার কর্মী ও উৎসাহী অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জন্য শিশু-মন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেবার সময় শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যে উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছিলাম এবং তাঁদের বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে প্রেরণা লাভ করেছিলাম তা-ই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের জন্য শিশুমনস্তত্ত্বের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করতে। আনন্দমেলার তৎকালীন একজন বিশিষ্ট কর্মী নির্মল চৌধুরী (বুদ্ধুভুতুম) তখন নামমাত্র মূল্যে শিশু-লালন সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশ করবার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর অনুরোধে 'শিশু-লালনী গ্রন্থমালা'-র প্রথম পুস্তিকাটি আমি রচনা করি। পুস্তিকাটির নাম 'শিশু ও শৈশব'। এই পুস্তিকাটিকে সমাদৃত হতে দেখে শিশু-লালনের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় আরও বেশী তথ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করবার প্রেরণা অনুভব করি। শিশু-মন সেই প্রেরণারই ফসল। মৌমাছির স্নেহ আর বুদ্ধুভুতুমের উৎসাহের পটভূমিকাতেই শিশু-মনের জন্ম।

শিশু-মনের ভূমিকাটি লিখে দিয়েছিলেন আমার পরমারাধ্য গুরুদেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গত অধ্যাপক সুহৃদ চন্দ্র মিত্র, এম. এ., ডি. ফিল (লাইপজিগ্) এফ এন আই. মহোদয়। তাঁর আদর্শ চরিত্র ও প্রগাঢ় প্রজ্ঞার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। আমার শিশু-মন তাঁর আশীর্বাদধন্য একথা চিন্তা করে আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করি।

শিশু-মনের প্রথম দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেন সাইণ্টিফিক্ বুক এজেন্সী। পরবর্তী সংস্করণগুলি ভোলানাথ প্রকাশনী দ্বারা প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে যে চিত্রগুলি গ্রথিত হয়েছে সেগুলি এঁকে দিয়েছেন আমার স্নেহভাজন অধ্যাপক অশোককুমার বসাক ও শিল্পী সুনীত সেন।

সমীর বোস, তপন বসুমল্লিক, অনিল মিত্র, রণন ব্যানার্জী, ললিত সেন, রামেন্দু দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ও শিবপ্রসাদ সিংহ গ্রন্থটি রচনায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন।

আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও গবেষণাতিরিক্ত যে সব তথ্য শিশুমনে পরিবেশিত হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। তাদের মধ্যে E. A. Kirkpatrick-রচিত Fundamentals of Child Study, C. E. Skinner ও P. L. Harriman-সম্পাদিত Child Psychology—Child Development and Modern Education., M. Collins ও J. Drever-রচিত Experimental Psychology, H. E. Garrett-রচিত Great Experiments in Psychology, N. L. Munn-রচিত Psychology—The Fundamentals of Human Adjustment, Susan Issacs-রচিত The Nursery Years—The Mind of The Child From Birth to Six Years ও Willium Moodie-প্রণীত Child Guidance বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রমেশ দাশ

পঞ্চম সংস্করণের প্রস্তাবনা

শিশু-মনের জন্ম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, ১৯৫২ সালে। ইংরেজী মতে গ্রন্থখানি তার মুক্তা জয়ন্তী উৎসব (Pearl Jubilee) পালনের সবিনয় দাবি রাখতে পারে। তার এই দীর্ঘ জীবনের তথা জনপ্রিয়তার জন্য শিশু-মন সমস্ত শিশু-অনুরাগী বাঙালী পাঠক পাঠিকার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বর্তমান সংস্করণটিকে শিশু-মনের মুক্তা জয়ন্তী সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই সংস্করণে পুরোনো বিষয়গুলির কিছু কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। নতুন বিষয়গুলির মধ্যে দু-একটি বাদ দিয়ে বাকীগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রদীপ, দ্বৈপায়ন, আলিপুর বার্তা, পুর্বাদ্রি, পর্ষদ বার্তা, চিত্ত ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশু-মন আশা রাখে তার বর্তমান সংস্করণটিও শিশু-অনুরাগী সমঝদার বাঙালী পাঠক-পাঠিকা তথা মাতা-পিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-চিকিৎসক ও শিশু-গবেষকদের সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

রমেশ দাশ

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

শিশুরাই জাতির ভাগ্য-বিধাতা। আজ যারা শিশু তারাই ভাবীকালের সমাজ-নায়ক, রাষ্ট্র-চালক, শিল্পী, বিজ্ঞানী। ভবিষ্যৎ যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে, তার বিপুল সম্ভাবনাটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বর্তমানে যারা শিশু তাদেরই ভেতর। সুতরাং শিশুর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক অতি নিবিড় সেই বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও পরিচালক-পরিচালিকাদের দায়িত্ব অতিশয় গুরু। তাঁদেরই ওপর নির্ভর করছে একটি বিরাট সম্ভাবনার সফলতা-বিফলতা। একটি বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি করতে হলে ক্ষুদ্র বীজটিকে অযত্ন করলে চলবে না। কোমল মাটি, স্নিগ্ধ জল, উজ্জ্বল আলোক, পরিমিত উত্তাপ, পর্যাপ্ত বাতাস দিয়ে একটি পরিপাটি পরিবেশ রচনা করতে হবে। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখীর শত্রুতা থেকে বীজটিকে রক্ষা করতে হবে। ঠিক তেমনি একটি শিশুর মধ্যে যে বিপুল ইঙ্গিত আছে তাকে রূপায়িত করে তুলতে হলে অনেক যত্ন, অনেক চেষ্টা, অনেক সতর্কতা, সাধ্যসাধনার প্রয়োজন। ছোট বলে শিশুকে অবহেলা করলে বা যথাযথভাবে তার প্রতি আচরণ না করলে, শিশু ও সমাজ উভয়েরই ভাগ্য হবে বিড়ম্বিত। সুতরাং শিশুর প্রতি সকলেরই সযত্ন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমাদের এতটুকু অসতর্কতা, আমাদের আচরণের এতটুকু অসামঞ্জস্যের ফলে কত রাশি রাশি সম্ভাবনা যে অঙ্কুরাবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে! কত মহামূল্য সম্পদ আমরা নিজের হাতে যে অপচয় ক'রে ফেলছি সে কথা কেই বা জানে!

মানব সমাজে চিরকালই শিশুর আবির্ভাব হয়েছে, চিরকালই সমাজ শিশুদের লালনপালন ক'রে আসছে একথা খুবই সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভালো ক'রে শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে খুব অল্পদিন আগে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধমান দেশগুলিতে শিশুদের বিপজ্জনক অঞ্চল হতে সরিয়ে নিরাপদ পরিবেশে নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। হাজার হাজার বিভিন্ন বয়েসের ছেলেমেয়েকে তাদের চিরপরিচিত স্নেহবিজড়িত গৃহবেষ্টনী হতে বিচ্যুত করে একত্র সম্মিলিত করার ফলে তাদের হাবভাব আচার-আচরণে অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তখন কর্তৃপক্ষের নজর পড়ল শিশুদের ওপর। বিভিন্ন শিশু-সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা আহূত হলেন। এই সব বিজ্ঞানী শিশু-সমস্যাগুলির কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে শিশুমনের

বিচিত্র পরিচয় পেলেন। বিজ্ঞানীদের এই অভাবিত আবিষ্কার শিশুর মন সম্বন্ধে তাঁদের আরও বেশী কৌতূহলী ক'রে তুলল, শিশু-মনের ওপর নানা-রকম পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং গবেষণা চলতে লাগল। এই সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে যে সব মহামূল্য তথ্য আবিষ্কৃত হলো সেগুলিকে সংকলন ক'রে শিশু মনস্তত্ত্বের ওপর বড় বড় গ্রন্থ রচিত হলো। শিশু-মনের রহস্য উন্মোচন করার এই যে প্রয়াস এর শেষ আজও হয়নি—কোন কালে হবেও না, কারণ বিজ্ঞানের গতি কোনদিনই স্তব্ধ হয়ে পড়ে না, চিরকালই সামনের দিকে এগিয়ে চলে—যদিও সময় সময় এই গতি মন্থর হয়ে আসে।

আজ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিকেরা শিশু-মন সম্বন্ধে সে সব কথা বলেছেন সেগুলির ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে ইংলন্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি অত্যুন্নত দেশগুলিতে শিশুদের লালনপালন করা হয়। শিশুর শিক্ষা, চরিত্র-গঠন, সংশোধন সব কিছুই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও বিজ্ঞান-প্রীতির, এই রকম পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা আজ খুব বেশী।

শিশুর সঙ্গে যাঁরা মেলামেশা করেন একটু লক্ষ্য করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, শিশুদের মধ্যে এমন নানান রকমের সমস্যা রয়েছে যেগুলির সমাধান একান্তই দরকার। কোন একটি শিশু হয়তো নিতান্ত লাজুক, কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। মার আঁচল ছেড়ে বাহির-বিশ্বে বেরিয়ে আসবার শক্তি তার নেই। ইস্কুলে যাবার কথা উঠলেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর একটি শিশু হয়তো ভারি দুষ্টু। তার কোন কিছুরই অভাব নেই, অথচ সে অন্য ছেলেমেয়েদের বই চুরি ক'রে আনে, প্রতিবেশীর বাগানে গাছপালা ভাঙে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মারধোর করে। এই ধরণের আরও অনেক সমস্যা শিশুদের মধ্যে অহরহই দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিকেরা একটি বিষয়ে একমত যে জীবনের প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে মানুষ যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার উত্তর-জীবন। "Morning shows the day"—এ কথাটা খুবই বিজ্ঞান-সম্মত। বয়স্কদের চিন্তা, ধারণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের আচরণের স্বাভাবিকতা, সমাজ ও কর্মজীবনে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুরই শেকড় নিহিত আছে তাদের শিশু-মনের কোমল মৃত্তিকার ভেতর বহুবিচিত্র শৈশব অভিজ্ঞতার রূপ ধরে। সুতরাং একটি মানুষের জীবনে তার প্রথম পাঁচ ছয়টি বৎসর অতিশয় মূল্যবান। কিন্তু তার

এই অতি মূল্যবান সময়টি কী ভাবে অতিবাহিত হবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে তার মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং পরিচালক-পরিচালিকাদের ওপর—বিশেষ ক'রে তার মাতাপিতার ওপর। "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি"—পন্ডিতপ্রবরের এই মূল্যবান উপদেশ বাক্যটিকে কাজের ভেতর দিয়ে আমাদের চরিতার্থ ক'রে তুলতে হবে। শিশু-পালনের মহৎ উদ্দেশ্যটিকে সফল ক'রে তুলতে হলে শিশুমন সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা থাকা নিতান্তই দরকার।

শিশু-পাঠ পদ্ধতি

শিশু-মনস্তত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিলেও পাঠকের মনে সর্বপ্রথমে যে প্রশ্নটির সঞ্চার হয় তা হলো কী কী উপায়ে আমরা শিশু-মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ করতে সমর্থ হই। অর্থাৎ শিশু-মন পাঠ করার বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতিটা কেমন? যে যে পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে শিশুমনোবিজ্ঞানী শিশুর মনের বিজ্ঞান রচনা করেন সেগুলি যদি অভ্রান্ত না হয় তাহলে শিশুমনোবিজ্ঞান ভ্রান্তিমুক্ত হতে পারে না। সুতরাং শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশুর মন সম্বন্ধে কী কথা বলছেন শোনার আগে পাঠক স্বভাবতঃই জানতে চান কী ক'রে শিশুমনের গোপন খবরটা জানতে পেরেছেন তিনি সেইকথা। যাঁরা বয়স্ক তাঁরা ইচ্ছে করলেই নানাভাবে তাঁদের নিজেদের মনের খবর জানবার ও জানাবার জন্য বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করতে পারেন; কিন্তু আমরা সবাই জানি এ বিষয়ে বয়স্কদের সহায়তা অর্জন করতে গিয়েও বৈজ্ঞানিককে অনেক সময় হিমসিম খেতে হয়। তার কারণ বয়স্করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের মনের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করেন না, কারণ এসব কথা প্রকাশ পেলে তাঁদের আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বৈজ্ঞানিককে আপন মনের যে খবরটা পরিবেশন করেন সেটাও সত্যি নয়; নানা কারণে, হয় জ্ঞাতসারে না হয় অজ্ঞাতসারে, তাঁরা প্রায়শঃই আপন মনের একটা বিকৃত রূপ বৈজ্ঞানিকের সামনে তুলে ধরেন। যে সব ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে আমাদের সমাজবোধের প্রচণ্ড সংঘাত বাধে সেগুলো অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে বিসর্জিত হয়। আমরা তখন এই সব ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকি না বটে, কিন্তু তবু তারা নানাভাবে অহরহ আমাদের চিন্তা, কর্ম, অনুভূতি, স্মরণশক্তি ইত্যাদি যাবতীয় মানসিক কর্মকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ক'রে চলে। আপন আপন অবচেতন মনের উপাদানগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ সদিচ্ছা থাকলেও আমরা সহজভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীকে আমাদের আপন মনের গভীরতম প্রদেশের সঠিক খবর দিতে পারি না। মনঃসমীক্ষক নানাভাবে আমাদের মনকে বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের মনের গোপনতম খবরগুলি উদঘাটন করতে সমর্থ হন। বয়স্কদের মনের সংবাদ সংগ্রহ করা যদি এমন কঠিন হয় তাহলে স্বভাবতঃই সংশয় জাগে শিশুমন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সত্যি সম্ভবপর কিনা। যারা অতিশয় শিশু তারা তো কথাই বলতে পারে না। যারা কথা বলতে পারে তারা আবার সব সময় সকল কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। যারা গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাদের

সকল কথা আবার সব সময় সত্যি হয় না। তারাও ভয়ে ভাবনায় অথবা শিক্ষার প্রভাবে অনেক সময় সত্যি কথাটা প্রকাশ করে না। তদুপরি তাদের গভীরতম মন সম্বন্ধে তারাও বয়স্কদের মতোই অজ্ঞ। সুতরাং শিশুমনোবিজ্ঞানী শিশুমনের খবর পান কী ক'রে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশুমন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে অপরাপর বৈজ্ঞানিকেরই মতো প্রধানতঃ দুটি পন্থা অবলম্বন ক'রে থাকেন। পন্থা দুটির নাম (ক) পর্যবেক্ষণ ও (খ) পরীক্ষা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ ধরণের একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বয়সের বহু শিশুর বিশেষ বিশেষ আচরণ লক্ষ্য করার বৈজ্ঞানিক নাম শিশু-পর্যবেক্ষণ। শিশু জন্ম মুহূর্ত থেকে সুরু ক'রে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কী কী করে—কখন রাগ করে, কখন খুশী হয়, কখন চলতে শেখে, কখন বলতে শেখে, কখন কী ধরণের কথা বলে, কেমন ক'রে নতুন নতুন কাজ করতে শেখে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করলে শিশুর দেহ মনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। মোটামুটি একই রূপ পরিবেশে কিংবা পরিবেশের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রায় সকল শিশুই মোটামুটিভাবে দেহমনের পরিপুষ্টির একটা সাধারণ ধারা মেনে চলে বলে পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিশু-মনের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশু-মনোবিজ্ঞানী অনেক কিছু জানতে পারেন। পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং সকল পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক মূল্যও সমান নয়। আমরা প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে শিশুর সংস্পর্শে এসে থাকি এবং শিশুর সম্পর্কে আমাদের সকলেরই কোন না কোন রকম ধারণা আছে। শিশু সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের এই যে ব্যক্তিগত ধারণা তার মূলে আছে শিশু পর্যবেক্ষণজনিত আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই সব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সব সময় বিজ্ঞানসম্মত নাও হতে পারে। তার কারণ শিশুমন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যেই আমরা শিশুদের পর্যবেক্ষণ করি না। আমাদের ঘরে বাইরে, আমাদের পরিবেশে শিশুরা বিচরণ করে, তাই আমরা তাদের লক্ষ্য না ক'রে পারি না। কিন্তু শিশুদের লক্ষ্য করার পশ্চাতে আমাদের কোন সুচিন্তিত উদ্দেশ্য থাকে না বলেই তাদের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মায় সেটা আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং সাময়িক হতে বাধ্য। তাছাড়া আমরা যখন শিশুদের, বিশেষ ক'রে আপন আপন শিশুদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করি তখন তাদের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা ভালবাসা বশতঃ

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটি সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা তাদের কার্যকলাপের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা ক'রে থাকি। হৃদয়াবেগ ছাড়া আরও একটা কারণেও শিশুপর্যবেক্ষণ অনেক সময় কলুষিত হয়ে থাকে। সেটা হলো আমাদের পূর্বকল্পিত বিচিত্র ধারণা, অথবা বিভিন্ন উৎস হতে আহৃত বিবিধ সংস্কার। উদাহরণস্বরূপ, আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি শিশু স্বর্গের কুসুমের মতো নিষ্কলুষ; সে দেবদূতের মতো নির্মল ও নিষ্পাপ। পূর্বকল্পিত অনুরূপ ধারণা থাকার জন্যই আমরা অনেক সময় শিশুদের মধ্যে পাশব প্রেরণার যে সব অভিব্যক্তি ঘটে সেগুলোকে হয় লক্ষ্যই করি না, না হয় পুরোপুরি অস্বীকার করি। শিশুও বয়স্কদের মতোই মানব-সুলভ সমূহ প্রেরণারাশির অধিকারী, আজকের শিশুটির মধ্যেই যে কালকের পূর্ণবয়স্ক মানুষটির সমূহ প্রেরণা সম্ভাবনার রূপ নিয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং এই সব প্রেরণা যে ধীরে ধীরে শিশুর আচরণে প্রকাশ লাভ করতে বাধ্য এই সহজ সত্যটা আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না বলেই শিশুমন সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণজনিত আমাদের যে ব্যক্তিগত জ্ঞান সেটা বিকৃত কিংবা আংশিক হয়ে পড়ে। তাছাড়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যহীনতা এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাববশতঃ অনেক সময় আমাদের পর্যবেক্ষণ সংস্কারমুক্ত হলেও তার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক মূল্য থাকে না। বিভিন্ন আচরণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সংলগ্নতা আছে সেটা অন্তর্দৃষ্টির অভাববশতঃ সাধারণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যেমন আমরা সকলেই বিভিন্ন বস্তুকে অহরহ শূন্য হতে ভূতলে পড়তে দেখছি, কিন্তু এই সব ভূতলগামী বিভিন্ন বস্তুর পশ্চাতে যে অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তিটি কাজ করছে সেটা একমাত্র নিউটনই লক্ষ্য করেছেন। তেমনি সাধারণ পর্যবেক্ষক শিশুর বিভিন্ন আচরণ লক্ষ্য ক'রে থাকেন ঠিকই, কিন্তু এই সব বিচিত্র আচরণের মধ্যে যে সংলগ্নতা বা সামঞ্জস্য আছে, তাদের পশ্চাতে যে সাধারণ মানসিক শক্তিটি আছে একমাত্র শিশুমনো-বিজ্ঞানীই তা লক্ষ্য করতে সমর্থ হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে প্রভেদ অনেক। অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক (ক) কোনরূপ সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন না; (খ) হৃদয়াবেগ-বশতঃ যা পর্যবেক্ষণ করেন তার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্যা অতিরঞ্জিত বা অসম্পূর্ণ হতে পারে; (গ) তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্বারা আবিষ্কৃত ঘটনাবলী সুসম্বন্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেন না, তাই সাধারণতঃ তাঁর অভিজ্ঞতার পরমায়ু ও পরিণতি নির্ভর করে একমাত্র তাঁর স্মরণশক্তির তীক্ষ্নতা ও পারদর্শিতার ওপর

(ঘ) তিনি যে সব বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করেন তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না, এবং (ঙ) তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তাঁরই ব্যক্তিগত জ্ঞান হয়ে থাকে, অর্থাৎ অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্য পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মিলিয়ে দেখেন না। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক (ক) সুনিশ্চিত, সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; (খ) হৃদয়াবেগ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, পূর্বকল্পিত ধারণা ইত্যাদির কবল হতে আপন দৃষ্টিকে মুক্ত রাখেন; (গ) পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্ন ও সহজ ভাষায় যা লক্ষ্য করেন তাই লিপিবদ্ধ ক'রে রাখেন; (ঘ) সম্পূর্ণভাবে যুক্তির সাহায্যেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থটির অন্বেষণ করেন; এবং (ঙ) অপরাপর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে দেখেন। সাধারণতঃ বহু বৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে যদি একইরূপ ঘটনা বা আচরণ লক্ষ্য করেন তাহলে স্বীকার করতে হবে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ব্যক্তিগত কুসংস্কার দোষে দুষ্ট নয়; স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও তাঁরা যে সব সাধারণ জিনিস লক্ষ্য করেছেন বুঝতে হবে সেগুলো নিছক তাঁদের কল্পনার বস্তু নয়, তাদের ভিত্তি রয়েছে বাস্তবেরই মধ্যে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের নিয়মানুসারেই শিশুমনোবিজ্ঞানীও শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকেন।

শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশু-মন পাঠ করার উদ্দেশ্যে অপর যে পন্থাটি অবলম্বন করেন তার নাম পরীক্ষা। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য শুধু একটা। পর্যবেক্ষকের পরিস্থিতি বা পর্যবেক্ষণ-ক্ষেত্রটি তাঁর আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু পরীক্ষকের পরিস্থিতিটি তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁরই আয়ত্তাধীন। শিশু-পরীক্ষক পরীক্ষাগারে ইচ্ছেমত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন এবং সেই সব পরিস্থিতিতে শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে সেগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে তার বিশ্লেষণ করেন। পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন খেলার আয়োজন ক'রে; অংকন, সংগীত, কাহিনী, গাছপালা, পশুপাখি, ইতিকথা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিচিত্র কাজ সামগ্রী বা বিষয়ের প্রবর্তন ক'রে তাদের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কোন্ কোন্ শিশু কী কী ভালবাসে; কোন্ কোন্ দিকে তাদের আগ্রহ প্রবল; কোন্ ধরণের শিশুরা কী ধরণের খেলা ভালবাসে; বিভিন্ন বয়েসের শিশুর ছবি আঁকার

প্রখ্যাতটা কেমন ; কে বা কারা অন্যের সঙ্গে সহজভাবে মিলেমিশে খেলা ও কাজ করতে পারে, কারা বা পারে না ; কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে তারা রাগ করে, খুশী হয়, ভয় পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। শিশু-পরীক্ষক শিশুর বুদ্ধি পরীক্ষা করেন তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ক'রে। প্রথমে তিনি শিশুকে হয়তো খুব সহজ একটা কাজ করতে বলেন। শিশু তাতে কৃতকার্য হলে তাকে তখন একটু কঠিন কাজ করতে দেওয়া হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে কাজের জটিলতা বেড়ে চলে। একই বয়েসের বহু শিশুকে এইরূপ ক্রমশঃ জটিল কাজ করতে দিয়ে শিশু-মনোবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন কোন্ বয়েসের বেশীর ভাগ শিশু বিশেষ একটা কাজ নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে পারে। স্বল্পতম যে বয়েসের অধিকাংশ শিশুই 'ক' কাজটা নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেটা যদি পাঁচ বছর হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে-শিশুটি 'ক' কাজটি নির্ভুলভাবে নিষ্পন্ন করেছে তারও মানসিক পুষ্টির পরিমাপ পাঁচ। অর্থাৎ সে যে কাজটি করেছে সেটি করতে পারে ন্যূনতম পাঁচ বছর বয়েসের অধিকাংশ শিশু। এ কথার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, যেসব শিশুর বয়েস পাঁচ বছরের কম তাদের মধ্যে কেউই 'ক' কাজটি করতে পারবে না অথবা পাঁচ বা ছয় বছর বয়েসের প্রতিটি শিশুই কাজটি করতে পারবে। কোন একটি বিশেষ শিশুর বয়েস পাঁচ বছরের কম হলেও তার মানসিক পুষ্টি পাঁচ বছর বয়েসের অধিকাংশ শিশুর মতো হতে পারে। সুতরাং কোন একটি চার বছরের শিশু যদি নির্ভুলভাবে 'ক' কাজটি করতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে তার বয়েসের তুলনায় তার মানসিক পুষ্টি বেশী। অবশ্যই একটি মাত্র কাজের ফলাফলের ওপর নির্ভর ক'রে শিশু-মনোবিজ্ঞানী কোন একটি বিশেষ শিশুর বুদ্ধি নিরূপণ করেন না। তিনি এই ধরণের বহু কাজ তাকে করতে দিয়ে তার ফলাফল বিবেচনা করেন। তাছাড়া তিনি এটাও জানেন যে কোন একটি বিশেষ শিশু যদি কোন একটি বিশেষ কাজ করতে কোন এক সময়ে অক্ষম হয় তাহলে যে তার সে কাজটি করার একেবারেই ক্ষমতা নেই তাও ঠিক নয়। কোন একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ একটা কাজ করতে না পারার অনেক কারণই থাকতে পারে। সেই সময়ে এই কাজটা করার ইচ্ছে বা আগ্রহ শিশুর নাও থাকতে পারে, তার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে, তার মানসিক অবস্থা তখন বিক্ষুব্ধ থাকতে পারে ; রাগ, অভিমান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভীতি, স্বপ্নবিলাস ইত্যাদি নানাকারণে শিশুর মনের অবস্থা তখন এমন হতে পারে যে, কাজে তখন সে একাগ্রতা আনতে পারে না। সুতরাং তার একটা কাজের ফলাফলের ওপর নির্ভর ক'রে তার বুদ্ধির পরিমাপ করা সমীচীন নয়। তাই পরীক্ষক

পরীক্ষাগারে এই সব বিষয় যাতে শিশুর কাজে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখেন। দীর্ঘ সময় ধরে শিশুর বিচিত্র কাজের ফলাফল বিবেচনা ক'রে যথাসম্ভব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রেখে তবেই তিনি তাঁর মতামত ঠিক করেন। শিশু-মনের বিভিন্ন দিক আছে এবং বিভিন্নভাবে শিশু-মনের ওপর পরীক্ষা করা সম্ভব।

শিশুমন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার আরও অনেক উপায় এবং উৎস আছে। শারীরবিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষার ভিত্তিতে শিশুর বিভিন্ন দৈহিক বিশিষ্টতার সঙ্গে তার বিভিন্ন মানসিক বিশিষ্টতার কীরূপ নিবিড় সম্বন্ধ তার কথা উল্লেখ করেছেন। দেহাভ্যন্তরের কোন্ কোন্ গ্রন্থির বিকাশের ওপর বুদ্ধির বিকাশ নির্ভর করে, রাগ আনন্দ ইত্যাদির অনুভূতি কোন্ কোন্ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বিচিত্র ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কীভাবে শিশুর বংশধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যৌবনোদ্গমে কেমন ক'রে দৈহিক পরিবর্তনের প্রচণ্ডতা মনোরাজ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, ইত্যাদি অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার ক'রে শারীরবিদ্ মনোবিদের কাজকে অনেক সহজ করেছেন। তাছাড়া মনঃসমীক্ষকেরা বয়স্কদের মনো-বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন তাদের ব্যক্তিত্ব যেসব উপাদানে তৈরি সেগুলির মূলে নিহিত আছে তাদের শৈশবের অভিজ্ঞতায়। শিশুকে প্রশ্ন ক'রে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তার কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে, তার অঙ্কিত চিত্রাদি বিশ্লেষণ ক'রে, তার স্বপ্নের অর্থ উদ্ঘাটন ক'রে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার জীবনেতিহাস উদ্ধার ও বিশ্লেষণ ক'রে মনঃসমীক্ষক শিশুমনের গভীরতম প্রেরণা ও প্রবৃত্তি-গুলির সন্ধান লাভ করেছেন। এসব ছাড়া শিশুমনকে জানবার আরও একটা অতি সহজ উপায় আছে, সেটা হলো আমাদের আপন আপন শৈশবস্মৃতি। আমরা সকলেই একদিন শিশু ছিলাম। শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা আমরাও একদিন নিবিড়ভাবে আস্বাদন করেছিলাম। এখন যদি স্মরণশক্তির সাহায্যে আমরা আপন আপন শৈশবে ফিরে যেতে পারি তাহলে শিশুর মনের অনেক খবরই জানতে পারবো। কিন্তু এ উপায়ে শিশুমন জানবার চেষ্টা পুরোপুরি দোষমুক্ত নয়। তার কারণ আমরা আমাদের শৈশবের অনেক অভিজ্ঞতা ভুলে গেছি, অনেক আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের উত্তর জীবনের কামনা বাসনা শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তবু মনে হয় চেষ্টা করলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তুলতে পারি এবং আপন শৈশবস্মৃতির সাহায্যে শিশুর মনের অনেক খবরই পেতে পারি।

বংশধারা ও পরিবেশ

অনেকদিন আগে থেকেই মানুষ একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য ক'রে আসছে। সেটি হলো বংশ-ধারা। গোলাপের চারা থেকে যতো অজস্র ফুলই ফুটে উঠুক না কেন তারা গোলাপ ফুলই হবে, চাঁপা কী চামেলি নয়। ছাগ-জননীর সবগুলি সন্তানই ছাগশিশু। বিহঙ্গ-জননী বিহঙ্গেরই জন্মদায়িনী। পৃথিবীতে যতো রকমের বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ এবং মানুষ আছে তারা সকলেই নিজের নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেই বংশ বিস্তার ক'রে থাকে, অর্থাৎ তাদের স্বভাবগত বিশিষ্টতার ধারাটি বংশ-পরম্পরায় একটি নির্দিষ্ট পথ বেয়ে চলে।

যে কেউ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন সন্তানেরা সাধারণতঃ জনক-জননীর অনুরূপ হয়ে জন্মায়। এ কথাটা অবশ্যই সত্যি যে শিশুমাত্রই তার মাতা অথবা পিতার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে জন্মায় না। যাঁরা আবার শিশুর মধ্যে মাতা এবং পিতা উভয়েরই বিশিষ্টতাগুলির সমষ্টি আবিষ্কার করার আশা পোষণ করেন তাঁদেরও হতাশ হতে হয়। কিন্তু মাতা অথবা পিতা কোন একজনের কোন একটি বিশেষ লক্ষণ বা গুণ যে শিশুর মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে পর্যবেক্ষণ করলে অতি সহজেই এটা চোখে পড়ে। স্বামীর চোখের তারা যদি রক্তাভ আর স্ত্রীর চোখের তারা যদি নীলাভ হয়, তাহলে তাঁদের সন্তানের চোখের তারার রঙ সাধারণতঃ লোহিত ও নীলের মাঝামাঝি না হয়ে, রক্তিম না হয় নীলিম হয়ে থাকে। জনক-জননীর মধ্যে যেসব গুণের চিহ্নমাত্র নেই, এমন অনেক গুণও সন্তানের মধ্যে প্রকাশলাভ করতে পারে। পিতামহ কিংবা আরও ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের বিশিষ্টতা অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের গুণাগুণও শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠতে পারে। আপন পরিবার ও পরিজনের সঙ্গে শিশুর রূপ-গুণগত যে সাদৃশ্য ভিন্ন পরিবার ও ভিন্ন জনের সঙ্গে তার সে রকম সাদৃশ্য দেখা যায় না। বংশধারার গতি অনুধাবন করেছেন যাঁরা তাঁরা আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন। একজন বড়ো বৈজ্ঞানিকের সন্তান যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই হয়ে উঠবে তেমন কোন কথা নেই, তবে সে বড়ো দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক অথবা শিল্পী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সন্তান জনকের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা লাভ করেছে তা একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠার প্রেরণা নয়—যে কোন বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করবার ক্ষমতা। যে সব জনক-জননী অতিশয় উত্তেজনা-প্রবণ তাঁদের সন্তানেরা

সাধারণতঃ জড়বুদ্ধি, উন্মাদ, অথবা চঞ্চল-চিত্ত হয়ে থাকে। আরও একটা অনুধাবনীয় বিষয় হলো যে বংশধারাটি জন্মক্ষণেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনের বিশেষ বিশেষ পুষ্টি সম্পাদিত হয়। এই পরিপুষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বংশগত গুণাগুণ বিকশিত হয়ে ওঠে। মাতাপিতার যে সব শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ সন্তানের মধ্যে এতকাল লক্ষিত হয়নি অনেক সময় তার যৌবনোদ্গমে সেগুলি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে থাকে। গবেষকগণ দেখেছেন বংশগত গুণাবলীর বিন্যাস দুটি প্রধান নিয়ম মেনে চলে। প্রথমতঃ, একটি গুণ সকলের মধ্যে সম পরিমাণে থাকে না। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে এবং প্রায় সমসংখ্যক অল্প লোকের মধ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে; অবশিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই গুণটির পরিমাণ মোটামুটি একই রকম। উদাহরণস্বরূপ উচ্চতার উল্লেখ করা যেতে পারে। সহজেই লক্ষ্য করা যায় খুব দীর্ঘ বা খুব হ্রস্ব লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই কম বেশী সাধারণ উচ্চতাসম্পন্ন। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো, প্রকৃতি যেন সাধারণ মানটিকে রক্ষা ক'রে চলবার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট। তাই দেখা যায় দীর্ঘদেহী মাতাপিতার সন্তানেরা সাধারণ লোকের তুলনায় দীর্ঘতর হলেও সাধারণতঃ তাদের মাতাপিতার মতো দীর্ঘ হয় না; পক্ষান্তরে, হ্রস্বদেহী মাতাপিতার সন্তানেরা সাধারণতঃ সাধারণ লোকের মতো উচ্চতাসম্পন্ন না হলেও তাদের মাতাপিতার তুলনায় দীর্ঘতর হয়।

ধর্মযাজক মেণ্ডেল একটি নিভৃত নিরালা গির্জার প্রশান্ত পরিবেশে গাছপালা ফলফুলের বিচিত্র প্রজনন প্রণালী দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করার পর বংশধারার রহস্যময় গতিটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মতে বংশগত গুণগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রকট আর প্রচ্ছন্ন। একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন গুণের সমাবেশ ঘটলে প্রকট গুণটি পরিস্ফুট হয়, প্রচ্ছন্ন গুণটি বিকশিত হতে পারে না, নিদ্রিত থাকে। একটি হয় সম্ভাবিত, অপরটি থাকে সম্ভাবনা। যদি লাল রঙটি প্রচ্ছন্ন আর নীল রঙটি প্রকট হয়, তবে একটি রক্তকমলের সঙ্গে একটি নীল-কমলের সংমিশ্রণে যে সব উদ্ভিদের উৎপত্তি হবে তাদের সবগুলিতেই নীল-কমল ফুটবে। কিন্তু এই নীল-কমলগুলি স্ব-নিষিক্ত হলে যে সব উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে তাদের চার ভাগের এক ভাগ থেকে প্রতিবারেই বিশুদ্ধ নীলের সৃষ্টি হবে। বাকি তিন ভাগের একভাগ থেকে সব

সময়ই বিশুদ্ধ রক্তকমলের উৎপত্তি ঘটবে। অবশিষ্ট দুভাগ নীল থেকে যে সব উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে, তাদের আবার চার ভাগের এক ভাগ থেকে সব সময়ই অবিমিশ্র নীল কমলের উৎপত্তি হবে। বাকি তিনভাগের একভাগ থেকে বংশপরম্পরায় রক্তকমলের সৃষ্টি হবে। এই নিয়মেই বংশবিস্তার ঘটতে থাকবে। ফুলের বেলায় যে নিয়ম, মানুষের বেলায়ও তাই। কিন্তু মানুষের বেলায় এই নিয়মের সন্ধান সহজে পাওয়া যায়না, তার কারণ প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যে বংশ-বিশুদ্ধি নেই বললেই চলে। বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের মধ্যে অনিবার্য কারণে সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং অহরহ ঘটছে। তা সত্ত্বেও বহু মহামূল্য গবেষণার ফলে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি এই রকম বংশ হতে বংশান্তরে মেন্ডেলনীতি অনুসরণ ক'রে চলে— যেমন বুদ্ধিহীনতা। মেন্ডেল-বাদ অনুসারে এটি একটি প্রচ্ছন্ন গুণ। যার বংশে কোন বুদ্ধিহীন পুরুষ বা নারীর জন্ম হয়নি এমন একটি লোকের সঙ্গে যদি একটি জড়বুদ্ধি রমনীর মিলন ঘটে তা হলে যে সব বংশধরের উৎপত্তি হবে তারা কেউই জড়বুদ্ধি হবে না। কিন্তু মাতাপিতা দুজনে স্বাভাবিক হলেও উভয়েরই বংশে ইতিপূর্বে যদি বুদ্ধিহীন নারী বা পুরুষের জন্ম হয়ে থাকে তাহলে তাদের চারটি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ একটি (অর্থাৎ শতকরা পঁচিশটি) হবে বুদ্ধিহীন।

মাতার দেহ হতে একটি জীব-কোষ এবং পিতার দেহ হতে আগত আর একটি জীব-কোষের সম্মিলনের ফলে সন্তানের উৎপত্তি ঘটে। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে ক্রোমোসোম বলে কতকগুলি পদার্থ আছে। ক্রোমোসোমগুলির ভেতরে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট পদার্থ থাকে। তাদের নাম জীন। জীনগুলিই বংশগত গুণাবলীর আবাস-ভূমি। প্রত্যেকটি কোষেই সমসংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কোষে আছে তেইশ জোড়া ক্রোমোসোম। যখন একটি পুংকোষ ও একটি স্ত্রী-কোষ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় তখন তাদের প্রত্যেকেই আপন আপন অঙ্গ হতে অর্ধেকগুলি ক্রোমোসোম পরিত্যাগ করে। সুতরাং একটি পরিপক্ক পুংকোষে অথবা স্ত্রীকোষে মাত্র তেইশটি ক্রোমোসোম বর্তমান থাকে। এইরূপ দুটি কোষের সংমিশ্রণে যে নূতন কোষের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে সন্তান ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোম। কিন্তু প্রত্যেক ক্রোমোসোম আবার দুভাগে সুনির্দিষ্ট পড়ে এবং এক একটি পিতৃ-ক্রোমোসোম এক একটি মাতৃ-ক্রোমোসোমের করবার ক্ষমতা অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে। একই মাতাপিতার সকলগুলি

সন্তান এক রকম হয় না, তার কারণ মাতৃকোষ ও পিতৃকোষের মিলনের পূর্বে যে যে ক্রোমোসোমগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে সকলের ক্ষেত্রে সেগুলি এক নয়। ক্রোমোসোমগুলিই বংশগত গুণাগুণের পরিবাহক। তাই বিভিন্ন সন্তানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রোমোসোমের সমাবেশ ঘটায় তাদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

যমজ সন্তানদের লক্ষ্য করলে সহজেই বংশধারার প্রভাবটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। একটি মাত্র সম্মিলিত-কোষ থেকে যে দুটি সন্তানের সৃষ্টি হয় তাদের দেহ ও মনের সাদৃশ্য সত্যসত্যই বিস্ময়কর। একটিকে আর একটি থেকে পৃথক্ করে দেখা অত্যন্ত দুরূহ। এই রকম যমজদের নিয়ে ঔপন্যাসিকেরা অনেক চমকপ্রদ কাহিনী রচনা করেছেন। সাহিত্যপিপাসু মাত্রই সে খবর রাখেন। এদের চেহারার ঢঙ্, চোখ চুল, গায়ের রঙ্, চলন বলন, স্বভাব চরিত্র, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় একই রকম। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশেও তাদের এই অদ্ভুত সাদৃশ্য বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ থাকে। একই সময়ে নিষিক্ত দুটি সম্মিলিত কোষ হতে যে দুটি সন্তানের সৃষ্টি হয় তাদেব বলে বিসদৃশ যমজ। সদৃশ যমজের মতো না হলেও সাধারণ ভাইভগিনীদের মধ্যে যে মিল দেখা যায় বিসদৃশ যমজদের মধ্যে সাধারণতঃ তদতিরিক্ত মিল লক্ষিত হয়।

একটি শিশু তার মাতাপিতা অথবা পূর্বপুরুষদের কতগুলো গুণাগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একথাটা ঠিক, কিন্তু তার এই গুণাগুণগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠবে কি না সেটা নির্ভর করছে তার পরিবেশের প্রকৃতির ওপর। পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তবে যে সব বিশিষ্টতা তার মধ্যে সম্ভাবনা হয়ে আছে সেগুলি যথাকালে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়ে উঠবে। আর যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে সম্ভাবনাগুলি সম্ভাবনাই থেকে যাবে, কখনও তাদের উন্মেষ ঘটবে না। গোলাপের চারা থেকে গোলাপ ফুলই ফুটবে—ভুঁই চাঁপা কখনও ফুটবে না। এটাই গোলাপের বংশধারা। কিন্তু দু-একটা ফুল ফুটবে, কী রাশি রাশি ফুটবে, সুন্দর তাজা বড়ো বড়ো গোলাপ ফুটবে কী রুগ্ন বিবর্ণ ফুল ফুটবে সেটা নির্ভর করছে পরিবেশের ওপর—মাটির উর্বরতা, জলবাতাস উত্তাপের উপযুক্ততার ওপর। যে শিশুটি বুদ্ধির জড়তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে কখনও তীক্ষ্ণধী ক'রে তোলা সম্ভব হবে না, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে তার মধ্যে বুদ্ধির যেটুকু সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে সেটাকে পুরোপুরি জাগ্রত করা যেতে পারে। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব যে

কতো বেশী উদাহরণ দিয়ে সেকথাটা বুঝিয়ে দেবার খুব বেশী দরকার হয় না। একটি হিন্দুর শিশু যদি জন্ম থেকে খ্রীষ্টান সমাজে খ্রীষ্টান ধাত্রীর কাছে লালিত-পালিত হয় তবে কালে সে গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়ে উঠবে। সামাজিক পরিবেশ থেকেই আমরা সকলে আমাদের ধর্মমত, আচার-সংস্কার, নীতিবোধ ইত্যাদি সঞ্চয়ন করেছি। জীবন ধারণের জন্য প্রাণীমাত্রই নিজেকে পরিবেশের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলে। এই উদ্দেশ্যেই মানুষের মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল। যারা আমাদের চারপাশে রয়েছে, যারা আমাদের ওপর অহরহ প্রভাব বিস্তার করছে—আমরা তাদেরই মতো চলতে বলতে ভাবতে শিখি যাতে ক'রে তাদের সঙ্গে বসবাস করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।

পরিবেশের প্রভাবটা আমাদের জীবনে এতো বেশী যে, অনেকে মনে করেন এটাই মানব-জীবনে একমাত্র প্রভাব—বংশধারাটা কিছুই নয়। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই তাই তাঁদের দৃষ্টি বেশী। পরিবেশকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে কোন শিশুকে যা খুশি তাই ক'রে গড়ে তোলা যায় এই ধরণের একটা বিশ্বাস তাঁরা অন্তরে অন্তরে পোষণ ক'রে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। অনেকে মনে করেন এসব ক্ষেত্রে বংশধারা অপেক্ষা পরিবেশের প্রভাবটাই বেশী; এমন কী কেউ কেউ বলেন, এই ধরণের ছেলেমেয়েদের দ্বারা বংশধারার ধারণাটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। তাঁরা বলেন, এদের মাতাপিতা বা পূর্বপুরুষের মধ্যে বুদ্ধির অপ্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এরা যখন বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে, তখন এদের বুদ্ধিশক্তি বংশধারালব্ধ হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই পরিবেশের প্রভাবসঞ্জাত। তাঁদের মতে এইসব ছেলেমেয়ে উন্নত পরিবেশের সংস্পর্শে আসে বলেই তাদের বুদ্ধি প্রখর হয়। উন্নততর পরিবেশের সংস্পর্শে এলে বুদ্ধিশক্তির উন্নতি ঘটে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না, কিন্তু এই কারণেই বুদ্ধিশক্তির প্রাচুর্যতা জন্মগত এটা অস্বীকার করারও কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। একই রকম অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও সব শিশু সমানভাবে দক্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। যার দক্ষতা লাভ করার সম্ভাবনা আছে শুধু সেই-ই উপযুক্ত পরিবেশে দক্ষতা লাভ ক'রে থাকে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভালো ফল করাটাকেই বুদ্ধিমত্তার একমাত্র পরিচয় বলে ধরে নিয়েছি। এখানেই আমাদের ভুল। যে অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেটি লেখাপড়ায় সুফল অর্জন করেছে তার মাতাপিতা বা পূর্বপুরুষ যে প্রচুর বুদ্ধির অধিকারী হতে পারেন না একথা মনে করা কখনোই যুক্তিসংগত

নয়। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে, তাঁদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, তাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন চেষ্টা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বুদ্ধিশক্তিটা যে বংশধারালব্ধ সেটা বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, সদৃশ যমজের মধ্যে পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বুদ্ধির আশ্চর্য রকম মিল থাকে। সাধারণ ভাইভগ্নীর মধ্যে বুদ্ধির যে রকম সাদৃশ্য দেখা যায় তার চেয়ে নিবিড়তর সাদৃশ্য দেখা যায় সদৃশ এবং অসদৃশ যমজ ভাই-ভগিনীর মধ্যে। একই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির সামঞ্জস্য প্রচুর। তাছাড়া শৈশবে যদি দেখা যায় 'ক' শিশুটি 'খ' শিশুর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, তাহলে ক এবং খ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখনও দেখা যাবে, ক-খ অপেক্ষা বেশী বুদ্ধির অধিকারী। অবশ্যই কোন এক বিশেষ সময়ে শারীরিক পীড়া বা মানসিক আলোড়নের ফলে ক-এর বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত বা মন্থর হতে পারে এবং খ স্বাভাবিক গতিতে বিকাশ লাভ ক'রে বুদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়ে খ-কে অতিক্রম (আপাতদৃষ্টিতে) ক'রে যেতে পারে। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যদি উভয়েরই স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকে এবং পরিবেশ যদি প্রতিকূল না হয় তাহলে ক-এর বুদ্ধি সব সময়েই খ-এর বুদ্ধি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর হবে। কোথায় বংশধারার প্রভাব শেষ হয়ে পরিবেশের প্রভাব আরম্ভ হয় তা বলা শক্ত। কারণ বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটা আর একটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একজনের বুদ্ধি কতটা প্রখর হবে তার একটা সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে তার বংশধারা, আর সেই সীমার মধ্যে তার বুদ্ধির উৎকর্ষ নির্ভর করছে পরিবেশের আনুকূল্যের ওপর। মেণ্ডেলের পরীক্ষা ও যমজদের পর্যবেক্ষণাদির ফলাফল এবং বংশ-বংশান্তরে জড়বুদ্ধিতা মনোব্যাধি ইত্যাদি কতকগুলি গুণাগুণের নিয়মিত আবির্ভাব থেকেই বংশধরের ওপর বংশধারার প্রচণ্ড প্রভাব পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রাণীর যেমন এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি আছে—তাদের দেহমনের গঠন যেমন তাদের ক্ষমতার একটা সীমা নির্দেশ ক'রে দিয়েছে সেই রকম প্রত্যেকটি একক প্রাণীরও একটা বিশিষ্ট দৈহিক ও মানসিক গঠন আছে এবং এইটেই তার আত্ম-বিকাশের একটা বিশিষ্ট পন্থা নির্দেশ ক'রে রেখেছে—একটা সীমা নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে। যে দুটি কোষ থেকে একটি প্রাণীর উৎপত্তি তাদের গুণাগুণের ওপর প্রাণীটির প্রকৃতি নির্ভর করছে। ক্রোমোসোমবাদ কোষের প্রকৃতির ওপর পর্যাপ্ত আলোক সম্পাত করেছে। সম্ভাবনারূপে একটি প্রাণীর মধ্যে যার অস্তিত্ব নেই সহস্র চেষ্টাতেও তার মধ্যে

সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলা যায় না। এইজন্যই চলিত কথায় বলা হয়—"গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না", "স্বভাব যায় না ম'লে", "বংশের ধারা যাবে কোথায়" ইত্যাদি। মোটের ওপর বংশধারা এবং পরিবেশ দুটোই প্রাণীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনটাকেই তাই উপেক্ষা করা চলে না। শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর বংশগত গুণাবলীর বাঞ্ছনীয় ও যথাযথ বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রচনা করা। উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হলে শিশুর অন্ত-র্নিহিত সম্ভাবনাগুলির ক্ষয় বা অপচয় না ঘটে সেগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠবে। আর সেটাই হলো শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

লাইসেঙ্কো, খোরাণা, দির্মিত্রি চেকেতারেভ প্রমুখ জীববিজ্ঞানীদের উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের ওপর যুগান্তকারী গবেষণা এমন একটা দিনের ইঙ্গিত করছে যেদিন হয়তো বিজ্ঞানী জীনের ধর্মটাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, অর্থাৎ জীনের কিছু সম্ভাবনাকে দূর করতে এবং তার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা সংযোজন করতে পারবেন। তার ফলে ইচ্ছে মতো গুণ বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি করা হয়তো একদিন সম্ভব হবে। কিন্তু তাতেও বংশধারার মূল ধারণটা ক্ষুন্ন হচ্ছে না। প্রকৃত পক্ষে বংশধারা বলতে যেসব জীন থেকে বিশেষ একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে তাদেরই বোঝাচ্ছে। তাদের বংশধারা বলা হচ্ছে তার কারণ ঐ সব জীন আসছে মাতাপিতার দেহ থেকে। মূল কথাটা হলো জীনে যে সম্ভাবনা নেই পরিবেশ কিছুতেই পারে না তাকে প্রকট করতে। তাছাড়া সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে ব্যাপক হারে জীনের পরিবর্তন সাধন করা স্বাভাবিক কারণেই এখনো সুদূর পরাহত একটি পরিকল্পনা মাত্র।

তবে একথাটাও সমান সত্যি যে পরিবেশের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী! তাই প্রতিটি শিশুর বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা করা মাতাপিতা শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজ-রাষ্ট্র সকলেরই একটি একান্ত এবং পবিত্র কর্তব্য।

সহজাত প্রবৃত্তি

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সঙ্গে ক'রে সে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রেরণা নিয়ে আসে। অর্থাৎ তার দেহমনের এবং বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি বিশদভাবে সাড়া দেবার—নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্টরূপ আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণী মাত্রের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে প্রাণী যে সব আচরণ করে তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—[এক] এইরূপ আচরণ সরল বা একক আচরণ নয়; কতকগুলি আচরণের সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল আচরণ। যেমন, পাখীর বাসা তৈরী করা। এই কাজটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাপ্রকার কাজের সংশ্লেষণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। [দুই] এইরূপ আচরণের একটা জাতিগত তাৎপর্য আছে। যেমন, পাখী বাসা বোনে তার বংশধরদের বাঁচিয়ে রেখে তার জাতির অস্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্য, যদিও এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে না। প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি তাই উদ্দেশ্যমুখী। [তিন] এইরূপ আচরণ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বলেই শিক্ষানিরপেক্ষ। যে সব পাখী বাসা বোনে তাদের কোন একটিকে জন্ম থেকে আলাদা ক'রে রাখলেও, অর্থাৎ অনুকরণ করবার সুযোগ না পেলেও যথা সময়ে সে আপনা থেকেই বাসা বাঁধবে। [চার] এইরূপ আচরণ এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর দ্বারা মোটামুটি একইভাবে সম্পাদিত হয়। যেমন, একই শ্রেণীর প্রত্যেকটি বাবুই পাখী একই ভাবে বাসা বোনে।

কোন্ পরিবেশে শিশু কিরূপ আচরণ করবে সেটা নির্ভর করছে তার দেহ মনের স্বাভাবিক সংগঠন ও সংস্থানের ওপর এবং পরিবেশের প্রকৃতি ও প্রভাবের ওপর। শুধু শিশুর নয়, সকল বয়স্ক ব্যক্তি এবং সকল প্রাণীরই অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে আছে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না, স্বাভাবিক প্রেরণারাশির প্রচণ্ড আবেগ। তাই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রেরণাগুলিকে কর্মশক্তির উৎসভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার-সামগ্রী পেলে সকল প্রাণীই ভক্ষণ করে। অপরের সম্মুখে প্রত্যেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অধিকাংশ প্রাণীই নিঃসঙ্গজীবন অপেক্ষা দলগতভাবে জীবন যাপন করতে ভালবাসে। শাবক প্রসবের সময় আসন্ন হলে বিহঙ্গী নীড় রচনায় ব্যাপৃত হয়। সম্মুখে নানাবিধ সামগ্রী থাকলে শিশু সেগুলি নাড়াচাড়া করে। চারিপাশে যা দেখে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল অনুভব করে। প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অপর শিশুর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে খেলা করতে ভালবাসে।

চারিপাশে যারা আছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের অনুকরণ করে, ইত্যাদি। এই সব আচরণের পশ্চাতে যে সকল প্রেরণা আছে সেগুলি স্বাভাবিক, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দিয়ে এই আচরণগুলি আয়ত্ত করতে হয় না। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত। সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। সে সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কোনরূপ আলোচনা করছি না। তবে তাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন প্রধানতঃ তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। আত্মগত প্রবৃত্তি ও জাতিগত প্রবৃত্তি। আহার, ক্রীড়া, অনুকরণ, প্রশংসাপ্রীতি আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিকাশ, ক্রোধ, ভীতি, প্রেম, ইত্যাদির পশ্চাতে যে সব প্রবৃত্তি আছে সেগুলি আত্মগত। মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আহার করে। ক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি সম্পাদিত হয়। অনুকরণের মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বসবাস করার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলে। প্রশংসা অহংবোধকে প্রবল করে। আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারাও অহংবোধ পরিতৃপ্ত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা অনেকে উপলব্ধি করতে পারেন না। চারিপাশে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে রাখলে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অহরহ কিরূপ চেষ্টা করছে তা সহজেই বোঝা যায়। রূপ নিয়ে, আভরণ নিয়ে, সম্পদ নিয়ে সুসভ্য নগরীর রাজপ্রাসাদে কিংবা নিভৃত পল্লীর জলের ঘাটে মেয়েদের মধ্যে প্রায়শঃই যে প্রতিযোগিতা চলে তার মূলে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। হাটে-বাজারে, পূজোর মেলায়, পথেঘাটে, লক্ষ্য করলেই দেখা যায় প্রত্যেকেই যেন নিজেকে দেখাবার জন্য ব্যস্ত। আত্মপ্রকাশের প্রেরণাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি বীজের মধ্যে ফলফুলের যে সম্ভাবনাটি আছে সেটি সব সময়ই আত্মপ্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট। তেমনি প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যেসব স্বাভাবিক বিশিষ্টতা নিদ্রিত হয়ে আছে সেগুলি সে অহরহঃ চেষ্টা করছে জাগিয়ে তুলতে। পরিবেশকে যথাসম্ভব পরিবর্তিত ক'রে তাকে আত্মপ্রকাশের অনুকূল ক'রে গড়ে তুলছে। অবশ্যই এই প্রচেষ্টা শিশুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সহজাত প্রেরণাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অন্ধ। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের প্রবৃত্তিগুলি যদিও পরস্পর হতে ভিন্ন, তথাপি অনেক সময় তারা একইসঙ্গে পরিতৃপ্ত হয়। ফুল আত্মবিকাশের প্রেরণায় ফুটে ওঠে, কিন্তু তার গন্ধ তাকে মানুষের কাছে সমাদৃত করে। বিজ্ঞানী আত্মবিকাশের প্রেরণায় সত্য উদ্ঘাটিত করেন, কিন্তু বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। অনুকরণস্পৃহা, কৌতূহল, ইত্যাদির সাহায্যে শিশু যেমন নিজেকে

-রক্ষা করে তেমনি ভীতি, রোষ ইত্যাদিও তাকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। ভীতির অনুভূতি বিপদ সম্বন্ধে তাকে সজাগ ক'রে দেয় এবং বিপদের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সহায়তা করে। রোষের অনুভূতি তাকে শত্রুকে পরাভূত ক'রে আত্মরক্ষা করার প্রেরণা দান করে।

জাতিগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি, সমাজপ্রীতি, সহানুভূতি, সন্তান-বাৎসল্য ইত্যাদির নাম করা চলতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনের পশ্চাতে আছে বংশবৃদ্ধি করার সহজাত প্রেরণা। সন্তান-বাৎসল্যের মূলে আছে বংশরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। সমাজপ্রীতি, সহানুভূতি ইত্যাদি সমাজ-জীবনকে সহজ ও সুদৃঢ় ক'রে রেখেছে। কিন্তু যদিও আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে উপর্যুক্ত দুটি ভাগে ভাগ করেছি, তথাপি তাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধিতা নেই। যেমন, স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনের মধ্যে আত্মতৃপ্তি এবং বংশরক্ষা দুই-ই চরিতার্থ হয়।

শিশুর মধ্যে সকলগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই একসঙ্গে প্রকাশিত হয় না। দেহমনের বিভিন্ন পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। যতো দিন না শিশুর হস্তপদ সঞ্চালন করার ক্ষমতা জন্মাচ্ছে ততদিন সে হাঁটতে পারে না। তেমনি যতো দিন পর্যন্ত তার মনের একটা বিশেষ পুষ্টি সম্পাদিত না হচ্ছে ততদিন সে কোন বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে না। তাছাড়া দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এক একটি প্রবৃত্তি এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ যৌনপ্রবৃত্তির নাম করা যেতে পারে। যৌবনে মানুষ যৌন সম্ভোগের মধ্যে যে আনন্দ আস্বাদন করে শিশু তার দেহের অপর কতক-গুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উত্তেজনায় অনুরূপ আনন্দের আস্বাদ পায়।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলির বিকাশের ওপর শিশুর মানসিক পুষ্টি বহুলাংশে নির্ভর করে। সমাজপ্রীতি শিশুকে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে প্রবৃত্ত করে। মাতাপিতার প্রতি তার যে অন্ধ আসক্তি ও নির্ভরশীলতা জন্মেছে তা থেকে তাকে ধীরে ধীরে মুক্তি দান করে। সে সঙ্গীদের বুঝতে শেখে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে। মোটের ওপর সমাজে থাকতে হলে যেসব গুণের প্রয়োজন শিশু ক্রমে ক্রমে সেগুলি অর্জন করে। কৌতূহল শিশুকে নিত্য নূতন বস্তু ও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার মধ্যে জ্ঞান-পিপাসার সঞ্চার করে। মানুষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সভ্যতায় আজ যে বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করেছে তার পশ্চাতে আছে অপরিসীম কৌতূহল। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি শিশুকে প্রতি-

যোগিতা করতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং নানাবিধ দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করতে উদ্দীপিত করে। এইভাবে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিই শিশুকে জীবনধারণের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলে।

পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা এবং অনুকরণ ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির কিছু কিছু রূপান্তর ঘটে। ভক্ষণ ক্রিয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিভিন্ন জাতের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে আহার প্রস্তুত করে, বিভিন্ন নিয়মে ভক্ষণ করে এবং ক্ষুধা না পেলেও অনেকে নিয়মিত সময়ে আহার ক'রে থাকে। বিহঙ্গী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা বিশেষ সময়ে নীড় রচনা করে, কিন্তু যেসব উপাদান দিয়ে সে বাসাটি তৈরী করে সেগুলো এমন যা নাকি তার পরিবেষ্টনীতেই পাওয়া যায়।

অনেক মনস্তাত্ত্বিক মানুষের মধ্যে নানাবিধ পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির সন্ধান পেয়েছেন। যেমন, সৃষ্টি করার এবং ধ্বংস করার প্রবৃত্তি, পীড়ন করার এবং পীড়িত হবার প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। সকল প্রবৃত্তি সব সময়ই সমাজের কল্যাণে আসে না। যেমন, যে শিশুর মধ্যে ধ্বংসপ্রবৃত্তি খুব প্রবল সে চারিপাশে যা কিছু পায় সব ভেঙেচুরে ফেলে, সঙ্গীসাথীদের মারধোর করে এবং পশুপাখী কীটপতঙ্গকে নানাভাবে পীড়ন করে। এই প্রবৃত্তিটিকে যদি উৎসাহিত করা যায়, তা হলে তার ফল হয় অত্যন্ত খারাপ। দেখা দরকার যেন এই সব প্রবৃত্তি স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ ক'রে এমন একটা পথে প্রবাহিত হয় যাতে ক'রে তাদের চরিতার্থতা আসে অথচ সমাজেরও মঙ্গল সাধিত হতে পারে। প্রেরণান্তর্গত শক্তির এইরূপ ভিন্নমুখী হওয়ার নাম সুচালন বা উদ্গতি। বিশেষজ্ঞগণ সুকৌশলে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সুচালিত করতে পারেন। যার মধ্যে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি প্রবল, তাকে যদি উদ্যানে আগাছা তুলে ফেলার কাজে লাগানো যায় তাহলে তার ধ্বংস করার ইচ্ছে যেমন চরিতার্থ হবে, বাগানটিও তেমনি সুন্দর হয়ে উঠবে। যথাসময়ে তাকে যদি যোদ্ধা তৈরী করা যায় তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনাশ করে সে আনন্দ পাবে, অথচ তার ফলে সমাজও হবে উপকৃত। অথবা তাকে যদি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে অস্ত্রোপচারের মধ্যে সে প্রচুর আনন্দের সন্ধান পাবে, অথচ তার দক্ষতায় মানবসমাজ হবে উপকৃত। যে শিশুর কৌতূহল স্বভাবতঃই অবাঞ্ছিত পথে ধাবিত হয় তাকে দক্ষ পরিচালনার সাহায্যে বিবিধ বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী ক'রে তোলা সম্ভব। তার ফলে সে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হতে পারবে এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারে তার দান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমাদের বিভিন্ন কামনা বাসনার মূলে আছে এক একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যে সকল কামনা বাসনা আমাদের সমাজ ও নীতিবোধের বিরোধী সেগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানসিক সুস্থতার বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই গোড়া থেকেই শিশুমনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে ক'রে তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে নানাভাবে তার শিক্ষাদীক্ষা এবং উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা সম্ভব।

বস্তুতঃ শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মূল্য অপরিসীম। শিশু প্রধানতঃ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েই কাজ করে। কারণ তার মধ্যে বাস্তববুদ্ধি, নীতিবোধ, কর্তব্যাকর্তব্যের কাণ্ডজ্ঞান ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। আর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করবার মতো অভিজ্ঞতা ও মানসিক পরিপক্কতাও তার থাকে না। সুতরাং তাকে শিক্ষা দিতে হলে তা দিতে হবে তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সাহায্যেই। এই প্রসঙ্গে আত্ম-প্রতিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, বর্জন, পলায়ন, কৌতূহল ইত্যাদি প্রবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখাপড়া, খেলাধূলা ও অনুরূপ কাজে প্রশংসা, পুরস্কার ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে জাগরিত করলে শিশু উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সব কাজে পরিপূর্ণভাবে আপন শক্তির প্রয়োগ করবে। শিশুর আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত ক'রে তার সম্মুখে শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গ যদি কাজকর্মে ও আচার আচরণে উপযুক্ত আদর্শ স্থাপন করেন তাহলে তাঁদের অনুকরণ ক'রে সেও তদনুসারে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। সুচালনের দ্বারা শিশুর বর্জন ও পলায়নের প্রবৃত্তিগুলিকে অন্যায়, অপরিচ্ছন্নতা, অশিষ্টতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সক্রিয় ক'রে তোলা যেতে পারে। বুদ্ধিগত শিক্ষার ব্যাপারে কৌতূহল প্রবৃত্তির মূল্য সুস্পষ্ট। পাঠ্য বস্তুটা শিশুর ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে না দিয়ে তার সম্বন্ধে কৌতূহল অর্থাৎ জানবার আগ্রহ যদি তার মনে শিক্ষক জাগাতে পারেন তাহলে সে সানন্দে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বস্তুটি আয়ত্ত করবার প্রয়াস পাবে এবং শিক্ষা তখনই সার্থক হয়ে উঠবে। কোনও বিষয়ে শিশুর মনে কৌতূহলের সঞ্চার করতে হলে সাধারণতঃ যে যে বিষয়ে তার আগ্রহ আছে সেই সেই বিষয়ের সঙ্গে উক্ত বিষয়টিকে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন, শিশু স্বভাবতঃই পশুপক্ষী সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। চিড়িয়াখানায় লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কেমন অধীর আগ্রহে শিশুরা বিচিত্র পশুপক্ষীদের লক্ষ্য করে, কতো অজস্র প্রশ্ন করে তাদের সম্বন্ধে। সুতরাং কোনও স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ

সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানদান করতে হলে সেখানকার পশুপাখীদের কথা সর্বপ্রথমে উত্থাপন করা যেতে পারে। তারপর তাদের বসবাসের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সেখানকার গাছপালার প্রকৃতির সঙ্গে স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর সম্বন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষ শিক্ষক এইভাবে শিশুর কৌতূহল উদ্রিক্ত ক'রে সমস্ত বিষয়টি তার কাছে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে পারেন। অনেক সময় আলোচ্য বিষয়ের প্রতি শিশুর মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রেও তার সম্বন্ধে শিশুকে কৌতূহলী ক'রে তোলা যায়। জনৈকা শিক্ষিকা একদিন একটি আচ্ছাদিত খাঁচা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। তা দেখে শ্রেণীর সবল ছেলেমেয়ে খাঁচায় কী আছে জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। শিক্ষিকা বললেন—তোমরাই বলো কী আছে। কেউ বললো—কাঠবেড়ালী, কেউ বললো—খরগোস, কেউ বা বললো—পাখী। শিক্ষিকা বললেন—একটা পাখী আছে। তার গায়ের রঙ্ অনুমান কর। কেউ বললো—সাদা, কেউ বললো—কালো, কেউ বা বললো—সবুজ। শিক্ষিকা বললেন—পাখীটার রঙ্ কালো। তার ঠোঁটের রঙ্ আন্দাজ কর। কেউ বললো—হলদে, কেউ বললো—লাল, কেউ বা বললো—কালো। শিক্ষিকা বললেন—পাখীটার ঠোঁটের রঙ্ হলদে, বল পাখীটা কী। কেউ বললো—কোকিল, কেউ বললো—শালিক, কেউ বা বললো—ময়না। শিক্ষিকা তখন খাঁচার আবরণ খুলে ফেললেন। সকলে দেখলো পাখীটা একটা ময়না। তখন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষিকা জিজ্ঞাসু বালক-বালিকাদের ময়না ও ময়না জাতীয় পাখীদের সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন কথা শিক্ষা দিলেন। অনেক সময় আমরা দেখি যথেষ্ট বুদ্ধিব অধিকারী হয়েও ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে। তার একটা প্রধান কারণ পাঠ্য বিষয়ে তাদের মনোযোগের অভাব। যে বিষয়ে আগ্রহ নেই সে বিষয়ে কেউ মনোযোগ দিতে পারে না। সুতরাং শিশুদের মনোযোগী করতে হলে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতে হবে। তা করতে হলে তাদের কৌতূহল প্রবৃত্তিটিকে যথাযথভাবে উদ্দীপিত করা প্রয়োজন।

শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। যথাসম্ভব তাদের প্রকাশের আয়োজন করতে হবে। অতিরিক্ত অবদমনের ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। তাই কুপ্রবৃত্তিগুলিকে সুকৌশলে সুচালিত করতে হবে। আত্ম-সমর্পণ আত্ম-নিপীড়ন, পলায়ন ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিকে অনাবশ্যকভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্দীপিত করা ঠিক হবে না, তার কারণ তাতে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকমতো বিকশিত না হয়ে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা, ভীতি, হতাশা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে তুলবে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ধারা

দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ বড়ো নিবিড়। যে প্রাণীর শারীরিক গঠনটি যতো জটিল, তার মানসিক শক্তিও ততো বিচিত্র, ততো উন্নত। প্রাণীজগতে মানুষের দেহসংগঠন সবচেয়ে বেশী জটিল; তাই তার অনুভূতি গভীর, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ম। মানুষের এই সব মানসিক বৈশিষ্ট্যের কারণই তার দেহ-গঠনের বিশিষ্টতা। তাছাড়া দেহমনের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রচুর উদাহরণ আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। শরীরের অসুস্থতা মনের প্রফুল্লতাকে নষ্ট করে। মানসিক উত্তেজনা হতে শারীরিক অসুস্থতার উদ্ভব হয়ে থাকে। বস্তুতঃ দেহ ও মনের গভীর সম্পর্কটি অনস্বীকার্য।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে মানব-জীবনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যথা: (ক) শৈশব, (খ) বাল্য, (গ) কৈশোর, (ঘ) যৌবন, (ঙ) প্রৌঢ়ত্ব, (চ) বার্ধক্য। জীবনের প্রারম্ভে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়। তারপর ধীরে ধীরে এই বিকাশের গতিটি মন্থর হয়ে আসে। পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মিলন মুহূর্ত থেকে শিশুর জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত যে সময় তার মধ্যে শিশুর দেহগঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায়, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সত্তোর বৎসর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও সে রকম পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। পুংকোষ এবং স্ত্রীকোষ মিলিত হয়ে একটি কোষে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই সম্মিলিত কোষটি লক্ষ লক্ষ কোষে বিভক্ত হয়ে একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

বাল্য এবং যৌবনে দীর্ঘকাল ধরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, শৈশবে দু' তিন মাসের মধ্যেই সে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই সময়ের যে পরিবর্তন তার ওপর বহির্জগতের প্রভাব খুব বেশী থাকে না। দেহকোষের নিজস্ব প্রকৃতিই প্রধানতঃ এই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন, যে শিশু উপযুক্ত সময়ের পূর্বে জন্মায় তার দেহগঠন সাধারণতঃ স্বাভাবিক শিশুর মতো হয় না এবং যে শিশু উপযুক্ত সময়ের পরে জন্মগ্রহণ করে তার দৈহিক গঠন সাধারণ শিশুর দেহগঠন অপেক্ষা উন্নততর।

জন্মের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিশুর সত্তা জননীর সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে। সে স্বতন্ত্রভাবে বায়ুমণ্ডলী হতে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না এবং স্বাধীনভাবে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতাও তার থাকে না। জন্ম হতে এক বৎসরের মধ্যে শারীরিক গঠন অত্যন্ত দ্রুত সংঘটিত হয়। এই সময়ে শিশুর

স্বাস্থ্যের ওপর তাই তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু যাতে উপযুক্ত খাদ্য এবং পর্যাপ্ত আলোক ও বাতাস পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা নিতান্ত দরকার। জননীদের অবহেলার জন্য এই বয়সে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু কতকগুলি উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা নিয়ে আসে। এই সব ক্ষমতা শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয় না। এগুলি স্বাভাবিক ক্ষমতা। ইংরাজীতে এদের বলা হয় রিফ্লেক্স এ্যাকসান। যেমন, চোখে আলোক লাগলে চোখের পাতা বন্ধ হয়; হাতের মধ্যে কোন বস্তুর স্পর্শ পেলে শিশু মুষ্টিবদ্ধ করে। শিশুর মধ্যে কতকগুলি জটিলতর আচরণও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধার্ত হলে সে শির সঞ্চালন করে, মনে হয় যেন খাদ্য অন্বেষণ করছে; মুখের মধ্যে কোন বস্তু স্থাপন করলে লেহন করতে আরম্ভ করে; উচ্চ শব্দে তার সমস্ত দেহ শিহরিত হয়; শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য ক্রন্দন করে এবং হাই তোলে।

জীবনের প্রথম তিন মাসের মধ্যে দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে কাজ করবার ক্ষমতা লাভ করে এবং রিফ্লেক্সগুলি সুসম্বদ্ধ হয়। তিন মাস বয়স হলে শিশু শক্তভাবে মাথা তুলতে পারে এবং প্রায়ই শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার চক্ষু এবং মস্তক গতিশীল বস্তুকে অনুসরণ করে। সে বস্তুকে মুঠোর মধ্যে পুরে মুখের ভেতর নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে তার আচরণের ওপর পরিবেশের প্রভাব বাড়তে থাকে।

তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে শিশু হস্ত, মস্তক এবং চক্ষুকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করে। যা দেখে তাই হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করে এবং তার নানাবিধ শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতি হয়। এইভাবে তার ব্যবহার দিনে দিনে অধিকতর জটিল এবং সুসম্বদ্ধ হতে থাকে। সে শুধু বাইরের উত্তেজনাতেই সাড়া দেয় না, কতিপয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে এবং কতিপয় বস্তু হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই সময়ের শেষভাগে শিশু বসতে শেখে এবং আপন গণ্ডির অন্তর্গত বস্তু নিচয়কে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে। বেশী দূরে যে সকল সামগ্রী থাকে সে তার অল্পই লক্ষ্য করে। সন্নিহিত সামগ্রীগুলির মধ্যেই তার কৌতূহল নিবদ্ধ থাকে।

ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে পায়ের ওপর শিশুর অধিকার জন্মে এবং সমগ্র শরীরটাকে সে একসঙ্গে ঘোরাতে ফেরাতে পারে। দূরের সামগ্রী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু এই রকম কতকগুলি সামগ্রীর পাশে যায় এবং

কতকগুলির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলে। এই সময়ের শেষের দিকে শিশু হামাগুড়ি দিয়ে ও হেঁটে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং হাত দিয়ে অনেক জিনিস নাড়াচাড়া করে, ভেঙেচুরেও ফেলে। কোন জিনিস শিশুর দৃষ্টিপথ হতে অপসারিত হলেও সে তার কথা মনে ক'রে রাখে। মানুষকে বেশী ক'রে লক্ষ্য করে। সহজ কাজ অনুকরণ করে। দু-একটা কথা বলতে শুরু করে। তার চার পাঁচটা দাঁত বেরোয়।

এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশুর মনের ওপর সমাজের প্রভাবটি খুব প্রবল ভাবে পড়ে। জড়বস্তু অপেক্ষা তখন মানুষ এবং মানুষের আচার-আচরণের দিকেই তার দৃষ্টি বেশী করে ধাবিত হয়। চারিপাশে যে সকল মানুষ ভিড় ক'রে থাকে শিশু তাদের অনুকরণ করে এবং তাদের সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অসমর্থনে নিরুৎসাহ বোধ করে। এইভাবে শিশু ধীরে ধীরে সমাজের একজন হয়ে দাঁড়ায়। একজনকে কোন কাজ করতে দেখলে সে তার অনুকরণ করে। এইভাবে যে অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিশুর মনে অপরের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়। কেউ কোন কাজ করলে শিশু শুধু সেই কাজটা লক্ষ্য করে না, সে কল্পনা করে যেন নিজেই সে কাজটি করছে। এই কাজ করার যে অভিজ্ঞতা সে পূর্বে লাভ করেছে, সেই অভিজ্ঞতা পুনরায় তার মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আনন্দিত, রুষ্ট অথবা ভীত ক'রে তোলে। শিশু তখনো নিজেকে অন্য লোকের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ক'রে ভাবতে পারে না। অন্য লোকের কার্যকলাপকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে। অন্যলোকের আকাঙ্ক্ষা, প্রক্ষোভ এবং কল্পনাকে নিজের মধ্যে অনুভব করে। এই ভাবে তার মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। শিশুর কথাবার্তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বিশ্ব-জগতের অধিকাংশ সামগ্রীকেই সে প্রাণবন্ত মনে করে। অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে নিজের মনের অনুভূতি আবেগ ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলি আরোপ ক'রে থাকে। শিশু যে শুধু অপরের অনুকরণ ক'রে তার মানসিক বিকাশটিকে দ্রুততর করে তাই নয়, সে তার নিজের কাজে যোগদান করার জন্যও অন্যদের প্রণোদিত করে। এইভাবে শিশুর মনের সঙ্গে অন্য লোকের মনের একটা নিবিড় আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার সমাজ চেতনাটি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে শিশুর জীবনে আরও একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। কণ্ঠস্বরের ওপর তার অধিকার জন্মে। সে ধীরে ধীরে ভাষা শিক্ষা করে। ভাষার মাধ্যমে শিশু বর্তমান থেকে অতীতের অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। কোন বস্তু, কাজ অথবা ঘটনার সঙ্গে

কোন শব্দের (নাম) বার বার সংযোগ স্থাপিত হলে—অর্থাৎ শিশু কোন একটা বস্তু যখন দেখছে তখন তার মাতাপিতা বা সঙ্গী-সাথীরা যখন বারবার বস্তুটার নাম উচ্চারণ করেন তখন, কেবলমাত্র শব্দটিই শিশুকে সেই বস্তুটির (কাজ অথবা ঘটনার) কথা মনে করিয়ে দেয়। এইভাবে শিশু বর্তমানের গণ্ডি ছাড়িয়ে অতীত এবং ভবিষ্যতের রাজ্যেও অভিযান করতে পারে। শব্দাবলীর সাহায্যে শিশু সুসম্বন্ধরূপে চিন্তা করবার ক্ষমতা লাভ করে। তাছাড়া ভাষার সাহায্যে শিশুর সমাজ-জীবনও সহজ হয়ে ওঠে। ভাষার সাহায্যে সে নিজের মনটি অপরের কাছে খুলে ধরতে পারে এবং অপরের কথা শুনে তার মনের পরিচয় লাভ করে। তিন বৎসরের পূর্বেই শিশু কল্পনা ক'রতে শেখে। প্রথম প্রথম তার মনে কল্পনার উন্মেষ ক'রতে হলে শব্দ ছাড়া বস্তু এবং অঙ্গ-ভঙ্গিরও প্রয়োজন হয়। তারপর বস্তু ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্য ছাড়াই সে কল্পনা করতে পারে। দুই বৎসরের মধ্যেই শিশু প্রায় কয়েক শত থেকে দুই সহস্র মতন শব্দ আয়ত্ত করে। এই সব শব্দ ব্যবহারের ফলে সে তার আপন অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এর পূর্বে শিশু তার নিজের দেহটাকে অন্যান্য অনেক বস্তুর মধ্যে অন্যতমরূপেই জানতো। কিন্তু তার দেহটাকে শিশু শুধু চক্ষু দিয়েই দেখে না ; নিজের দেহ সঞ্চালিত হলে অথবা কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে এমন অনেক বিচিত্র অনুভূতি লাভ করে, যে-সকল অনুভূতি অন্যান্য বস্তু হতে সে পায় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতির বোধজনিত অবিরাম যে সব অনুভূতির সঞ্চার হয়, সেগুলি পূর্বোক্ত অনুভূতি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিসমূহের একটি পটভূমি রচনা করে। শব্দের সাহায্যে শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। তার মধ্যে 'আমিত্ব' বোধের উদ্ভব ঘটে। দু বছরের শিশুর মধ্যে একটা "ঋণাত্মক" মনোভাব দেখা যায়—অর্থাৎ তাকে কোন কিছু করতে বললে প্রায়ই সে "না" বলে বসে। কিন্তু এতে বিচলিত হবার কোনও কারণ নেই। এরূপ মনোভাব শিশুর বিকাশের একটি অতি স্বাভাবিক স্তর মাত্র। তিন বছরের শিশুর মধ্যে অতিশয় কর্ম-চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। হাত ও পায়ের ব্যবহার রীতিমত বেড়ে যায়। শিশু চারিপাশে দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি ক'রে বেড়ায়। জিনিস-পত্র নেড়েচেড়ে, ভেঙেচুরে ভারি আনন্দ পায় সে।

তিন থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে শিশুর জগতের সীমানাটি বর্ধিত হয়। নূতন নূতন লোকের সংস্পর্শ তার মনে নব নব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সময় অন্যের প্রতি শিশুর এবং শিশুর প্রতি অন্যের মনোভাবে

যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অন্য সকলে তার মনে প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি বিশ্বাস এবং বাধ্যতার সঞ্চার করতে চায়, কিন্তু শিশু এই সময় তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতো বেশী সতর্ক থাকে যে, স্বাধীনভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে ওঠে এবং অনুকরণ স্পৃহা বহুলাংশে ত্যাগ করে। অপরের সঙ্গে তার নিজের এই রকম সংঘাতের ফলে শিশুর মনে বিদ্রোহ ভাব দেখা দেয়। কারো উপদেশ অনুযায়ী সে আর চলতে চায় না এবং সাধারণতঃ যে কাজ তাকে করতে বলা হয় তার বিপরীতটাই সে ক'রে থাকে। এই সময়ে শিশু নিজেকে হাতি, ঘোড়া, ভালুক প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার কল্পনা ক'রে খেলার ভেতর দিয়ে নিজের নবোদ্গত ব্যক্তিত্বের ওপর নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকে। এই সব খেলা তার কল্পনাশক্তিকে যেমন প্রখরতর করে, তার ব্যক্তিত্বকে তেমনি প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। এই রকম অভিনয়ের ভেতর দিয়ে সে সহজেই বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে শেখে। আমরা বলেছি তিন বছরের শিশুর জীবন অতিমাত্রায় কর্ম-চঞ্চল; তাকে যদি 'কর্মবীর' আখ্যা দেওয়া যায়, তবে চার বছরের শিশুকে 'দার্শনিক' বলা যেতে পারে। কারণ এই সময়ে সব কিছু সম্বন্ধেই তার অপরিসীম কৌতূহল দেখা যায়। কেন? কী ক'রে?—ইত্যাদি ধরণের প্রশ্ন চার বছরের শিশু প্রায়ই ব্যবহার করে। এসব থেকে তার জ্ঞান পিপাসার গভীরতা, তার মানসিক বিকাশের দ্রুততা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু তার এই দার্শনিক মনোভাব তাকে অলস ক'রে ফেলে না। তার জীবনে কাজ এবং কল্পনা দুটোই সমানতালে পা ফেলে চলে। ছুটোছুটি, লাফালাফি, দাপাদাপির অন্ত থাকে না এসময়েও। এই সময়টাতে শিশু নানারকম রূপকথার গল্প, ছেলে-ভুলোনো ছড়া ইত্যাদি শুনতে ভারি ভালোবাসে। কারণ এগুলো তার কল্পনাকে সম্পদশালিনী ক'রে তোলে। অনেক সময় কল্পনাপ্রবণ শিশুরা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে না এবং এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলে, যেগুলো বাস্তব জগতে না ঘটে তাদের কল্পনার জগতেই ঘটে থাকে। কল্পনার বস্তু বস্তুর মতোই তাদের মানসচক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। মাতাপিতা অনেক সময় এদের ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না এবং মিথ্যাচারী মনে ক'রে তাদের নানাভাবে তিরস্কৃত ক'রে থাকেন। তাঁদের এই রকম আচরণ কিন্তু শিশুর কোমল মনে গভীর আবেগের সঞ্চার করে। এই সব শিশুকে তিরস্কার না ক'রে কল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তাদের ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তাদের এই বিশেষ শক্তিটাকে তাদের শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। যে

সকল শিশু কল্পনার মধ্যে অতিরিক্ত আনন্দ পায় তারা পরবর্তী জীবনে সামাজিক হতে পারে না। নিজেদের সুখ দুঃখ ব্যর্থতা সফলতা নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। স্বাধীনতা না পেলে শিশুর মধ্যে কল্পনাবিলাস এবং বিদ্রোহী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠতে পারে। কল্পনা ছেড়ে শিশু যাতে বাস্তবানুরাগী হতে পারে সেজন্য তাকে সঙ্গীসাথীর সঙ্গে খেলাধুলা এবং নানা রকম কাজকর্মের সুযোগ দিতে হবে।

ছয় বৎসরের শিশুর গড় উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি এবং ওজন পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড। এই সময়ে শিশু পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে। তার ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটে। উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিলাভ করে। মস্তিষ্কের অত্যন্ত অল্প পুষ্টি সাধিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন এবং পরিপাক ক্রিয়ার খুব কম পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ের প্রারম্ভে শিশু পরিবারের সীমা ছেড়ে বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে এবং বন্ধু বান্ধবদের দলে আনাগোনা করে। সে বহির্জীবনের স্বাদ পায়। ইতিহাস, ভূগোল, চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সে অন্য দেশ, অন্য জাতি, অন্যান্য প্রাণী প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং তাদের বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেহ মনে পরিবর্তনের প্লাবন নামে। শরীরের কতকগুলি গ্রন্থি পরিপুষ্ট হয় এবং তাদের থেকে যে রস ক্ষরিত হয় সেই রস শারীরিক বৃদ্ধি, সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মেয়েদের এগারো হতে তেরো এবং ছেলেদের তেরো থেকে পনেরো বৎসরের মধ্যে দৈহিক উচ্চতার গতি পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ দ্রুততর হয়। সেই অনুপাতে ওজনও বৃদ্ধি পায়। বালিকারা যুবতী এবং বালকেরা যুবকে পরিণত হয়। এই স্তরে মনেরও প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্যটা প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়। এই সময়ের প্রথমভাগে সাধারণতঃ ছেলেদের প্রতি ছেলেদের এবং মেয়েদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তারা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে। তারপর এই আকর্ষণের গতি পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এই সময়ে দীর্ঘকাল ধরে ছেলে এবং মেয়েদের পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তাদের মনে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণটা স্থায়ী হতে পারে না। এর ফলে পরবর্তী কালে তাদের দাম্পত্য জীবনও সুখের হয় না। সমশ্রেণীর মধ্যে তাদের ভালোবাসা নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং

খুব সতর্কতা সহকারে ছেলেমেয়েদের এই সময়ে যথাসম্ভব মেলামেশা করতে দেওয়া দরকার। এই সময়ে সুখ, দুঃখ, বেদনা, সহানুভূতি, ঘৃণা, ভালোবাসা প্রভৃতির অনুভূতিগুলি অত্যন্ত প্রবল এবং গভীর হয়। সাধারণতঃ মাতাপিতা এবং অন্যান্য গুরুজনেরা এই সময়ে তরুণ তরুণীদের নানারূপ পরামর্শ ও উপদেশ দান করেন এবং তারা যাতে তাঁদের কথামতো চলে সেইরূপ দাবী করে থাকেন। এর ফলে তাদের মনে বিদ্রোহ জাগে। তারা মাতাপিতা ও গুরুজনদের প্রভাব হতে মুক্তি কামনা করে। স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে প্রয়াস পায়। এই সময় তাদের মনে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। নানাবিধ কাজে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে তাদের মধ্যে ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে হবে। শাসন করলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে তাদের সঙ্গে।

শিশুর দেহ এবং মন জন্মমুহূর্ত হতে সুরু করে ধীরে ধীরে কী ভাবে বিকশিত, পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে—কী ভাবে তার দেহের বৃদ্ধি, মনের বিস্তৃতি ঘটে অনুধাবন করলে সেটা সহজেই বোঝা যায়। সাধারণতঃ জন্মকাল থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুর দৈহিক ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং সে প্রথমে মাথা তুলতে পারে, তারপর বসতে এবং তারপর দাঁড়াতে শেখে। এক থেকে দু' বছরের মধ্যে শিশু অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তার হাতগুলির ব্যবহার করতে পারে। সোজা হয়ে হাঁটতে শেখে। দৌড় ঝাঁপ করে। বিনা আয়াসে কথা বলতে পারে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে মনের আনন্দে খেলা করবার ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণতঃ সকল শিশুরই শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের ধারাটি যদিও এই রকম তথাপি একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেটা হলো তাদের বিকাশের গতি। কেউ হয়তো বারো মাসে হাঁটতে শেখে, কারও বা ষোল মাস লাগে হাঁটতে। কেউ তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে, কারও বা কথা বলতে অনেক দেরি হয়। যদি দেখা যায় অপর একটি শিশু তেরো মাসে হাঁটতে সুরু করেছে অথচ তার সমবয়সী শিশুটি তখনও ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না, তা হলে এ দেখে দ্বিতীয় শিশুটির মাতাপিতার শঙ্কিত হবার কিছু নেই। তার কারণ, যদিও জড়বুদ্ধি শিশুরা অনেক দেরিতে এবং মন্থর গতিতে কথা বলতে ও হাঁটতে শেখে তথাপি এও দেখা গেছে যে অনেক বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী মানুষও অনেক দেরিতে চলতে এবং বলতে শিখেছিলেন। মাতাপিতা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে, শিশুটি একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ ক'রে বেড়ে উঠছে কিনা; হাঁটার আগে বসতে পারছে কিনা,

পা দুটোকে আয়ত্ত করবার আগে হাত দুটোকে যথারীতি ব্যবহার করছে কিনা। শিশুর এই সব কার্যকলাপের ওপর তাঁদের খুব বেশী হাত নেই—এগুলি প্রধানতঃ নির্ভর করছে তার শরীরের পুষ্টির ওপর। অবশ্য তাঁরা শিশুকে পুষ্টি লাভ করতে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতে পারেন। ক্ষুদ্র শিশুটির ওপর ভারি-ভারি একরাশ জামা কাপড় না চাপিয়ে তাকে যদি প্রত্যেক দিন বেশ কিছুক্ষণ খালি গায়ে রাখা যায়, তবে সে ইচ্ছে মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করবার সুযোগ পাবে। তার চারপাশে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী রাখলে সেগুলি নাড়াচাড়া ক'রে সে বিচিত্র ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তার স্নায়ুতন্ত্র ও পেশীগুলি পরিপুষ্ট হবে। মাতাপিতা যদি বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তা হলে সেও সহজে কথা বলতে শিখবে। তাকে নিয়ে যদি ঘরময় ঘুরে বেড়ানো হয় তবে চলাফেরার ওপর তার সহজ অধিকার জন্মাবে এবং বিচিত্র বস্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তার মানসিক বিকাশকে দ্রুততর করবে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বলবার কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শিশুর পরিপুষ্টি ও বিকাশ যেমন একই গতিতে সম্পন্ন হয় না তেমনি আবার একই শিশুর জীবনে বিকাশ ও পুষ্টির গতিটিও সব সময় সমান তালে চলে না। যেমন এক বৎসরের মধ্যে তার ওজন ও উচ্চতা অতিশয় দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তারপরেই কয়েক বছর ধরে এই গতি মন্থর হয়ে আসে। অতএব কোন এক সময়ে শিশুর ওজন বা উচ্চতা বাড়ছে না দেখে শঙ্কিত হবার খুব বেশী কারণ নেই—অন্য কোন দিকে (যেমন খাদ্য ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে) যদি ত্রুটি না ঘটে তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা চলে।

প্রথম পাঁচটি বছর

মানব জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে শিশু যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করে, যেভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তারই দ্বারা নিরূপিত হয় তার ভবিষ্যৎ জীবন; অর্থাৎ সে কী ধরণের মানুষ হবে, তার ব্যক্তিত্বটা কেমন হবে, সে ভীরুপ্রকৃতির হবে না সাহসী হবে, উদ্যমশীল হবে না উদাসীন হবে, বাধ্য হবে না অবাধ্য হবে, সামাজিক হবে না আত্মকেন্দ্রিক হবে, নিষ্ঠুর হবে না হৃদয়বান হবে, সে কী কী পছন্দ করবে আর কী কী অপছন্দ করবে, আত্মবিশ্বাসী হবে না পরনির্ভরশীল হবে, এক কথায় তার মনের কাঠামোটা কেমন হবে সেটা প্রধানতঃ নির্ভর করছে তার জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরে সে কী ভাবে লালিত-পালিত হবে তার ওপর।

মনঃসমীক্ষকগণ মনোব্যাধির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন প্রায় সর্ব-ক্ষেত্রেই ব্যাধির উৎস নিহিত রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অতি শৈশবের কোন না কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে, যে অভিজ্ঞতা আজ সে সহজে মনে করতে পারে না, কারণ অবদমিত হয়ে তা আশ্রয় নিয়েছে তার অবচেতন মনের গভীরে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক সব রকম আচরণের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনের প্রথম কয়েকটি বছরের, আর অধিকাংশ মনোবিদদের মতে প্রথম পাঁচটি বছরের।

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি' কথাটির তাৎপর্য তাই অত্যন্ত গভীর এবং যেহেতু এ বাণীটি উচ্চারিত হয়েছিল মনঃ সমীক্ষণের জন্মের অনেক আগে আমাদেরই দেশে সেহেতু তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের গর্ব ও গৌরব বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের ধারণা শিশু অবোধ, তাই তার সামনে আমরা অবাধে এমন সব আচরণ করি যা করা ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে অতি শিশুও অত্যন্ত কৌতূহলী এবং অনুকরণপ্রিয়। একটা জিনিষ নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য করেছেন যে বিশেষ বিশেষ পরিবারের—বয়স্ক এবং শিশু উভয়ের আচার আচরণে চিন্তাভাবনায়, রুচি-অরুচিতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যা ভিন্ন পরিবারের লোকেদের মধ্যে দেখা যায় না। শিশু পরিবারস্থ বড়দের আচার আচরণ লক্ষ্য করে, তাদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে, তারা যা ভালো বলে সে তাকেই ভালো বলে মনে করতে শেখে, যাকে খারাপ বলে তাকেই খারাপ ভাবে। সে বড়দের

খুশী করবার জন্য কিংবা তাদের মতো হবার জন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের অনুকরণ করে থাকে, এই ভাবে গড়ে ওঠে তার পছন্দ-অপছন্দ, বিবিধ ধারণা ও সংস্কার, বিশেষ এ ধরণের মনোভঙ্গী যার অনেকটাই তার পরিবারের বড়দের মতো। সমস্ত পরিবারের প্রভাব যেমন পড়ে শিশুর ওপর তেমনি পরিবারের বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রভাবও তার ওপর বিশেষ করে পড়তে পারে। যাকে সে সবচেয়ে ভালবাসে, অর্থাৎ যিনি তাকে বেশী উৎসাহ দেন, তার পক্ষ অবলম্বন করেন, তার অভাব অভিযোগ মেটান, তাঁর প্রভাব তার ওপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করে। আর এই ধরণের ব্যক্তি হলেন শিশুর মাতা অথবা পিতা। শিশু যদি মাকে বেশী ভালবাসে আর তিনি যদি নীল রঙের পোশাক পরিচ্ছদ বেশী ব্যবহার করেন, তিনি যদি সামাজিক হন, যদি সদাপ্রফুল্ল হন তাহলে শিশুও ধীরে ধীরে তাঁরই মতো হয়ে উঠবে; সেও পছন্দ করবে নীল রঙ, ভালবাসবে লোকজনের সান্নিধ্য, আর প্রফুল্লতার আলোকে উদ্ভাসিত করে রাখবে তার মনটিকে।

শিশুর মধ্যে স্বাবলম্বী হবার একটা উদগ্র আকাংক্ষা ও প্রয়াস প্রকাশ পায়। যদি তাকে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ধীরে ধীরে সে আত্ম-নির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে উঠবে। আর যদি তাকে একটি স্নেহের পুতুলী বানিয়ে রাখা হয়, যদি তার সমস্ত কাজ মাতা পিতাই করে দেন, যদি তাকে ঝুঁকি নেবার প্রেরণা দেওয়া না হয় তাহলে সে গড়ে উঠবে ভীরু লাজুক আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে। 'পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে' বেঁধে রাখলে শিশু কখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না।

যে সংসারে নীতির বালাই নেই সেখানে শিশুর মনে নীতির প্রতি নিষ্ঠা জন্মাতে পারে না। বড়রা যদি দুঃস্থদের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করেন তাহলে শিশুর মনে সহানুভূতি ও করুণার সঞ্চার হবে কী করে?

তলিয়ে দেখলে শিশুর ওপর পরিবারের, বিশেষ ক'রে মাতাপিতার অদ্ভুত প্রভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। শিশুর চলার ধরণ, কথাবলার ঢঙ, লেখার ধারা এমনিতর ছোট খাটো অজস্র ব্যাপারে মাতাপিতার বা পরিবারস্থ অন্য কারো আশ্চর্য প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বড়দের রীতিমত সতর্ক হতে হবে, তাঁরা এমন কিছুই করবেন না যা শিশুদের সুস্থভাবে গড়ে উঠবার পক্ষে পরিপন্থী।

শিশু জন্মগ্রহণ করে সম্পূর্ণ কতকগুলি জৈব প্রেরণা (animal impulses) নিয়ে এবং যে ভাবেই হোক না কেন সে এই সব প্রেরণার নির্বাধ ও ত্বরিত

(immediate) চরিতার্থতা চায়। যেমন সে চায় তার ক্ষুধার উদ্রেক হলে তৎক্ষণাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে, দৈহিক অস্বস্তি হলে তা দূর করতে, কোন একটা ইচ্ছে জাগলে অবিলম্বে তা পূরণ করতে। সে যুক্তি মানে না, অপেক্ষা করতে জানে না। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝতে পারে তার চাহিদা মেটাবার জন্য তাকে অন্যের ওপর—অন্যের অবসর মর্জি এবং সঙ্গতির ওপর নির্ভর করতে হয়। এইভাবে তার মধ্যে বাস্তব বোধ গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে সে এটাও বুঝতে পারে যে তার সমস্ত ইচ্ছাই বড়দের অনুমোদন পায় না। বড়রা যেমন তার কোন কোন ইচ্ছার সমর্থন করেন তেমনি কোন কোন ইচ্ছাকে অনুমোদন করেন না। তাঁরা বলেন কোন কোন কাজ ভালো, আবার কোন কোন কাজ মন্দ। তাঁরা বলেন ভালো কাজ করতে হয়, মন্দ কাজ করতে নেই। সে বড়দের ভয়ে কিংবা তাঁদের প্রতি ভালবাসায় তাঁদের নির্দেশ মতো চলতে শেখে। এইভাবে তার শৈশবকালীন নৈতিক সত্তা (super ego) গড়ে ওঠে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শিশুর নৈতিক চিন্তায় যুক্তির কোন স্থান নেই। একটা কাজ বা ইচ্ছে কেন ন্যায় বা কেন অন্যায় যুক্তি দিয়ে তা বুঝবার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটাই তার নেই। বড়রা যেটাকে ন্যায় বলেন সে বিনা দ্বিধায় তাকেই ন্যায় এবং তাঁরা যেটাকে অন্যায় বলেন সে নির্দ্বিধায় তাকেই অন্যায় বলে স্বীকার করে নেয়। শৈশবের এই নীতিবোধটা কিন্তু এমনি দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে সেটি সারা জীবন ধরে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা আবেগ অনুভূতি ও কার্যকলাপকে প্রচণ্ড ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। এমনি করে বড়দের কুশিক্ষা দানের ফলে কতো অজস্র কুসংস্কার আমাদের মনে দৃঢ়বন্ধ হয়ে আছে, যার অসারতা এখন যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলেও আমরা কিছুতেই তার প্রভাবমুক্ত হতে পারিনা। তাই দেখি বড় বড় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকেরাও শনিবার বা বৃহস্পতিবারের দুপুরে ঘর ছেড়ে বেরোন না, যাত্রার প্রাক্কালে টিকটিকি ডেকে উঠলে বা কেউ হেঁচে ফেললে যাত্রা স্থগিত রাখেন, কোন কাজে হাত দেবার আগে দিনক্ষণ দেখে নেন, পাঁচ বা দশবার দেবতার নাম না নিয়ে ঘরের বার হননা, কাগজে পা ঠেকে গেলে অপরাধ বোধ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের অনেক অশান্তি, আত্মগ্লানি ও অপরাধবোধের পশ্চাতে আছে এই ধরণের হাস্যকর অযৌক্তিক নীতিবোধ যা আমরা সংগ্রহ করেছি অতি শৈশবে আমাদেরই পরিবারস্থ বড়দের কাছ থেকে। এই সমস্ত সংস্কার আমাদের পদে পদে আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত করে রেখেছে, আমাদের সহজ ও সাবলীল হতে দিচ্ছে না। এই সব অদ্ভুত আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে গভীর গ্লানি আমাদের মনটাকে আচ্ছন্ন

করে রাখছে। সুতরাং প্রথম পাঁচটি বছর শিশুর সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা দরকার যেন কোন রকম কুসংস্কার তার মনে দানা বাঁধতে না পারে।

আগেই বলেছি আমাদের মনোব্যাধির মূল নিহিত রয়েছে আমাদের অতি শৈশবের কোন না কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে। একটি বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে মা-বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হলোনা। অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়েও যখন কোন ফল হলোনা, তখন প্রায় জোর করেই তার বিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কিছুদিন শ্বশুর ঘর করবার পর মেয়েটি বাপের বাড়িতে পালিয়ে এলো। তার মা-বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা মেয়েটিকে একজন মনঃসমীক্ষকের কাছে নিয়ে গেলেন। মনঃসমীক্ষক তাঁর বিশেষ পদ্ধতিতে মেয়েটির মনোবিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলেন যখন তার বয়েস চার তখন একদিন তার মা ও বাবার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হয় এবং তার বাবা তার মাকে ঘর থেকে বের করে দেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য মা ফিরে এসেছিলেন এবং শিশুটিও পরে সব কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ভুলে গেলেও প্রকৃতপক্ষে তার এই ভয়ানক অভিজ্ঞতাটা অবদমিত হয়ে তার অবচেতন মনে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেটা এতই প্রবল ছিল যে বিবাহিত জীবনের প্রতি তার মনে একটা ভীষণ বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল ; মেয়েটি একথা ভুলে গিয়েছিল তার কারণ সে বাবা ও মা উভয়কেই ভালবাসতো, সুতরাং তাঁদের মধ্যে বিরোধের কথাটা সে মনে রাখতে চায়নি। মেয়েটি যে শুধু বিয়ে করতেই আপত্তি জানিয়েছিল তাই নয়, সে কোন যুবকের সান্নিধ্যও পছন্দ করতোনা। বিয়ের পরও সে সহজ ও ঘনিষ্ঠ ভাবে তার বরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলোনা। মনঃসমীক্ষকের চেষ্টায় মেয়েটি যখন তার অভিজ্ঞতাটি স্মরণ করতে পারলো এবং যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলো যে দাম্পত্য-কলহটা নিতান্তই একটা স্বাভাবিক এবং সাময়িক ব্যাপার মাত্র তখন বিবাহিত জীবনের প্রতি তার যে বিরূপতা ছিল তা দূর হয়ে গেল। এবার সে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়ে মনের সুখে ঘর করতে লাগলো। এই উদাহরণটি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে-ঘটনাকে আমরা কোন গুরুত্বই দিইনা, নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে করি, অগোচরে তাও শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে এবং তার সারা জীবনের গতিটাকে বদলে দিতে পারে। সুতরাং শিশুর সঙ্গে আচরণে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে।

মনোবিদ্যায় Law of Primacy বলে একটা বিধির কথা বলা হয়। এর

অর্থ হলো প্রথম অভিজ্ঞতার শক্তি অমোঘ। অতএব প্রথম পাঁচটি বছরে শিশু যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করবে সেগুলি সুনির্বাচিত হওয়া দরকার, আর এই নির্বাচন নির্ভর করছে মাতাপিতা ও পরিবারস্থ অন্য সকলের সতর্কতা ও আত্মসংযমের ওপর।

ছ বছরে পা দিলে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হয় ছ বছর থেকে, তবুও পাঁচ বছরের ভেতরই শিশুর মধ্যে এমন কতকগুলি অভ্যেস গঠন করে দিতে হয় যেগুলি গড়ে না উঠলে শিশুর পক্ষে বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ে। নিজে নিজে জামা কাপড় পরতে শেখা, খাওয়া, মুখ ধোওয়া, মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করা, শ্লেট পেন্সিল ধরতে শেখা, ইত্যাদি অভ্যেসগুলি বিদ্যালয়ে যাবার আগেই গঠিত হওয়া দরকার। তেমনি দরকার বিদ্যালয়ে যাবার জন্য শিশুর মনে আগ্রহের সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো মানসিকতা তৈরী করে দেওয়া। লিখতে পড়তে শেখবার আগেই ছড়া ছবি গান ও গল্পের মাধ্যমে শিশু অনেক কিছুই শিখতে পারে, এমনি করে তার মনে শিক্ষার প্রতি একটা আন্তরিক অনুরাগ গড়ে ওঠে। এই সমস্ত ব্যাপারেই মাতাপিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সকলেরই বিশেষ একটি ভূমিকা আছে।

আজকাল প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে অভ্যাস অনুরাগ ও মনোবৃত্তি গঠনের জন্য নার্সারি স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, ক্রেস্ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিবারে বাবা মা উভয়েই চাকরি করেন সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের শিশুগুলির রক্ষণাবেক্ষনের জন্যও এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে বাবা-মা এবং প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে যথেষ্ট ভালবাসা সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে তাদের প্রতি ব্যবহার করতে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ

মানব জীবনে ভাষার প্রভাব অপরিমেয়। আমাদের মনের গহনে যে সব বিচিত্র ধরণের চিন্তা ধারণার উদয় হয় ভাষার মাধ্যমে আমরা সেগুলি অন্যের কাছে প্রকাশ করি। আমরা যে সব অভাব নিত্য অনুভব করি ভাষার সাহায্যে তা অন্যের গোচরীভূত করি। শিলালিপি, গ্রন্থমালা, অনুশাসন ইত্যাদির মধ্যে যুগযুগান্তের যে সব কল্পনা ভাষার লেখনে বন্দী হয়ে আছে সে সকল পাঠ ক'রে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করি। ভাষার সাহায্যে সময়ের সীমা অতিক্রম ক'রে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারি। ভাষার মাধ্যমে নিজেকে যেমন অন্যের সম্মুখে প্রসারিত করে দিই, তেমনি আবার অন্যকেও নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করি। আত্মপ্রকাশ, আত্মরক্ষা কৌতূহল, কল্পনা, সমবেদনা প্রভৃতি সহজ ও অর্জিত প্রেরণাগুলি ভাষার সাহায্যেই চরিতার্থতা লাভ করে। ভাষার প্রভাব আমাদের জীবনে সত্যিই বিস্ময়কর।

ভাষা যে শুধু আমাদের কতকগুলি প্রেরণাকেই তৃপ্ত করে তাই নয়, আমাদের ব্যক্তিত্বও ভাষা প্রয়োগের রীতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। ভালো বক্তা শ্রোতার মনে গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন। যিনি ভালো গল্প বলতে পারেন তাঁর আকর্ষণী শক্তিটি প্রবল হয়। তাঁর চারপাশে মুগ্ধ মানবের ভিড় জমে। গভীর কণ্ঠস্বর ব্যক্তিত্বকে গাম্ভীর্যময় ক'রে তোলে, শ্রোতার ওপর যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় কণ্ঠস্বরের বিকার বক্তাকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে। তোতলামি এই রকম একটি স্বর-বিকার। যাঁরা তোতলা তাঁদের জীবনের খাতায় নিশ্চয়ই এই ধরণের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। কথার শক্তি অতি প্রচণ্ড, অত্যন্ত বিস্ময়কর। শুধু কথার সাহায্যেই অনেক কঠিন পীড়ার চিকিৎসা সম্ভব হয়। উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে কথার সাহায্যে বক্তা শ্রোতার মনে নূতন ধারণা, নূতন বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। এই ধারণা এই বিশ্বাস শ্রোতার 'মরমে', তার মনের 'গভীরে' দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এইরূপে বিশ্বাস উৎপাদন করার নাম 'অভিভাবন'। রুগ্ন ব্যক্তির মনে আরোগ্যের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি ক'রে বহু মনোবিজ্ঞানী আশ্চর্য-ভাবে অনেক রোগের উপশম করেছেন। প্রাচীন ভারতে মুনিঋষিদের বরবাক্য অথবা অভিশাপবাণী আশ্চর্যভাবে সফল হয়ে উঠতো। আমাদের বিশ্বাস এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর পশ্চাতে থাকতো 'অভিভাবন'। কণ্ঠস্বরের প্রভাবে একজন আর একজনের ওপর নিদ্রার মায়াও বিস্তার করতে পারে। এই মায়া-নিদ্রার

মোহে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নির্দেশে অনেক অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পন্ন ক'রে দর্শকদের মুগ্ধ করে।

কথন, পঠন, লেখন ভাষার ত্রিবিধ রূপ। কবিতা, কাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাদি যে সব চারুকলা আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের মনে অফুরন্ত আনন্দের সৃষ্টি করে সেগুলি সবই কথারই বিভিন্ন প্রকাশ।

আমাদের স্বরযন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী আছে। ফুসফুস থেকে বাতাস নির্গত হয়ে যখন স্বরযন্ত্রের ভেতর খরগতিতে প্রবাহিত হয় তখন এই স্বরতন্ত্রীগুলিতে শিহরণ জাগে, তন্ত্রীগুলি হিল্লোলিত হয়। যে সব পেশী এই তন্ত্রীগুলিকে চালিত করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কম্পনের তারতম্য ঘটে। বীণার তারগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন সুরে সাধা থাকে, তেমনি আমাদের নাসারন্ধ্রে এবং মুখ-গহ্বরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ সুরে সাধা। বিবিধ প্রকার কম্পনের সংমিশ্রণ থেকে তারা এক একটি কম্পন সঞ্চয়ন ক'রে নেয় এবং একটা বিশিষ্ট সুরে অনুরণিত হয়ে ওঠে। ওষ্ঠ এবং জিহ্বার সাহায্যে এই ধ্বনিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকি।

জন্ম-ক্রন্দন ঃ সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দনই ব্যক্তি-জীবনে স্বর-যন্ত্রের সর্বপ্রথম ব্যবহার। অনেক তথাকথিত দার্শনিক মনে করেন, জন্মক্রন্দনের পশ্চাতে গভীর তথ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেউ কেউ বলেন, শিশু এই পাপময় পৃথিবীর সংস্পর্শ লাভ ক'রে মনের দুঃখে অনুশোচনায় কেঁদে ওঠে। এইরূপ কল্পনা কোন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জন্ম-ক্রন্দন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি জন্মগত প্রতিক্রিয়া। সংকীর্ণ অন্ধকার মাতৃগর্ভ হতে যখন শিশু বিশাল পৃথিবীতে প্রচুর আলোক, পর্যাপ্ত বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে তখন তার সারা দেহে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত অক্সিজেন তার রক্তসঞ্চালনকে দ্রুততর করে দেয়। বায়ুস্রোত খরগতিতে তার স্বরতন্ত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই শিশু কেঁদে ওঠে। এই ক্রন্দনের পশ্চাতে কোন রকম দার্শনিক তথ্যের অস্তিত্ব একেবারেই নেই।

জীবন প্রভাতের বিচিত্র স্বরধ্বনির ভেতর দিয়ে শিশু তার বিভিন্ন অনুভূতিকে প্রকাশ করে। অস্বস্তি বোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। প্রক্ষোভ এবং অনুভূতি প্রকাশের এই রীতি শুধু মানবশিশুর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও এর প্রচলন দেখা যায়। প্রাণীজগতে 'যন্ত্রণাধ্বনি', 'সংকেতধ্বনি', 'আনন্দ-

ধ্বনি' ইত্যাদি বিভিন্ন ধ্বনির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মধুবাহী মৌমাছির গুঞ্জন আর মধুসন্ধানী মৌমাছির গুঞ্জন এক নয়। স্বর-বৈচিত্র্যের সাহায্যে অনুভূতি ও প্রক্ষোভ প্রকাশের নাম 'প্রক্ষোভভাষণ'। মানব শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভভাষণের মধ্যে কোন রকম গুণগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু মাত্রার বা গভীরতার। শিশু শুধু স্বরবৈচিত্র্যের সাহায্যে তার প্রক্ষোভ প্রকাশ করে তাই নয়; অন্য লোকের স্বর অনুধাবন ক'রে সেই স্বরে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সংকেতও সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কয়েক মাসের শিশুকে উপযুক্ত কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শান্ত, উত্তেজিত, উৎসাহিত অথবা নিরুৎসাহ করা সম্ভব।

শৈশব-কাকলী: চার মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে শিশু আবোলতাবোল বকতে শুরু করে। এই সব আবোল-তাবোল বকার নাম শৈশব-কাকলী। ভাষার মধ্যে যে সকল শব্দ আছে শিশু তার প্রায় সবগুলি শব্দই এই সময়ে উচ্চারণ করতে পারে। শিশু প্রথমে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে, তারপর ব্যঞ্জন-ধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখে। স্বরধ্বনির মধ্যে 'অ' ধ্বনি সবচেয়ে আগে উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে শিশু প্রথমে 'ব', তারপর প, ম, গ, ক এবং সবচেয়ে শেষে 'র' এবং 'ল' এর উচ্চারণ আয়ত্ত করে। অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। শিশু যা শোনে তাই অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করবার আগে শিশু শব্দো-চ্চারণের সুর, ঢঙ এবং ছন্দের অনুকরণ করে। শিশু প্রথমে শব্দোচ্চারণের সমষ্টি লক্ষ্য করে, তারপর শব্দান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈশব-কাকলীতে পুনরুক্তি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ শিশু একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করে। যেমন—মা-মা, দা-দা, বা-বা ইত্যাদি। এইসব পুনরুক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন। 'মা-মা'র অর্থ সত্যি সত্যি মামা নয়, 'মা' শব্দটার পুনরাবৃত্তি মাত্র। মাতাপিতা অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর এই সব পুনরুক্তিকে অর্থময় শব্দ বলে ভুল ক'রে থাকেন।

শব্দোচ্চারণ: শিশু শব্দ উচ্চারণ এবং শব্দ প্রয়োগ করবার আগে অন্যের কথা বুঝতে পারে। প্রথম উচ্চারিত শব্দটি সাধারণতঃ কোন একটি অতি পরিচিত বস্তুর নাম। কোন একটি বস্তু যখন শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন উক্ত বস্তুটির নাম অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র শব্দ, কয়েকবার উচ্চারিত হলে উক্ত বস্তু ও শব্দের মধ্যে একটা গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে বস্তুটি শব্দটিকে এবং শব্দটি বস্তুটিকে শিশুর স্মরণ পথে নিয়ে আসে। যাঁদের বাড়ি

টিয়া কিংবা ময়না আছে তাঁরা এই মজার ব্যাপারটা সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন। ও-বাড়ির ভৃত্য গোপাল যখন এ বাড়ি এল তখন গিন্নীমা বললেন—'কী গোপাল?' পাখি গোপালকে দেখলে, গিন্নীমার কথাগুলোও শুনলো। কয়েকবার এই রকম হবার পর দেখা গেলো গোপালকে দেখলেই পাখি বলে—'কী গোপাল?' ঠিক এমনিভাবেই শিশু বেড়ালকে 'মিউ-মিউ' এবং গোরুকে 'হাম্মা' বলতে শেখে। সে যখন বেড়াল নিয়ে খেলা করে তখন বিড়ালটা ডেকে ওঠে 'মিউ মিউ'। বেড়ালের চেহারা আর বেড়ালের ডাক এই দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়। শিশু বেড়াল দেখলেই বলে ওঠে 'মিউ মিউ'। গোরুকে বলতে শেখে 'হাম্মা'। জনৈক পিতা তাঁর শিশু পুত্রকে কান কথাটা বেশ অদ্ভুতভাবে শিখিয়েছিলেন। তিনি শিশুটির একটি কান টেনে বললেন—কান। শিশুটি মজা পেলো। তারপর শিশুটির আর একটি কান টেনে বললেন—কান। এবারও শিশুটি বেশ আমোদ উপভোগ করলো। তখন তিনি শিশুটির একটি হাত তার কানের ওপর রেখে বললেন 'কান'। শিশুটি তৎক্ষণাৎ কান কথাটি শিখে ফেললো এবং কান বস্তুটিকে চিনতে পারলো।

অভিনব শব্দসংকলন: শিশু অনেক সময় অজ্ঞাতভাবে এক একটি সম্পূর্ণ নূতন অত্যাশ্চর্য নাম আবিষ্কার করে। একজন ভদ্রলোক তাঁর বাল্যের অনুরূপ দুটি অভিজ্ঞতার কথা লেখককে জানিয়েছেন। শৈশবে একটা বিশেষ বৈদ্যুতিক পাখাকে ঘুরতে দেখলেই তাঁর মনে হতো পাখাটা যেন—'কপিন্ ফিফ্টিন-কপিন্ ফিফ্টিন'। এই কথাটাকে কোন ইংরাজী কথা বলে মনে করার কোন হেতু নেই, কারণ এ কথাটা যে সময় তাঁর মনে উদিত হয়েছিল তখনও তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেননি। তাঁর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথাটা এখন বলি। তিনি খুব বড়এলাচ খেতে ভালবাসতেন। চিবোতে চিবোতে যখন খুব ঝাল লাগতো তখনকার সেই অবস্থাটাকে তাঁর বড়ো "ণী" মনে হতো। ভাষার এই সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন রকম গভীর গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি। আমাদের বিশ্বাস এ সব ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যক্তি ও জাতির জীবনে ভাষাবিকাশের ধারাটির ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করবে।

শব্দসঞ্চালন: অনেক সময় দেখা যায় শিশু একই নামে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিহিত করছে। এই সময় শিশু সকল বয়স্ক পুরুষকে 'বাবা', বয়স্কা মহিলাকে 'মা' এবং লম্বাবস্তুকে 'লাঠি' সম্বোধন করে। শিশু এই সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করতে শেখে।

শব্দ-সংযোজন: অনেক সময় দুটি পুরাতন শব্দ মিশিয়ে শিশু একটি

নূতন শব্দ সৃজন করে। যেমন শিশু হয়তো 'সূর্যাস্ত' কথাটা জানে না। অথচ সূর্যকে 'সুজ্জি' বলে জানে এবং লুকোচুরি খেলবার সময় কেউ দৃষ্টি পথের বাইরে গেলে 'কু-কু' শব্দ করে এটাও সে লক্ষ্য করেছে। তাই সূর্যাস্তকে (সূর্য যখন দৃষ্টিপথের বাইরে যায়) সে হয়তো একটা অভিনব নাম দিলে—'সুজ্জি-কু-কু'। এই রকম নামকরণের পশ্চাতে যে অপূর্ব মনন শক্তি কাজ করে অনেকেই সেটা না বুঝে শিশুর কথাটাকে অদ্ভুত বলে হেসে উড়িয়ে দেন। ফলে শিশুর আত্মপ্রকাশের প্রেরণাটি প্রতিহত হয়। সে কী বলতে চায় সেটা বুঝতে হবে এবং তাকে উপহাস না ক'রে বড়োদের অভিধানে তার বক্তব্য বিষয়টাকে কী বলে সেটা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

অর্থবোধ ঃ প্রথম যখন একটি স্বতন্ত্র বস্তুর সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র শব্দের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন শিশুর কাছে বস্তুটির 'আকার' ছাড়া আর কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। কিন্তু দিনে দিনে অভিজ্ঞতা যতো বাড়তে থাকে, সে যতোই বস্তুটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে শেখে ততোই সেটা তার কাছে অধিকতর অর্থময় হয়ে ওঠে। শিশু ধীরে ধীরে শেখে কমলালেবু একটি বিশেষ আকারের ফল, খেতে অম্ল মধুর, তার গন্ধটি আমোদিত করে। সুতরাং কমলালেবু কথাটা শিশুর মনে নানারকম ভাবের উদয় করতে পারে। শিশু যখন সবে একটা কি দুটো কথা বলতে শিখেছে তখন সে একটি মাত্র ক্ষুদ্র শব্দের সাহায্যে তার মনের একটা পরিপূর্ণ অভিপ্রায়কেই প্রকাশ করতে পারে। 'কমলালেবু' কথাটা উচ্চারণ ক'রে সে হয়তো বোঝাতে চায়—'ওই যে একটা কমলালেবু', 'আমাকে একটা কমলালেবু দাও' অথবা 'আমি কমলালেবু খাবো' ইত্যাদি। শিশুর সঙ্গে যাঁরা বেশী সময় কাটান তাঁরা তার অঙ্গভঙ্গি, বলার ঢঙ ইত্যাদি দেখে বলতে পারেন একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ কথা দিয়ে শিশু তার মনের কোন্ ভাবটা প্রকাশ করতে চাইছে। শিশুর ইচ্ছাগুলিকে যথাসম্ভব সমর্থন করলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। এর ফলে তার মানসিক বিকাশ উন্নততর ও সুন্দরতর হয়। কিন্তু তার ইচ্ছেগুলো কী জানতে হলে তার কথার অর্থ যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং তার জন্য শিশুর সঙ্গে মাতাপিতাকে খুব বেশী ক'রে মিশতে হবে। যে একটি মাত্র শব্দ বা পদ দিয়ে শিশু একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'একপদবাক্য'।

পদ ঃ শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্য পদের আধিক্য দেখা যায়, কিন্তু আমরা এইমাত্র বলেছি বড়োদের ব্যাকরণ মতে এগুলি বিশেষ্য পদ হলেও শিশুর অভিধানে তারা অনেক সময়ই ক্রিয়ার মতো কাজ করে থাকে, কারণ

একটিমাত্র বিশেষ্য পদ শিশুর একটি পূর্ণ অভিপ্রায়কেই প্রকাশ করতে সক্ষম। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ্য পদের অনুপাত কমতে থাকে এবং ক্রিয়াপদের অনুপাত বেড়ে চলে। শৈশব-কথনে বিস্ময়সূচক শব্দেরও ছড়াছড়ি দেখা যায়। বিশেষণ, সর্বনাম ইত্যাদি অন্যান্য পদ ধীরে ধীরে শিশুর কথনে আত্ম-প্রকাশ করে। সব শেষে ও, এবং, অথবা ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়ের আবির্ভাব ঘটে। দুবছর বয়েসে শিশুর কথোপকথনে বিশেষ্য পদের যে অনুপাত সমগ্র ভাষার মধ্যে বিশেষ্যপদের অনুপাত ঠিক সেই রকম ; কিন্তু শৈশব-কথনে ক্রিয়ার অনুপাত সমগ্র ভাষায় ক্রিয়ার অনুপাতের প্রায় দ্বিগুণ বেশী। এ থেকে বোঝা যায় শিশু বস্তুর চেয়ে কার্যকলাপ সম্বন্ধে অধিকতর কৌতূহলী।

দ্বি-পদ ও বহু-পদ বাক্য : একপদ বাক্য ব্যবহার করার কিছুকাল পর শিশু দ্বি-পদ বাক্য ব্যবহার করে। একটি বিশেষ্য পদ এবং একটি ক্রিয়াপদ (যেমন, 'আমি খাই', 'বাবা যায়', ইত্যাদি) দিয়ে একটি দ্বি-পদ বাক্য গঠিত হয়। বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। বাক্য রচনার এই উৎকর্ষের মূলে আছে শিশু মনের পরিপুষ্টি।

ভঙ্গিমা-ভাষণ : প্রথম প্রথম শিশু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য নানাবিধ অঙ্গভঙ্গিও ব্যবহার করে। কথার অর্থ উপলব্ধি করার আগে শিশু অঙ্গভঙ্গির ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারে এবং শব্দ ব্যবহার করবার আগেই অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে। ধীরে ধীরে সে যখন বুঝতে পারে যে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং শব্দোচ্চারণ অপেক্ষা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারে বেশী শক্তির ক্ষয় হয়, তখন সে অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে শব্দ প্রয়োগ করতে শেখে।

ভাষণ প্রকৃতি : শৈশবে কথন প্রথমে থাকে আত্মকেন্দ্রিক, তারপর ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে ওঠে। আত্মকেন্দ্রিক ভাষণ তিন প্রকারের—(ক) পুনরুক্তি—একই শব্দ বা পদের পুনরাবৃত্তি, (খ) স্বগতোক্তি—নিঃসঙ্গকথন, (গ) যৌথ স্বগতোক্তি—অন্যের উপস্থিতিতে আত্মভাষণ। ভাষা যখন সামাজিক হয়ে ওঠে তখন তার মাধ্যমে শিশু (ক) অন্যের সঙ্গে চিন্তা বিনিময় করে, (খ) অন্যের সমালোচনা করে, (গ) অন্যকে আদেশ করে, (ঘ) অনুরোধ জানায়, (ঙ) ভয় দেখায়, (চ) প্রশ্ন করে, (ছ) প্রশ্নের উত্তর দেয়, ইত্যাদি।

নীরব কথন : শিশুর অভিজ্ঞতা যতো বাড়তে থাকে ততোই সে তার মনের অনেক ভাব গোপন করতে শেখে। বড়োরা যখন কথা বলেন শিশুকে তখন চুপ ক'রে থাকতে শেখানো হয়। এইভাবে শিশু তার মনের ভাবগুলোকে

কথনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে না পেরে মনে মনে চিন্তা করতে সুরু করে। এই নীরব কথনেরই নাম চিন্তন। আমাদের মনে এমন সব ভাবের উদয় হয় যেগুলো প্রকাশ করলে অশান্তি বা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। এই ভাবগুলোকে প্রকাশ না ক'রে আমরা মনের গহনে তাদের লুকিয়ে রাখি। সেগুলো চিন্তার আকারে আমাদের মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে চলে।

স্বরগ্রামের উচ্চতা ঃ অনেক সময়ে দেখা যায় চেষ্টা ক'রেও কোন কোন লোক ধীরে কথা বলতে পারে না। তাদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই ভারি। স্বরযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আরও একটা কারণে স্বরগ্রামের উচ্চতা ঘটতে পারে। শিশুরা অতি শৈশবে ক্রন্দনের সাহায্যে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকে। যথা সময়ে তার প্রতি দৃষ্টি না দিলে শিশু ক্রমশঃ আরও জোরে কাঁদতে থাকে। এই সব শিশুর কণ্ঠস্বর উত্তর জীবনে উচ্চ ও গম্ভীর হয়।

উচ্চারণ বিকার ঃ শিশু যা শোনে তাই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু নিখুঁতভাবে কোন একটি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না, তার কারণ তার চার পাশে যাঁরা আছেন তাঁরাই শব্দটাকে ঠিক মতো উচ্চারণ করেন না। যে শিশুর শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক তার উচ্চারণ বিকার দূর করতে হলে তাকে উপহাস না ক'রে তার কাছে শব্দটির নির্ভুল উচ্চারণ বার বার করতে হবে এবং সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। আর যে শিশুর শ্রবণশক্তি দুর্বল নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করবার সময়ে ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং কণ্ঠের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থান ও পরিবর্তন হয় সেগুলি তার দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শানুভূতির সাহায্যে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

তোতলামি— তার কারণ ও প্রতিকার ঃ অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিশু কিছু একটা বলতে যাবার আগে ইতস্ততঃ করছে, অথবা বার বার একই শব্দ উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে। এর নাম তোতলামি। তোতলামিটা ভালো জিনিস নয়, কারণ অনেক সময় এর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে অপরের কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়। অতি শৈশবেই তোতলামির উদ্ভব হয়ে থাকে এবং প্রতিকারের কোন রকম চেষ্টা না করলে এই স্বরবিকৃতি অধিক বয়েস পর্যন্ত থেকে যায়। সাধারণতঃ দু তিন বছর বয়েসে, পাঠশালায় যাবার সময় এবং যৌবন আরম্ভ হলে তোতলামি ঘটতে দেখা যায়। কারণ, পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনে এই সব সময়ে প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার উদ্দেশ্যে শিশুকে রীতিমত প্রয়াস করতে হয়। দু তিন বছর বয়েসে শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বীজটি সবেমাত্র অঙ্কুরিত

হতে সুরু করেছে—পরিবেশ থেকে নিজেকে পৃথক্ করে উপলব্ধি করতে সুরু করেছে সে। তারপর পাঠশালায় যখন সে এলো তখন তার জগতের রূপটাই গেলো বদলে। নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, নতুন নতুন আসবাবপত্র, বিচিত্র পাঠ্য বিষয় সব কিছু মিলে একটা নতুন বিশ্বের সৃষ্টি করলো তার চারিপাশে। এরপর যখন শিশু যৌবনের পথে পা দিতে সুরু করে তখন তার দেহের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অসীম পরিবর্তন ঘটে। অপরের কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে সে। জীবনের এই তিনটি জটিল মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের যে বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে সময়ে সময়ে ভাষার গতি তাল রাখতে পারে না। চিন্তা এগিয়ে চলে, কথা পড়ে পিছিয়ে। তাই মাঝে মাঝে স্বরের বিকার অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অতি সাধারণ কারণটি ছাড়াও তোতলামির আরও অনেক কারণ আছে। শিশুর চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ কেউ যদি তোতলা কথা বলেন, তাহলে শিশুও নিজের অজান্তে তাঁকে অনুকরণ করে। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা শিশুর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, কাজেই অবাঞ্ছিত সঙ্গ থেকে তাকে দূরে রাখাই ভালো। কোন শিশু তোতলামি করছে দেখে তাকে উপহাস করলে, অথবা ধীরে ধীরে কথা বলার জন্য তাকে উপদেশ দিলে কিংবা সে যে কথাটা বলতে চাইছে সেটা আর কেউ আগ বাড়িয়ে বলে দিলে তার ফল হয় অত্যন্ত খারাপ। ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যাতে ক'রে সে বুঝতে পারে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখাবার তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। মাতাপিতা সব সময় লক্ষ্য রাখবেন কী রকম পরিস্থিতিতে তাঁদের শিশুরা তোতলামি করছে। অনেকে পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই তোতলামি সুরু করে। এরা যাতে প্রচুর বিশ্রাম উপভোগ করবার অবকাশ পায় সে রকম ব্যবস্থা করা দরকার। আবার অনেক সময় দেখা যায় বেশী ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এলে কোন কোন শিশু হতভম্ব হয়ে তোতলামি সুরু করে দেয়। এদের সঙ্গীসংখ্যা কমিয়ে দেওয়াই ভালো। আবার বেশী অভ্যাগতের সামনে কোন-কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাতে হলে যে সব শিশু তোতলাতে থাকে অনুরূপ পরিস্থিতি থেকে তাদের দূরে রাখাই শ্রেয়। অনেক মাতাপিতা শিশুসন্তানকে অন্যের কাছে শ্লোক, ছড়া ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়ে প্রচুর গৌরব অনুভব করেন। অসহায় শিশুটি নতুন পরিস্থিতিতে যদি বার বার তার কথা ভুলে যায়, অথবা ইতস্ততঃ করে, তাহলে তাকে ভয় দেখান, তিরস্কার ও উপহাস ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এই ধরণের আচরণের ফলে শিশুর তোতলামি ক্রমেই বেড়ে চলে এবং নিজের

ওপর সে আস্থা হারাতে সুরু করে। তাছাড়া মাতাপিতার প্রতি তার মনে বেশ একটা বিরোধিতার ভাবও দানা বাঁধতে থাকে। বিদ্যালয়েও তোতলা ছেলেমেয়েদের প্রতি যথেষ্ট সংযত ও সদয় ব্যবহার করা দরকার। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোনকিছু উত্তর দিতে বা কিছু মুখস্থ বলতে তাদের পীড়াপীড়ি করা একেবারেই ঠিক নয়। সবচেয়ে ভালো তাদের নিয়ে একটা ভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্যে তাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করা। মাতাপিতার অন্য একপ্রকার আচরণের ফলেও শিশুর কথায় তোতলামি প্রকাশ পেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, মাতাপিতা যখন কোন অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন এমন সময় শিশু যদি কোন কথা বলতে চায় তাহলে তাকে নিরস্ত করে ভদ্রতা শেখানো হয়। এইভাবে প্রকাশোন্মুখ চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হলে শিশুর মনে যে আবেগরাশি সঞ্চিত হয় তার ফলে সে তোতলা হয়ে পড়তে পারে। উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া শৈশবকালে মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত, হাম প্রভৃতি শারীরিক পীড়া, পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত কোন স্নায়ুগত বৈকল্য প্রভৃতির ফলেও তোতলামির সৃষ্টি হতে পারে। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিবিধান সম্ভব। তোতলামির সবচেয়ে বড় ওষুধ সহানুভূতি। তোতলা শিশুকে উপহাস না করে ধৈর্য এবং সহানুভূতি দিয়ে তার কথা শুনলে, আবেগময় সকল রকম পরিস্থিতি থেকে তাকে দূরে রাখলে সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। শিশুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলা, তার প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া এবং কথা বলতে তাকে উৎসাহিত করা সকল মাতাপিতারই একান্ত করণীয় কাজ। কারণ এই সব আচরণ নিখুঁত ভাষাবিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

স্বাভাবিকভাবে ভাষাবিকাশের অন্তরায়ঃ নানা কারণেই স্বাভাবিকভাবে ভাষার বিকাশ বিঘ্নিত হতে পারে। প্রথমতঃ শিশু যদি ভঙ্গিমাভাষণের সাহায্যে তার মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে, তবে সে সহজে কথা বলতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ শিশুর বধিরতা তার ভাষা বিকাশের পথে অতি বড় অন্তরায়। যে শিশু আজন্ম বধির সে স্বভাবতঃই মূক হয়। যদিও তার স্বরযন্ত্র সম্পূর্ণ অক্ষত, তথাপি অন্য কারও কথা শুনতে পায় না বলেই সে কথা বলা শিখতে পারে না। তৃতীয়তঃ শিশুর আগ্রহ যদি অন্য দিকে সঞ্চালিত হয় তবে তার ভাষাবিকাশ ব্যাহত হতে পারে। সাধারণতঃ শিশু যখন কথা বলতে আরম্ভ করে সেই সময়ে সে হাঁটতেও সুরু করে। যদি হাঁটাহাঁটিতে সে বেশী আনন্দ পায় তবে ভাষার দিকে তার মনোযোগ কমে আসে। চতুর্থতঃ

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিশু কোনও প্রচলিত ভাষা শিক্ষা না ক'রে আশ্চর্যভাবে তার নিজস্ব সম্পূর্ণ নূতন একটি ভাষা সৃষ্টি করে। এই সব শিশু অনেক দেরিতে প্রচলিত ভাষা শিখে থাকে। পঞ্চমতঃ অনেক সময় শিশু তার মনের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে বলার আগেই মাতা অথবা পিতা তার কথা বুঝতে পারেন এবং তার অভাব পূরণ ক'রে থাকেন। তাই শিশু সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করার প্রয়োজন বুঝতে পারে না, ফলে ভাষাবিকাশ তার সম্পূর্ণ হয় না।

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে, ক্ষুদ্র বাক্য এবং জটিল বাক্য তাড়াতাড়ি ব্যবহার করে, বেশী নিখুঁত ভাবে অনুকরণ করতে পারে, উচ্চারণে কম ভুল করে, অর্থাৎ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভাষায় অধিকার বেশী। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—'নারী জাতি মুখরা,' 'নারীর রসনা ক্ষুরধার,' ইত্যাদি। জানি না এই সব প্রবাদ বাক্যের পশ্চাতে কতটা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে।

বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার একটা নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ বর্তমান। সকল বুদ্ধিমান শিশুই কথা বলতে শেখে না সত্যি, কিন্তু যে সব শিশু তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে তারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান হয়। ভাষা বিকাশের ওপর পরিবেশের প্রভাবও যথেষ্ট। উন্নত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ বেশী সংখ্যক এবং বেশী মার্জিত ধরণের শব্দ ব্যবহার করে, অর্থাৎ তাদের শব্দভাণ্ডারে থাকে অনেক বেশী শব্দরত্ন। যে শিশু অধিকবয়স্ক বালক-বালিকার সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও বেশী সংখ্যক শব্দ ব্যবহার করে, তার কারণ যাদের সঙ্গে তারা মেশে তাদের শব্দসম্ভার প্রচুর।

যারা ডান হাতের চেয়ে বাম হাতের ব্যবহার বেশী করে কখনো কখনো তাদের মধ্যে নানারকম ভাষাবিকার লক্ষিত হয়।

মানব জীবনে ভাষার প্রয়োজন অনেক। তাই ভাষাবিকাশের ধারাটি যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে মানবমনের বিকাশের প্রকৃতিটিও সহজেই বুঝতে পারবো। আমাদের দেশে উন্নত ধরণের শিশুসাহিত্য খুবই বিরল। এর প্রধান কারণ শিশুর ভাষায় শিশুর সাহিত্য রচিত হয়নি। আমাদের পরিপক্ক ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে কোন রকম রেখাপাত করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। সত্যিকারের শিশুসাহিত্য গড়তে হলে শিশুর শব্দসম্ভার জানতে হবে, ভাষাবিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার মনোজগতে কী কী পরিবর্তন ঘটে সেটা লক্ষ্য করতে হবে—এক কথায় শিশুর জীবনে ভাষাবিকাশের ধারাটিকে শ্রদ্ধা দিয়ে দরদ দিয়ে অনুসরণ করতে হবে আমাদের।

সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশ

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে অপরাপর প্রাণীরই মতো দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। পুরাকালে মানুষ যখন অনুন্নত ছিল, তখন তারা বৃক্ষ-গহ্বরে অথবা গিরিগুহায় দিনাতিপাত করতো। তখন বন্যপশু, দুরন্ত প্রকৃতি প্রভৃতি সাধারণ শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের দল বেঁধে বসতি করতে হতো। এই সাধারণ প্রয়োজন ছাড়াও দল বেঁধে বসবাস করার পশ্চাতে আরও অনেক সহজাত প্রেরণার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ নিত্য-বর্তমান। যৌন প্রবৃত্তির প্রেরণায় যখন স্ত্রী-পুরুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন একান্ত আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। স্ত্রী-পুরুষের এই মিলনকে সমাজের ক্ষুদ্রতম রূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার প্রিয়বস্তুকে নিতান্ত নিবিড় করে পাবার ইচ্ছা, তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। যে দুটি নরনারীর মধ্যে যৌন কারণে মিলন ঘটে তাদের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির সঞ্চার হয় এবং তারা পরস্পরকে নিবিড়তম করে পাবার উদ্দেশ্যে একত্র দিনাতিপাত করতে শুরু করে। কিন্তু আত্ম-সুখের জন্য একত্রিত হলেও তাদের মধ্যে বংশরক্ষা করার যে প্রেরণা বর্তমান তারই প্রভাবে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে তারা পরিত্যাগ করতে পারে না। পক্ষান্তরে অতিশয় যত্ন সহকারেই তারা আপন আপন সন্তানের লালনপালন ক'রে থাকে। যে প্রাণীর মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য নেই ধরাপৃষ্ঠে তার অস্তিত্ব বেশী দিন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। তাই প্রকৃতি জনকজননীর মনে সন্তানসন্ততির প্রতি গভীর আকর্ষণ ও সম্প্রীতির সঞ্চার ক'রে দেয়। এই কারণে স্ত্রী-পুরুষের মিলনসঞ্জাত ক্ষুদ্রতম সমাজের পরিসরটি দিনে দিনে প্রসারিত হতে থাকে। দুটি প্রাণীর দ্বারা রচিত নিভৃত সমাজটি একটি ক্রমবর্ধনশীল পরিবারে পরিণত হয়। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আবার বিবিধ জৈব কারণে আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জীবন ধারণ করার জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন তার সবগুলোই একজন মানুষ সংগ্রহ করতে পারে না, সব কাজ করার যোগ্যতা সকলের নেই এবং সব কিছু করার অনুকূল পরিবেশও সবার ভাগ্যে জোটে না। যারা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী শস্যের জন্য তাদের সমতলবাসীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে ভালো তীরের ফলা তৈরী করতে পারে গৃহপালিত পশুর জন্য তাকে এমন আর একজনের ওপর নির্ভর করতে হয় যে নাকি বন্য পশুকে বন্দী করার এবং পোষ মানাবার কৌশলটা ভালো ক'রে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই সব বিভিন্ন কারণে নিকটবর্তী কতকগুলি পরিবারের মধ্যে একটা

সন্ধি স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যে আদান-প্রদান চলতে থাকে। এইভাবে পরিবারের গণ্ডি বিস্তারিত হতে হতে গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একদল মানুষের সঙ্গে আর একদল মানুষের যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। গোষ্ঠীর প্রসারণের ফলে জাতির উদ্ভব হয়। বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে আন্তর্জাতিক সমাজচেতনার বিকাশ ঘটে। জাতির জীবনে এমনি ক'রে ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সমাজচেতনা উন্মেষ লাভ করে। মানুষের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন আছে। যা আমাদের অস্তিত্বের অনুকূল তাকে যদি আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে না নিই, যদি তাকে ভালো না বাসি তাহলে আমাদের জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে। তাই মানুষ দলগত জীবনকে সোহাগ করতে শিখেছে, অর্থাৎ সামাজিক জীবনের প্রতি তার মনে একটা অন্ধ আকর্ষণের, গভীর ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছে। এটাই হলো সমাজবোধ বা সমাজচেতনা। এই সমাজচেতনা একটি ব্যক্তির জীবনে কীভাবে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে—সমাজবোধের শতদল পদ্মটি একটি একটি ক'রে পাপড়ি খুলতে খুলতে কেমন ক'রে প্রস্ফুটিত হয় সেটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা সুদীর্ঘ ও সূতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পর সমাজচেতনার ক্রমোন্মেষের যে ধারাটি আবিষ্কার করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে সেই ধারাটিকেই আমরা অনুসরণ করবো।

শিশুর বয়েস যখন প্রায় দু মাস তখন সে মানুষের মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বর শুনে হেসে ওঠে। এই হাসিই তার সমাজচেতনার প্রথম স্ফূর্তি। অর্থাৎ এই সময়ই শিশু সর্বপ্রথম তার পাশে আর একজনের উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথম প্রথম শিশু দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখাবয়ব বা কণ্ঠস্বরের কোনরকম পরিবর্তন বুঝতে পারে না। ক্ষুব্ধ বা ফুল্ল মুখ, তীক্ষ্ম বা মিষ্ট স্বর তার মুখে হাসি ফোটাবার পক্ষে সমান উপযোগী। যখন শিশুর বয়েস পাঁচ সাত মাস, তখন সে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সমগ্র মুখমণ্ডলটি তন্ন তন্ন ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে শেখে এবং তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখমণ্ডলে ও কণ্ঠস্বরে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটে তার দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে বা ক্রুদ্ধ চাহনিতে শিশু ভীত হয়ে পড়ে। মিষ্ট স্বরে ও মধুর চাহনিতে তার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। এই সময় শিশু রহস্য বা তামাশা উপলব্ধি করতে পারে না, অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি যদি ক্রোধের ভান করেন তা হলেও শিশু তাঁর এই কৃত্রিম প্রক্ষোভটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে এবং তার দ্বারা যথারীতি প্রভাবিত হয়। যখন শিশুর বয়েস প্রায় আট মাস, তখন

থেকে সে কৌতুকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে এবং তার মধ্যে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। অনেকে মনে করেন হাসির সঙ্গে সমাজ-চেতনার কোন সম্বন্ধ নেই, এটা একটা প্রতিবন্ধ প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাঁদের মতে ক্ষুধার্ত শিশু আহার ক'রে তৃপ্ত হ'লে স্বভাবতঃই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু এইরূপ তৃপ্তির সময়ে সাধারণতঃ মা শিশুর মুখের কাছে নিজের মুখ রেখে নানারকম কথাবার্তা বলে থাকেন। বার বার এই রকম ঘটবার ফলে শিশু মায়ের মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বর শুনে বা অনুরূপ চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেই হেসে ওঠে। সুতরাং এই আচরণের পশ্চাতে সমাজ-চেতনার ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে এমন মনে করার কোন হেতু নেই। এঁদের যুক্তিটা আপাতদৃষ্টিতে বেশ শক্ত মনে হয় বটে, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এটা খুব একটা দৃঢ় যুক্তি নয়। আহারান্তে শিশুর মনে যখন আনন্দের সঞ্চার হয়ে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে, তখন মার মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর ছাড়া আরও অনেক বস্তুও নিয়মিত তার চারিপাশে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এই সব বস্তু তো কখনো শিশুর মুখে হাসির উদ্রেক করতে পারে না। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এই তারতম্যটাকে প্রতিবন্ধ প্রতিক্রিয়ার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা তাই সম্ভব নয়। সেজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই মেনে নিয়েছেন হাসিটা সমাজ-চেতনারই একটা স্বাভাবিক বাহ্যপ্রকাশ।

শিশু সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে তিনি মাতা পিতা অথবা অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তি। এই বয়স্ক সঙ্গীটি নিজের কার্যকলাপের সহায়তায় শিশুকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে থাকেন। প্রায় ছয় মাস বয়েসে দুটি শিশুর মধ্যে সংস্পর্শ স্থাপিত হয়। অতি শৈশবেই শিশুদের মধ্যে দুরন্ত, শান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়; এই সব মনোভাব প্রধানতঃ বয়েস, পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যে শিশুর বয়েস অধিক তার পুষ্টিও অধিক এবং তার কর্মক্ষমতাও বিচিত্র। স্বভাবতঃই সে অল্পবয়স্ক শিশুর ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার ক'রে থাকে।

জীবনের প্রথম বৎসরে শিশুর সঙ্গী থাকে মাত্র একজন। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যভাগে যদিও তিনটি শিশুকে একত্র খেলা করতে দেখা যায় তথাপি তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত একজনের সঙ্গই শিশু পছন্দ করে। তারপর বয়স যতো বেড়ে চলে তার সঙ্গী-সংখ্যাও ততোই বাড়তে থাকে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ শিশু প্রায়ই দেখা যায় না। যদিও এক থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গীহীন শিশুর দেখা মেলে, তথাপি এও দেখা গেছে যে এক বছর বয়েসে তাদের শতকরা হার যা থাকে দু'বছরে থাকে তার চেয়ে কম, তিন বছরে আরও কম। এমনি-

ভাবে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে সাত বছর বয়েসে তারা সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ সাত বছর বয়েসের শিশুদের মধ্যে কেউই প্রায় নিঃসঙ্গ থাকে না। বেশী বয়েসের শিশুরা বড়ো বড়ো দল রচনা করে। প্রত্যেক দলের একজন দলপতি থাকে। যে কোন শিশু ইচ্ছে করলেই দলপতি হতে পারে না। শিশুর বয়েস যখন আট-দশ মাস তখনই লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সে ভবিষ্যতে দলপতি হতে পারবে কী না। যে শিশু স্বভাব-দলপতি সে কখনো ভয় দেখিয়ে বা আক্রমণ ক'রে তার সঙ্গীসাথীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে না—উৎসাহিত ক'রে, যথারীতি পরিচালিত ক'রে সে তাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্য কোন শিশুর সম্মুখে এসে সে আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে না। খেলাধুলা পরিচালনা করে এবং কাকে কী করতে হবে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেয়। তার পরিচয়ের গণ্ডি খুব বড়ো হয়। উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সংগঠনীশক্তি দলপতির চরিত্রের প্রধান উপাদান। দলপতি তার দলের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে প্রয়াস পায়।

খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে অথবা অন্যান্য যেসব স্থানে অনেক শিশুর সমন্বয় ঘটে, সেখানে সর্বপ্রথমে কোন সুনির্দিষ্ট দল থাকে না। এই অসম্বদ্ধ শিশু-সমাবেশের মধ্যে হয়তো দু-চারটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের অস্তিত্ব থাকে। ধীরে ধীরে এই স্বতন্ত্র পরিচয়ের গণ্ডি প্রসারিত হতে থাকে, অর্থাৎ দুজনের অধিক শিশুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে অসম্বদ্ধ শিশু-সমাবেশটি একটি সুসম্বদ্ধ শিশুর দলে পরিণত হয়। পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ঘটে। একটি দলে সকল সদস্যের মূল্য সমান নয়। যে দলপতি, সবাই তার নির্দেশ মেনে চলে। দলের সদস্যদের তুলনায় দলপতির বেশী বুদ্ধিমান হবার কোন প্রয়োজন নেই। দলের কী দরকার সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধি দলপতির থাকলেই যথেষ্ট। তাছাড়া অন্যান্য সদস্যগণের পরামর্শ এবং যুক্তি মেনে নেবার মতো উদারতা দলপতির থাকতে হবে। বিদ্যাবত্তা বা বুদ্ধিমত্তা এক্ষেত্রে বড়ো কথা নয়।

কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেহমনের প্রচুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-তরুণীদের মনে সমাজের প্রতি একটা বিদ্রোহী ভাব দেখা যায়। এই বিদ্রোহী ভাব সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় দুইই হতে পারে। তরুণীদের ক্ষেত্রে এই মনোভাব দু'মাস থেকে ছ'মাস পর্যন্ত বর্তমান থাকে এবং প্রথম ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হয়। তরুণদের ক্ষেত্রেও উক্ত মনোভাবের স্থিতিকাল মাসকয়েক মাত্র। এই তরুণ-তরুণীরা সমাজের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই সময় মাত্র একজনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ বন্ধুত্ব আন্তরিক হয়। চলতি কথায় এইরকম বন্ধুযুগলকে 'মাণিকজোড়' আখ্যা দেওয়া হয়। মাণিকজোড়ের মধ্যে গভীর বিশ্বাস, সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব দেখা যায়। এই সময় অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে আদর্শ-প্রীতি দেখা যায়। কোন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণে মুগ্ধ হয়ে তারা তাঁকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে।

বুদ্ধি ও মানসিক গঠনের ওপর দলগত জীবন প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে। দলের অপরাপর সঙ্গীর তুলনায় যার বুদ্ধি খুব বেশী অথবা কম সে নিজেকে ঠিক মতো তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। কোনও একটি শিশুর মানসিক গঠন স্বভাবতঃই এমন হতে পারে যে কোলাহলের চেয়ে সে নির্জনতা বেশী পছন্দ করে। তার এই মানসিক গঠনের বিশিষ্টতা প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল—তার বংশধারা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তার মাতাপিতা কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় যদি নির্জনতাপ্রিয় হন, তবে তারও নির্জতাপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা বহুজনের সংস্পর্শে তার যে সব অভিজ্ঞতা ঘটে সেগুলি যদি তিক্ত হয়, তবে সে ধীরে ধীরে নিজেকে অপরের সংস্পর্শ হতে দূরে সরিয়ে নেয় এবং নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যে সময়ে শিশুর মধ্যে অহংবোধের সঞ্চার হয়, যখন সে প্রথম বিদ্যালয়ে এবং খেলার মাঠে কিংবা অন্য কোথাও সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির মধ্যে আনাগোনা সুরু করে এবং যৌবনাগমে যখন তার মধ্যে প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব ঘটে, তখন সে অপরের সঙ্গে নিজেকে যথাযথভাবে সহজে মানিয়ে নিতে পারে না। এর ফলে তার সমাজচেতনার বিকাশ ব্যাহত হয়। এড্‌লার প্রমুখ মনীষীরা মনে করেন শিশুর সমাজ-চেতনার বিকাশ পরিবারের দ্বারা প্রভূত পরিমানে প্রভাবিত হয়। জ্যেষ্ঠ সন্তানকে মাতাপিতা দায়িত্বশীল ক'রে গড়তে চান। সে বহির্বিশ্বের সংস্পর্শে আসার যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাই তার সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। কনিষ্ঠ সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতাপিতার নয়নমণিস্বরূপ। অধিক মাত্রায় আদর যত্ন পাবার ফলে সে অপরের সুখসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিতে শেখে না। নিজের স্বার্থ পুরোমাত্রায় বুঝতে শেখে এবং পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই কারণে তার মনে সমাজবোধের যথারীতি বিকাশ ঘটতে পারে না। তাছাড়া সৎপুত্র বা কন্যা, পালিত সন্তান, মাতৃ-বা-পিতৃহীন শিশু অথবা অনাথ বালক-বালিকাদের মধ্যেও সুস্থ সমাজবোধের সঞ্চার হয় না, কারণ তারা ঘরে বাইরে যেরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেগুলি সমাজ-চেতনার প্রতিকূল। বিকলাঙ্গ

শিশুরাও সহজে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না, কারণ সমাজ তাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তার ফলে তাদের মনে একটা হীনতাবোধের সৃষ্টি হয়। তারা নিজেদের অন্যের চেয়ে ছোট ক'রে ভাবতে শেখে এবং অন্যের সান্নিধ্য থেকে দূরে দূরে থাকে। সমাজের মধ্যে কোন একটি বিশেষ পরিবারের যে স্থান তার ওপরেও সেই পরিবারের সমাজবোধ বহুলাংশে নির্ভর করে।

শিশু ধীরে ধীরে কীভাবে সামাজিক হয়ে ওঠে সেটা আমরা লক্ষ্য করলাম। যে শিশুটি একদিন অপরের সঙ্গে মেলামেশা করা দূরের কথা নিজেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করতে পারতো না, সে ক্রমে ক্রমে বড়ো হয়ে একজন দুজন ক'রে অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে সুরু করে এবং কালক্রমে নিজেকে মানব-সমাজের একজন বলে ভাবতে শেখে ও অপরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। জাতির সমাজ-চেতনার মূলে যেমন অনেক কারণ আছে তেমনি ব্যক্তির সমাজবোধের পশ্চাতেও কতকগুলি কারণ আছে। সবচেয়ে প্রথমে শিশুর অসহায় অবস্থাই অপরের সান্নিধ্য ও সাহায্যের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে। জীবনধারণের জন্য তার যা প্রয়োজন তা পেতে হলে তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যখন তার বয়েস প্রায় তিন মাস, তখন সে আন্তরিকভাবে অন্যের সঙ্গ কামনা করে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনরূপ প্রয়োজনবোধ নেই। তিন মাসের শিশুকে ঘরের মধ্যে একলা ফেলে চলে গেলে অথবা তার প্রতি মনোযোগ না দিলে সে কেঁদে ওঠে। পাশে যারা থাকে শিশু নানাভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পায়। যদি তিন মাসের দুটি শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে রাখা যায়, তবে দেখা যাবে তারা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। যেখানে একটি সাধারণ বস্তু বা বিষয়ের ওপর অনেকগুলি শিশুর সমান আগ্রহ থাকে, সেখানে তাদের মধ্যে একটা স্থায়ী সংযোগ গড়ে ওঠে। রঙীন ছবি, খেলনা পুতুল প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক সামগ্রীর সাহায্যে একাধিক শিশুকে একত্রিত করা এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত সহজ। শিশু যতো বড়ো হতে থাকে ততই তার জ্ঞানপিপাসা প্রবলতর হয়। এই পিপাসা মেটাবার উদ্দেশ্যে শিশু অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে। প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে তার জ্ঞানভাণ্ড ক্রমে ক্রমে পূর্ণতর হতে থাকে। শিশু সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং সমাজের মধ্যেই তাকে জীবনযাপন করতে হয়, যাদের সঙ্গে তাকে দিনাতিপাত করতে হবে সে যদি তাদের মতো ক'রে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারে তাহলে তার জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। তাই চারপাশে যারা

আছে, তাদের অনুকরণ করার প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে প্রচণ্ড। অন্যকে অনুকরণ করতে হলে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। তাই অনুকরণেচ্ছাও শিশুকে সামাজিক হয়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা, আত্মবিকাশ প্রভৃতি প্রেরণাগুলিও সমাজের বাইরে বিকাশলাভ করতে পারে না। শিশু সমাজকে ভালোবাসতে শেখে তার কারণ সমাজ-জীবনেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

শিশুর চিত্রাঙ্কন

চিত্রাঙ্কন একটি সুকুমার শিল্প। চিত্রণের পশ্চাতে আছে শিল্পী-মনের কোমলতা, শিল্পীর সৌন্দর্যানুভূতির গভীরতা, আনন্দ আস্বাদনের নিবিড়তা। স্বভাব-শিল্পী তাঁর চিত্রাঙ্কনের ভেতর দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করেন। বিচিত্রতার মর্ম-স্থলে সৌন্দর্যের যে ঐকতান নিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে তাকেই উপলব্ধি ক'রে চিত্রকর চিত্রণের মধ্যে তাঁর সেই বিরাট অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রে থাকেন। অনন্তকে বন্দী করেন তিনি রেখা দিয়ে—অরূপকে রূপায়িত ক'রে তোলেন রঙের পরশ দিয়ে। কিন্তু এ সব তো হলো সৌন্দর্য-বোধের, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথা। চিত্রের সহায়তায় মানুষ তার সৌন্দর্য-প্রিয়তাকে প্রকাশ করতে শিখেছে, চিত্রণের মাঝে অসীমকে আস্বাদন করতে জেনেছে অনেক পরে। চিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল অন্য উদ্দেশ্যে, অন্য ধরণের অভাব মেটাবার প্রয়োজনে। কেউ কেউ মনে করেন চিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল তখন যখন মানুষ ভাষার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করতে শেখেনি। তখন মানুষ পরস্পরের কাছে মনের কথা খুলে বলতো ছবি এঁকে, আকারে ইঙ্গিতে। এইভাবে পশু, পাখি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, নদ-নদী, মাঠ-ঘাটের ছবির সৃষ্টি হলো। তখনকার দিনের ভূ-প্রকৃতি. জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা রেখায়িত হলো নানা স্থলে—নরম মাটির গায়ে, নদীর চরে, গিরিপৃষ্ঠে, বৃক্ষ-বল্কলে। এক একটি চিত্র একটি সামগ্রীর, প্রাণীর বা ঘটনার প্রতীক হয়ে উঠলো। ভাষার পূর্বে অথবা পরে চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয় নিয়ে মতামতের প্রচুর অনৈক্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কিছুই নেই। চিত্রণ ভাষণ অপেক্ষা প্রবীণ কী নবীন যাই হোক না কেন, দুটিরই ভেতর যে মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস আছে—অন্যের কাছে নিজেকে উন্মোচিত ক'রে দেবার প্রেরণা রয়েছে তা অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতেই পারে না। ভাষা এবং চিত্র দুয়ের পশ্চাতেই বিকশিত হয়ে ওঠার, প্রকাশিত হয়ে যাবার যে বেদনা-ধারাটি চির-প্রবহমান তার কলকল্লোল সহজেই শুনতে পাওয়া যায়।

শিশুর জীবনে ভাষার ক্রমবিকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। তার সঙ্গে অংকনের ক্রমবিকাশের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য একের চিন্তা ধারণাকে অপরের কাছে প্রকাশ করা। কিন্তু যে জন্মক্রন্দন স্বর-যন্ত্রের সর্বপ্রথম ব্যবহার তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যেমন কোন চিহ্ন নেই, সেই রকম আঠারো মাসের একটি শিশু পেন্সিল নিয়ে খেলা করার সময় যে সব আঁকিবুকি কাটে তার মধ্যেও কোন কিছুকে এঁকে প্রকাশ করার ইচ্ছে তার একেবারেই থাকে না।

শিশুর বয়েস যখন দু'বছর তখন সে যে সব আঁচড় কাটে সেগুলো মাঝে মাঝে একত্র সাম্মিলিত হয়ে এক একটা রেখাপুঞ্জের সৃষ্টি করে। আড়াই বছর বয়েসে শিশুরা কতকগুলো হাবিজাবি রেখা টেনে তাদের হাত, পা, মাথা, চোখ, কান, দরজা, জানালা ইত্যাদি নাম দেয়। আগে যা-তা একটা কিছু আঁকে, তারপর সেটার নামকরণ করে। তিন বছর বয়েসে শিশু আঁকবার আগে কী আঁকবে সেটা আগে বলে, তারপর আঁকে। যে বস্তুটা আঁকতে চায় তার এক একটা অংশ আঁকে, পরে নামটা বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তার সঙ্গে পূর্ব-ঘোষিত বস্তুটার বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। প্রায় চার পাঁচ বছর বয়েসে শিশু যে বস্তুটা আঁকতে চায় তার সঙ্গে তার অঙ্কিত চিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে, যে বস্তুটা সে আঁকতে চাইছে সেটা যদি তার সম্মুখে থাকে তাতে তার অংকনের বিশেষ কোন লাভ হয় না। বস্তুটাকে এখন যে রকম দেখছে তার চাইতে বস্তুটা সম্বন্ধে সে যা জানে তাকেই তার চিত্রের মধ্যে প্রাধান্য দেয়। তাই শিশু যখন ছবি আঁকে তখন বস্তুটির (নমুনা) অবস্থানের প্রতি সে কোনরকম দৃষ্টিপাত করে না। সম্মুখে বস্তুটি থাকলে সে যেমন ছবি আঁকে না থাকলেও ঠিক তেমনি আঁকে। শিশু বিশেষ একটি বস্তু সম্বন্ধে যা জানে তাই আঁকে, বস্তুটি অংকনকালে শিশুর চোখে যেমন দেখায় তেমনটি সে আঁকে না। শিশুর বয়েস যতো বাড়তে থাকে ততোই তার অংকনে কল্পনার প্রভাব কমে আসে এবং বস্তুনিষ্ঠা বাড়তে থাকে, অর্থাৎ বাস্তব বস্তুটির সঙ্গে চিত্রিত বস্তুটির বেশ একটা সঙ্গতি দেখা যায়। প্রথমে শিশু বিশেষ একটি বস্তু সম্বন্ধে যা জানে তাই আঁকতে চেষ্টা করতো। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ আঁকতে বললে টুপীর তলায় মাথায় চুল এঁকে দেখাতো, কাপড়ের ভেতর দুটো পা এঁকে দেখাতো। এইভাবে মানুষের ছবি আঁকতে আঁকতে তার যে অভ্যেস হয়ে যায় সেটা ভাঙা খুব সহজ নয়। তাই পরবর্তীকালে যখন শিশু মানুষ সম্বন্ধে যা জানে তা না এঁকে মানুষকে কেমন দেখায় তাই আঁকতে চেষ্টা করে, তখন আগেকার অভ্যেসটা তার নতুন প্রচেষ্টাকে রীতিমত বাধা দেয়। প্রায় দশ বছর বয়েস পর্যন্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা শিশুর চিত্রাঙ্কন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তারপর এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসে এবং ক্রমে ক্রমে চিত্রাঙ্কন ভাবপ্রকাশের একটা সাধারণ রীতি না হয়ে একটা বিশেষ দক্ষতা রূপে বিকাশ লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন বয়েসের শিশুদের আঁকা ছবিগুলি বিশ্লেষণ করলে কীভাবে দিক, দূরত্ব, গভীরতা ইত্যাদির প্রত্যয় ধীরে ধীরে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতার সঙ্গে সভ্যতা, বুদ্ধিশক্তি, বংশধারা, কল্পনা-প্রবণতা ও কল্পনার সজীবতার

কীরকম সম্বন্ধ সেটা গবেষণা-সাপেক্ষ। মনস্তাত্ত্বিকেরা, বিশেষতঃ মনঃসমীক্ষকেরা চিত্রের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। স্থির-বা-অস্থির মস্তিষ্ক মানুষ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিজের খেয়ালে যে সব ছবি আঁকেন বিশেষজ্ঞগণ সেই সব ছবির মধ্যে চিত্রকরের মনের পরিচয় পান। চিত্রের মধ্যে যে কল্পনা রূপায়িত হয় তার মূলে চিত্রকরের অবচেতন মনের যে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ বর্তমান মনঃসমীক্ষক তা উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ হন। শিশুর নানা রকম চিত্র বিশ্লেষণ করলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

সৌন্দর্যবোধ, সংগঠনী প্রবৃত্তি, ভাব-প্রকাশের তাড়না, অনুকরণের প্রভাব ইত্যাদি বিবিধ কারণে সকল শিশুই অংকন ক'রে থাকে, কিন্তু বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ-সুবিধার অভাবে, বড়োদের থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পেয়ে, নিজেদের অঙ্কিত চিত্রে খুশী না হয়ে, ভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ ও মনোযোগ সঞ্চারের ফলে অথবা অনুরূপ কারণবশতঃ অনেক শিশুই ক্রমে ক্রমে অংকনের প্রতি তাদের অনুরাগ হারিয়ে ফেলে। বয়স্করাও সাধারণতঃ মনে করেন অংকন একটা শিল্প এবং সকলেরই এই শিল্পে দক্ষতা জন্মাতে পারে না। তাই তাঁরাও এ ব্যাপারে বড়ো একটা উৎসাহ দেখান না। আমাদের কিন্তু মনে রাখা দরকার চিত্রাঙ্কন একটি অতি মূল্যবান কর্ম। চিত্রাঙ্কনের—বিশেষতঃ বিবিধ রঙের সাহায্যে অঙ্কনের মধ্যে সৌন্দর্য আস্বাদনের ক্ষমতাটি বৃদ্ধি পায়, কল্পনা ঐশ্বর্যময়ী হয়ে ওঠে, প্রক্ষোভ-জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সৃজন-তৃষা তৃপ্তি লাভ করে। চিত্রাঙ্কন অবসর বিনোদনের একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু উপায়। জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী অবকাশ মুহূর্তে চিত্রাঙ্কন ক'রে প্রচুর আনন্দ লাভ করেছেন এবং তার দ্বারা সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং শিশু যাতে চিত্রাঙ্কনের প্রতি উদাসীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। চিত্রাঙ্কনের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ সৃষ্টি করতে হলে শিশুকে প্রচুর পরিমাণে কাগজ পেনসিল রঙ তুলি ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম দিতে হবে। সেই সঙ্গে তাকে দিতে হবে যথেষ্ট স্বাধীনতা। নিয়ম কানুনের বেড়াজাল রচনা ক'রে অথবা নিখুঁত সৃষ্টির মোহ বিস্তার ক'রে, চিত্রাংকনের মাধ্যমে তার আত্ম-প্রকাশের প্রেরণাটিকে নিষ্পিষ্ট করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না।

শিশুর বিচিত্র আবেগানুভূতি

আমাদের মতো শিশুর মনেও রাশি রাশি রাগ দ্বেষ আনন্দ দুঃখ ভয় ইত্যাদি নানান রকমের আবেগ আছে। জীবনকে জীবন্ত ক'রে রাখে এই সব অনুভূতি। আবেগানুভূতি যদি না থাকতো তাহলে জীবনে কোন রঙ্ থাকতো না, রস থাকতো না। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে প্রক্ষোভের প্রয়োজন আছে যেমন, তেমনি আবার সংযমের রাশ দিয়ে একে বেঁধে রাখতে না পারলে এর দ্বারা আমাদের প্রভূতক্ষতিসাধনও হতে পারে। সুতরাং আবেগানুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে।

আমরা সচরাচর ভুলেই যাই যে আমাদের মতো শিশুদের মনেও রাশি রাশি আবেগের সৃষ্টি হয়। এই ভুলের ফলে সময় সময় আমরা এমন ধরণের আচরণ করি, যার ফল শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। একটা উদাহরণ দিই। একজন ভদ্রলোক প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে তুলে চুমো খেয়ে আদর করেন। একদিন অফিসে ঝগড়াঝাটি ক'রে ভগ্নমন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। আদরিণী কন্যাটি প্রতিদিনের অভ্যেস মতো তাঁর কাছে ছুটে গেলো। কিন্তু ভদ্রলোকের মনের অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি তাকে গালাগালি ক'রে দূরে সরিয়ে দিলেন। তাঁর ব্যাপারটা এখানেই চুকে গেলে, কিন্তু তাঁর এই আচরণে শিশু-কন্যাটির মনে কী রকম আলোড়ন জাগলো, কী গভীর আবেগের সৃষ্টি হলো তার মনে—সে খবর তিনি পেলেন না। পিতার এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ সন্ধান করতে গিয়ে মেয়েটির মনে কী রকম সংঘাতের উদ্ভব হলো তার খবর কেউ রাখলে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন বাইরের আঘাতে শিশুর মনের ভেতর এমনি করে আবেগের যে ঘূর্ণি জাগে তার নাচন সহজে থামে না। আবেগের এই ঘূর্ণিটাকে থামাতে গিয়ে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে মনোব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয়। সমাজ-জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে পাগলা গারদের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর তখন তাকে জীবন যাপন করতে হয়। মানব জীবনে আবেগের যখন প্রভাব এতো, তখন সকল মাতাপিতারই শিশুমনের বিচিত্র আবেগরাশির কথা জানা দরকার। কী ভাবে শিশুমনের আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রন করা যায় তাঁদের তা জানতে হবে। নীচের আলোচনা থেকে এ বিষয়ে তাঁরা একটা সুষ্ঠু ধারণা লাভ করতে পারবেন মনে করি।

শিশুর ভয়

(ক) আকস্মিক বিপুল পরিবর্তনে শিশুরা ভয় পায়। যদি হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হয় কিংবা বিপুল বেগে কোন কিছু নড়ে চড়ে ওঠে তাহলে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই সব কারণে শিশুরা বাজের শব্দ এবং কুকুর বানর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারকে ভয় পায়। শিশু কুকুরকে ভয় করে, তার কারণ এই জানোয়ারটির আকস্মিক লম্ফঝম্ফ ও অত্যুচ্চ চীৎকার। শিশুর মন থেকে কুকুর-ভীতি দূর করতে হলে তাকে নানা রকমের মজার মজার কুকুরের গল্প বলে শোনাতে হবে। বিশেষ ক'রে জন্তুটির অপরিসীম প্রভুভক্তির কথা বেশী ক'রে জানাতে হবে তাকে। বাড়িতে কুকুর-শাবক নিয়ে এসে শিশুর খেলার সঙ্গী ক'রে দিতে হবে। শিশু যদি দেখে তার বাবা এবং মা কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন তাহলে সেও নির্ভয়ে জানোয়ারটার কাছে এগিয়ে যাবে এবং তাকে নিয়ে খেলা করবে। একবার দেখা গেলো একটি শিশু গভীর জল দেখলেই ভয় পাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেলো সে একদিন চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলো। এই ব্যাপারটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কেউ তাকে ধীরে ধীরে চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গিয়ে হাত ধরে জলে নামিয়ে তার ভয় ভাঙিয়ে দেয়নি। তাই সে ভয়টি তার থেকে গেছে। আর একটি শিশু নিরীহ খরগোসকে ভয় করতো, তার কারণ সে যখন প্রথম প্রথম খরগোসটাকে ধরতে গিয়েছিলো সে সময়ে তার পার্শ্বচর একটা বিরাট রকম শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। এই আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দটাই খোকার মনে নিরীহ জন্তুটির প্রতি ভয়ের সৃষ্টি করেছিলো। শিশুটিকে ভালো ভালো খাবার দিয়ে, আস্তে আস্তে খরগোসটাকে তার কাছাকাছি নিয়ে এসে তার মন থেকে খরগোস-ভীতি দূর করাও সম্ভব হয়েছিলো। আমাদের অনেক কিছু ভীতির মূলে আছে এই ধরণের ছোটখাটো অভিজ্ঞতা। আপনার খোকাটি হয়তো অন্ধকারকে খুব ভয় করে। তলিয়ে দেখুন কারণটা কী। হয়তো সে একদিন অন্ধকারে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল। হয়তো দেখবেন এই ভয়টা আপনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। অনেক দিন আগে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আপনি হয়তো তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন অন্ধকার ছাদে জুজুবুড়ি আছে; অথবা সে যেই ঘুমিয়েছে অমনি আপনি বাতি নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চীৎকার ক'রে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন, সেই বিরাট শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখলো অন্ধকার। সেদিন থেকেই অন্ধকারকে ভয় করতে শিখেছে সে, অথচ আপনি সেটা লক্ষ্যই করেন নি। মনস্তাত্ত্বিকের কাছে এলে আপনার খোকার

ভয় ভাঙানোর জন্য তিনি হয়তো নানারকম উপদেশ দেবেন। বলবেন, খোকা যখন অন্ধকারে থাকবে মা যেন তার পাশে থাকেন। নানারকম সুন্দর সুন্দর গল্প বলে, ছড়া কেটে, গান গেয়ে অন্ধকার থেকে তার মনটাকে অন্য দিকে আকর্ষণ করেন ; অথবা খোকা যে ঘরে শোবে সে ঘরে বাতি জ্বলবে ঠিকই, কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বাতিটা কমিয়ে দিতে হবে। একটু একটু ক'রে কমতে কমতে বাতিটা একদিন সত্যি সত্যি নিবে যাবে অথচ খোকা সেটা টেরই পাবে না। খুব সহজ ব্যাপার হলেও অনেক মাতাপিতাই ছেলে মেয়েদের ভয় ভাঙানোর অতি সহজ উপায়গুলো জানেন না।

আঁধার-ভীতির আরও নানারকম কারণ থাকতে পারে। অন্ধকারে শিশু আর কাউকে নিজের পাশে দেখতে না পেয়ে নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ মনে করে। অপরের সঙ্গ, বিশেষ করে মায়ের সঙ্গ, শিশু সর্বান্তঃকরণে কামনা করে ; তার কারণ সে মাকে গভীরভাবে ভালবাসে, তাই নিবিড় ক'রে তাঁকে পেতে চায়। মায়ের ওপর সে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে ; তাই মা কাছে না থাকলে অথবা যাকে সে ভালবাসে এবং যার ওপর নির্ভর করতে পারে এমন আর কেউ তার কাছে না থাকলে সে নিজেকে বড় বেশী অসহায় মনে করে। এই অসহায়তার অনুভূতিই তার মনে নানারকম কাল্পনিক ভীতির সৃষ্টি ক'রে থাকে। সুতরাং আঁধার-ভীতির একটা কারণ হতে পারে অসায়ত্বের অনুভূতি। তাছাড়া মাতা-পিতা নিজেদের বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন তাঁরা তাঁদের সকল সন্তানকেই সমানভাবে ভালবাসেন এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। নানাবিধ স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁদের ভালবাসার তারতম্য ঘটতে বাধ্য। আবার একটি বিশেষ শিশুকেও তাঁরা সব সময় একই রকম ভালবাসতে পারেন না। শিশুটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা ভালবাসেন, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসেন না। তাছাড়া শিশুর প্রতি তাঁদের ভালবাসাটা বহুলাংশে তাঁদের মানসিক অবস্থার ওপরও নির্ভর করে। তাঁদের মনের অবস্থা যখন শান্ত তখন তাঁরা শিশুকে ভালবাসেন, তাঁদের মনের অবস্থা যখন বিক্ষুব্ধ তখন তাঁরা তাকে অনাদর করেন। কোন একটি বিশেষ শিশুর প্রতি মাতাপিতার মনোভাব অনেকাংশে তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ছোট বড়ো আরও অনেক বিষয়ের ওপরও নির্ভর করে। শিশুটি যদি অবাঞ্ছিত হয়, পরিবারের অন্যান্য সকলে যদি তার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, কিংবা শিশুটি যদি মাতাপিতার মনের মতো না হয় তাহলে তার প্রতি তাঁদের মনোভাব প্রতিকূল হতে পারে। শিশুর প্রতি মাতাপিতার

ভালবাসার যেমন নানা কারণে তারতম্য ঘটে তেমনি নানা কারণেই মাতাপিতার প্রতিও শিশুর ভালবাসার রকম ভেদ হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশুপুত্র মাতার প্রতি এবং শিশুকন্যা পিতার প্রতি বেশী আসক্ত হয়। পিতাও তেমনি কন্যার প্রতি এবং মাতা পুত্রের প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে থাকেন। মাতাপুত্র ও পিতাপুত্রীর এই পারস্পরিক অনুরাগের কারণ পিতা পুত্রীর মধ্যে স্ত্রীর অনেক গুণ (যেগুলো তিনি ভালবাসেন, যেমন চলনবলন, দেহের গড়ন ইত্যাদি) লক্ষ্য করেন এবং মাতা পুত্রের মধ্যে স্বামীর অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য থাকলেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বোধ মাঝে মাঝে এমন প্রকট হয়ে ওঠে যে একজন অপরজনের আধিপত্য মানতে চান না। শিশুদের স্বাতন্ত্র্যবোধ তেমন প্রকট নয় বলে (বিশেষ ক'রে ভালবাসার ক্ষেত্রে) মাতা-পিতা পরস্পরের প্রতীক হিসেবে পুত্র-পুত্রীকে গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চান। পুত্র-পুত্রীও মাতাপিতার ভালবাসার প্রতি সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেয়। পুত্র মাতাকে এবং পুত্রী পিতাকে অধিকতর ভালবাসে বলে তাঁদের নিতান্ত আপন ক'রে পেতে চায়। কিন্তু পুত্র যখন দেখে তার মাতার ভালবাসায় পিতা তার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন সে পিতার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। ঠিক একই কারণে কন্যা মাতার প্রতি বিদ্বেষ বোধ করে। কিন্তু শিশু মাতাপিতার প্রতি তার এই বিদ্বেষ ভাবটাকে সহজে মেনে নিতে পারে না, তার কারণ। পুত্র পিতাকে মাতার ভালবাসায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখে তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে সত্যি, কিন্তু সে পিতাকে ভালও বাসে। সে পিতার মতো শক্তি-শালী হতে চায়। তাঁর মতো বড়ো হতে চায়। তাঁর মতো বিভিন্ন কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। পিতার প্রতি এই বিপরীতমুখী মনোভাবের জন্য পুত্রের মনে তাই (এবং মাতার প্রতি কন্যার মনোভাবের মধ্যে) প্রচন্ড সংঘাত জাগে। শিশু একটু বড়ো হলে সাধারণতঃ মাতাপিতা তাকে পৃথক ঘরে শুতে শেখান। পিতা মাতার সঙ্গে থাকবেন অথচ পুত্র থাকবে দূরে, কিংবা মাতা থাকবেন পিতার কাছে অথচ কন্যা দূরে থাকবে, পুত্রকন্যা কিছুতেই এই ব্যবস্থাটাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। তাই পুত্র পিতার প্রতি এবং কন্যা মাতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। অথচ মাতা ও পিতা উভয়ের জন্য শিশুর মনে যে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে তার ফলে তার ঈর্ষার ভাবটা সোজাসুজি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। অন্ধকারে একলাঘরে তার এই ঈর্ষ্যা নানাবিধ কাল্পনিক ভয়ের রূপ গ্রহণ করে কিম্বা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের আকারে প্রকাশিত হয়। মাতাপিতা তখন অগত্যা তাকে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে নিতে বাধ্য হন। এই রকম ঈর্ষাজনিত অন্ধকার ভীতির কিংবা দুঃস্বপ্নের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক ভদ্রলোক সপ্তাহে কয়েকদিন

রাত্তিরে বেলায় কাজ করতে যেতেন। যেদিন তিনি বাড়ি থাকতেন সেই দিনই তাঁর শিশুপুত্রটি একলাঘরে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেতো, এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতো। যেদিন তিনি রাত্তিরে বাড়ি থাকতেন না সেদিন শিশুটি আপন শয্যায় স্বপ্ন বিহীন নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমিয়ে পড়তো। এসব ক্ষেত্রে শিশুর ভয় দূর করতে হলে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমতঃ পুত্রের প্রতি মাতার এবং কন্যার প্রতি পিতার ভালবাসা যেন অসংযত ও দুর্বার হয়ে আত্মপ্রকাশ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পিতার উচিত মাতার কাজে পুত্রকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা এবং মাতার উচিত কন্যাকে পিতার কাজে সহায়তা করতে সুযোগ দেওয়া। পুত্র যদি নানাভাবে মাতাকে ছোটখাটো সাংসারিক কাজে সাহায্য করার সুযোগ পায় তাহলে মায়ের প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ পাবার সুযোগ পেয়ে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে এবং পিতা মাকে সাহায্য করার সুযোগ তাকে দিয়েছেন দেখে তাঁর প্রতিও তার বিরূপভাবটা কমে আসবে। পিতার সেবা করতে পেলে কন্যাও খুশী হবে এবং মাকে ভালো মনে করবে। তৃতীয়তঃ ছোট থেকেই শিশুকে আলাদা ঘরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তার ফলে আলাদা ঘরে শোয়াটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এই রকম অনেক উপায়ে (পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুযায়ী) শিশুর ভয় ভাঙানো সম্ভব। মাতা বা পিতার প্রতি ঈর্ষা যেমন শিশুকে ভয়ান্বিত করতে পারে, নবাগত ভাই বা ভগ্নিটির প্রতি ঈর্ষাও তেমনি তাকে ভীত ক'রে তুলতে পারে। নবাগতটি মায়ের স্নেহে তার আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে দেখে শিশু স্বভাবতঃই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে সে যখন মাকে সম্পূর্ণ আপন ক'রে ফিরে পায় না তখন নবাগতটির মতো আচরণ ক'রে (শয্যা সিক্ত ক'রে, কান্নাকাটি ক'রে, নিজের হাতে খাবার ক্ষমতা হারিয়ে, ইত্যাদি) মাকে সে ফিরে পেতে চায়, কিংবা নানারকম অস্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয়ে নিজেকে অসহায় ক'রে তুলে সে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এইসব ভীতি অস্বাভাবিক হলেও শিশুর কাছে সেগুলি চরম সত্য। শিশুর আপন কল্পনা বাস্তবের মতো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। নবাগত যখন আসবে তখন শিশুটিকে তার প্রতি সদয় ক'রে তোলার চেষ্টা করা দরকার। তার ওপর নবাগতটিকে খেলানোর, খাওয়ানোর, ঘুমপাড়ানোর, দেখাশোনা করার ভার দেওয়া যেতে পারে। তখন মায়ের কাছে সে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে নবাগতটির প্রতিও ঠিক তেমনি ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। কথায় কথায় নবাগতটির সঙ্গে তার নিজের সাদৃশ্যমূলক তুলনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মা যখন ঝিনুকে ক'রে

নবাগতটিকে দুধ খাওয়াবেন তখন বড় শিশুটিকে বলতে পারেন—"বুঝলে খোকন, তুমি যখন এর মতো ছোট ছিলে তখন ঠিক এমনি করেই তোমাকে দুধ খাওয়াতুম।" এইভাবে বার বার শিশুটির সঙ্গে নবাগতের তুলনা করলে তার সঙ্গে শিশুটি একাত্মবোধ ক'রতে শিখবে। তার প্রতি শিশুটির ঈর্ষাভাব এমনি ধীরে ধীরে কমে আসবে। মাতাপিতা বা নবাগত ভাইভগিনীর প্রতি ঈর্ষার ফলে অনেক সময় শিশুর মধ্যে মৃত্যু-ভীতিও দেখা দিতে পারে। তার সত্তার একটি অংশ চাইছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীটির মরণ হোক, অপর একটি অংশ এই কামনার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাই অনেক সময় মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম অস্বাভাবিক প্রশ্ন বা ভীতি শিশুর মনে জেগে ওঠে। ঈর্ষার প্রবলতা কমে এলে এই সব ভীতির সংখ্যা এবং গভীরতাও কমে আসবে। অনেক সময় শিশু এমন অনেক বস্তুকে ভয় পায় আপাতদৃষ্টিতে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি শিশু বাসে চড়তে ভয় পেতো। কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল বাসে চড়লেই বাস তাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে এই রকম একটা অনুভূতির সঞ্চার হতো তার মনে। সুতরাং বাসের ভয়টা তার মাকে হারাবারই ভয়; নিঃসঙ্গতার, অসহায়ত্বের ভয়। শিশুর ভয় বিদূরিত করতে হলে প্রথমে তার ভয়ের প্রকৃত অর্থটি আবিষ্কার করতে হবে, তারপর ভয়ের কারণটাকে অপসারণ করবার চেষ্টা করতে হবে।

(খ) অনুকরণ-সঞ্জাত ভীতি—অনেক সময় শিশু মাতাপিতা এবং তার চারপাশে অন্য যারা থাকে তাদের অনুকরণ ক'রে অনেক অনেক জিনিসকে ভয় করতে শেখে। যার মা-বাবা ঝড়বাদলা, বজ্রবিদ্যুৎ ইত্যাদিকে ভয় করেন সে শিশুও এসবকে ভয় করতে শেখে। আরশুলা মাকড়সা প্রভৃতি নিরীহ কীট-পতঙ্গের প্রতি ভীতিও এইভাবে শিশুর মনে শেকড় গেড়ে বসে। অনেক সময় বড়দের মুখে নানারকম ভয়ের কাহিনী শুনে শিশুর মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই ধরণের আলোচনা শিশুর সম্মুখে না করাই শ্রেয়।

(গ) অন্য ধরণের ভীতি—অধিকাংশ মাতাপিতাই কামনা করেন তাঁদের ছেলেমেয়ে অন্য সকল ছেলেমেয়ের চাইতে সেরা হোক। তাঁদের এই কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শিশু সন্তানের সম্মুখে অতি উচ্চ একটি আদর্শ স্থাপন করেন। কিন্তু এমন হতে পারে যে, তাঁদের এই আদর্শ সফল ক'রে তুলবার শক্তি শিশুর নেই। যেদিক দিয়ে উন্নতি করবার তার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেটা হয়তো সম্পূর্ণ আর একটা দিক। কিন্তু মাতাপিতাকে খুশী করতে গিয়ে শিশু যতই ব্যর্থ হতে থাকে ততই তার

মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। নতুন পরিবেশের সম্মুখীন হতে হলেই তার দেহ শিহরিত হয়, মন সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই ভয়টা আরও প্রকট হয় তখনই, যখন মাতাপিতা তার ব্যর্থতার জন্য নানাভাবে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এর ফলে শুধু যে ভয়টাই বেশী হয় তা নয়, শিশুর নৈতিক চরিত্রেরও যথেষ্ট অধঃপতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। জনৈক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসবার আমার একবার সুযোগ ঘটেছিল। মজার ব্যাপার এই যে, তিনি অঙ্কে সুপণ্ডিত হলে কী হবে, তাঁর একমাত্র পুত্রের কিন্তু অঙ্কে ভালো মাথা ছিলো না। তাঁর ধারণা তাঁর পুত্র যদি অঙ্কে কাঁচা হয়, তাহলে তাঁরই সম্মান নষ্ট হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি নির্মম আচরণ করতেন। অঙ্ক কষতে ভুল করলেই শিশুটির ভাগ্যে জুটতো লাঞ্ছনা আর তিরস্কার। ফলে শিশুটি তার পিতাকে ভীষণ ভয় করতে সুরু করে এবং যথাসম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায়। একদিন নতুন শিক্ষক এলেন তাকে পড়াতে। পড়ার ঘরে তার বাবাও বসে বসে নিজের কাজ করছিলেন, আর ছেলের পড়ায় নজর রাখছিলেন। শিক্ষক মশাই একটা অংক কষতে দিলেন ছেলেটিকে। খাতার একটা পাতা বার দুই উল্টোবার পর শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সে একটি পেনসিল আনবার নাম ক'রে তার বইয়ের আলমারীর কাছে উঠে গেলো। সেখানে কিন্তু পেনসিল না খুঁজে আর একটা খাতা উল্টে কী যেন দেখে নিলে। তারপর পড়ার টেবিলে বসে অংকটা কষে মাষ্টার মশাইকে দেখতে দিলো। গোড়া থেকেই আমি তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এবার উঠে গিয়ে আলমারী থেকে সেই খাতাটা নিয়ে এলাম যেটা সে একটু আগেই দেখে এসেছিলো। দেখলাম মাষ্টার মশাই তাকে যে অংকটা কষতে দিয়েছিলেন সেটা সেখানে কষে দেওয়া আছে। এই শিশুটির কোমল মনে চুরি ক'রে কৃতিত্ব নেবার এই যে একটা প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেটা কি তার পিতাই সৃষ্টি করেননি? তাঁকে খুশী ক'রে তাঁর তিরস্কার এবং শাস্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জনাই তো আজ সে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এমনি ভাবে বাবা মার হাতেই যে কতো কোমলমতি শিশুর নৈতিক অবনতি ঘটছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

নিজের কাজ হাসিল করার জন্য অনেক মা শিশুকে অযথা ভয় দেখান—জুজুর ভয়, বুড়োর ভয় ইত্যাদি। হয়তো সাময়িকভাবে এতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়, ভয় পেয়ে শিশু তার ওজর আব্দার ত্যাগ করে। কিন্তু এর ফলে নানা রকম অযথা ভয়ের সৃষ্টি হয়ে তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভুত ক্ষতিসাধন ক'রে থাকে।

শিশুর ভয়কে কখনও উপহাস করা ভালো নয়, তার ভয় যদি কাল্পনিক হয় তবুও না। মার কাছে যে শিশুটি শুনেছে যে একটা খু-উ-ব বড়ো ঝুরি-নামানো অন্ধকার বটগাছের ভেতর একটা ডাইনী বুড়ী বাস করতো, সে হয়তো একথা শোনার পর তাদের গাঁয়ের পুকুর পাড়ে যে পুরাণো বট-গাছটা আছে, সেটাকে একটা অদৃশ্য ডাইনীর আস্তানা বলে ধরে নিয়েছে। ভুলেও সে ওপাশ মাড়ায় না। মা যদি তার এই ভয়টার খবর পেয়ে এ নিয়ে হাসি-তামাসা করেন অথবা রাশি রাশি যুক্তির অবতারণা ক'রে তার ভয় ভাঙতে চেষ্টা করেন, তাহলে ফলটা হবে বিপরীত। কিন্তু তিনি যদি শিশুকে সঙ্গে ক'রে পুকুরপাড়ে বটতলায় যান এবং চারপাশে ঘুরে ফিরে তাকে দেখিয়ে দেন যে ডাইনী বুড়ীর নামগন্ধও সেখানে নেই, তাহলে তার ভয়টা ভেঙে যাবে। উপদেশের চাইতে উদাহরণই যে এসব ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর সে কথাটা মাতাপিতাকে মনে রাখতে হবে সব সময়ই।

রূপকথা ও শিশু-মন

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন শিশুদের কাছে ডাইনী বুড়ী, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব ইত্যাদির বিষয়ে কাহিনী বলা ঠিক কিনা। আমাদের দেশে এবং সকল দেশেই এমন অজস্র রূপকথা লোকসমাজে প্রচলিত আছে, যেগুলির মধ্যে এই সব ভয়াবহ প্রাণীর ছড়াছড়ির অন্ত নেই। ঠাকুরমা দিদিমারা চিরকালই খোকাখুকুদের এইসব অপরূপ রূপকথা শুনিয়ে আসছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে রূপকথার রাজপুত্তুর সব সময়ই ডাইনীর চোখে ধুলো দিয়েছে, রাক্ষসরাক্ষসীর মাথা কেটেছে এবং ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে বন্দিনী রাজ-নন্দিনীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে। বলা বাহুল্য, বলার ভঙ্গীতে এই সব গল্প-কাহিনী শিশুমনে অসীম সাহসের সৃষ্টি করে। তার মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মায় যে, সেও রাজপুত্তুরের মতোই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিজয়মাল্য অর্জন ক'রে আনবে। এইসব রূপকথা তাই শিশুর কল্পনাকে প্রখরতর করে এবং তাকে সাহসী হয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিশুর রোষ

যে শিশু রাগ করতে জানে না, সুবোধ শিশুর মতো সব সময়ই অন্যের কথা মেনে চলে বুঝতে হবে তার মানসিক বিকাশ ঠিকমত সম্পাদিত হয়নি। এ দুনিয়ায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে

না। অনেক সময় রাগ দেখাবারও দরকার হবে। কিন্তু রাগ করবার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি আবার রাগের মাত্রা বেশী হলে কিংবা অকারণে রাগ করলে তাতে দেহ-মনের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। তাই এ বিষয়ে সংযমেরও দরকার আছে। সাধারণতঃ শিশুরা রুষ্ট হয় তখনই যখন তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বা অঙ্গ-সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করা হয়। যে ছোট মেয়েটি পুতুল খেলায় ব্যস্ত তাকে যদি তার মা খাবার খেতে পীড়াপীড়ি করেন, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে খেলা থেকে তুলে নিয়ে যান, তবে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে। হয় ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি করবে, না হয় মুখ গুমরে চুপটি ক'রে বসে থাকবে। কারও সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। ডাকলে শুনবে না। একটি ছোট্ট খোকা বাগানের বাঁশতলায় বসে একদিন শুকনো বালি দিয়ে ঘর তৈরী করতে চেষ্টা করছিল। বালির ওপর বালি কিছুতেই এঁটে বসছিল না। তাই ঘরও আর উঠছিল না। বার বার চেষ্টার ফলেও যখন খোকা ব্যর্থ হলো, তখন দেখা গেল, রেগেমেগে সে খেলার উপকরণগুলোকে ছুঁড়ে ফেলছে। তার ফুলের মত সুন্দর কচি মুখটি উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। এমনিভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিশুর রাগের পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে তার প্রতিহত ইচ্ছারাশি।

ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন হলেও শিশুরা অনেক সময় রাগ করে। সময় মত যদি তাদের খাবার দেওয়া হয় এবং ঘুমোবার প্রচুর অবকাশ পায়, তাহলে আর অকারণে রাগ করবে না। যে সমস্ত ছেলেমেয়েকে শৈশবে নিয়মিত খাবার এবং বিশ্রাম দেওয়া হয়নি, বড় হলে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে। নিয়মিত খাবার এবং নিদ্রার আয়োজন করা ছাড়াও মাতাপিতা শিশুকে আরও নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন যাতে সে তার ইচ্ছাপূর্তির বাধা গুলিকে দূর করতে পারে। যে শিশুটি যখন বার বার চেষ্টা করেও বালির ঘর তৈরী করতে পারছিল না, তাকে যদি ভেজা মাটি দিয়ে ঘর তৈরীর কাজে সাহায্য করা হতো তাহলে তার রাগ করবার কোন কারণই ঘটতো না।

শিশু যাতে রেগে না যায় এতক্ষণ সে কথাই বলা হলো। কিন্তু যখন সে সত্যি সত্যি রেগে ওঠে, তখন তার প্রতি কী রকম আচরণ করা উচিত মাতা-পিতার সেটাও জানা দরকার। সকলেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, শিশু রেগে উঠলে তার প্রতি যদি মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহলে তার রাগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। মা যখন তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তখন তার কান্নার ঘটা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলে! অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে শিশু নিজেকে খুব বেশী মূল্য দিয়ে ফেলে এবং নিজের জেদ জাহির করার উদ্দেশ্যে কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। এক্ষেত্রে শিশুর রাগকে উপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত।

এমনভাব দেখাতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি। শিশু রাগ করলে মাতাপিতাও যদি রেগে ওঠেন, তাহলে ফল হবে অত্যন্ত বিষময়। এতে শিশু আরও বেশী রেগে উঠবে। যদি তাঁরা শিশুকে তার রাগের জন্য বকাবকি করেন অথবা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন, তাহলে শিশু বুঝবে তাঁরা নিতান্তই অক্ষম। সব চেয়ে ভাল, শিশু যখন রেগে ওঠে, তার রাগটাকে উপেক্ষা ক'রে চলা এবং সম্ভব হলে তার সম্মুখ থেকে সরে যাওয়া। তাহলে শিশু তার রাগটাকে নিরর্থক মনে করে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসবে। অনেকেই রুষ্ট শিশুকে বন্ধ ঘরে আবন্ধ ক'রে রাখেন। এই রকম শাস্তি-বিধানের ফল হয় খুবই খারাপ। শিশুর মনে বন্ধ ঘরের প্রতি একটা অস্বাভাবিক ভীতির সৃষ্টি হতে পারে এবং মাতাপিতার বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। পূর্বেই বলেছি দু-তিন বছর বয়েসের সকল শিশুর মধ্যেই একটা ঋণাত্মক অর্থাৎ 'না' বলার মনোভাব দেখা দেয়। এ সময় তাদের এটা করো, সেটা করোনা ইত্যাদি ধরণের আদেশ উপদেশ দিয়ে বিব্রত ক'রে তুললে তারা রুষ্ট হয়। কারণ প্রায় সব কিছুতেই 'না' বলার প্রেরণা শিশুর মধ্যে তখন অত্যন্ত প্রবল। এই প্রেরণা ব্যাহত হলেই তার মনে রোষের সৃষ্টি হয়। জোর ক'রে যদি শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহলে সে খিট্‌খিটে একগুঁয়ে অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং যাঁরা তার স্বাধীনতায় বাধা দেন তাঁদের সে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতে শেখে। সুতরাং শিশুর কাজ কর্মে অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি না ক'রে তাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে সকল রকম আবেগময় পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত হয়ে সে গড়ে উঠবে না। সংসারে অনেক রকম আবেগময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে একদিন হতেই হবে, অতএব এ সব ক্ষেত্রে যাতে সে সফলতা অর্জন করতে পারে, সেই মত শিক্ষা তাকে দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে দু-একটা উদাহরণ দিলে মাতাপিতা তাঁদের কী করণীয় সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবেন আশাকরি। অনেক সময় শিশু জোরে দৌড়োদৌড়ি করলে মাতাপিতা হৈ-হৈ ক'রে ওঠেন। বলে থাকেন—ওরে, ছুটিসনে বাবা, পড়ে যাবি যে। অথবা সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটা ওপরে উঠছে দেখে মায়ের বুক হয়তো কেঁপে ওঠে। ছুটে গিয়ে তিনি খুকীকে নামিয়ে আনেন। এই সব অকারণ স্নেহ মায়া উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে জয় করা দরকার। শিশুকে নিরুৎসাহ কিংবা নিরস্ত না ক'রে সে যাতে সাফল্য অর্জন করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে শিশুটি দৌড়োদৌড়ি করছে তাকে দৌড়তেই দিতে হবে। যদি পড়ে গিয়ে মাথায় একটু আঘাত লাগে তাহলে যথারীতি চিকিৎসা করলেই চলবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে

উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত না লাগে, পা-হাতগুলো চিরকালের মতো অকর্মন্য হয়ে না পড়ে। এর জন্য চাই মাতাপিতার সতর্কতা। যে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে তাকে নামিয়ে না এনে মা যদি তার পেছনে পেছনে ওপরে ওঠেন তাহলে উৎসাহিত হয়ে মেয়েটা আরও ওপরে উঠবে, তার সাহস আরও বাড়বে। যদি সে পড়ে যায় তাহলে তো মা পেছনেই আছেন— তাকে ধরে ফেলবেন। সুতরাং বিপদের পরিস্থিতিতে ফেলে বিপদকে জয় করার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে।

শিশুর অঙ্গুলি লেহন

লক্ষ্য করলেই সকলে দেখতে পাবেন প্রায় সকল শিশুই এক বছর বয়েসের মধ্যে যখন তখন নিজের বুড়ো আঙুল চুষে থাকে। ক্ষুধিত শিশু যখন মায়ের স্তন পান করে, তখন তার ঠোঁট দুটিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার ফলে সে খুব আনন্দ পায়। তাই ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেও সে মাতৃস্তন্যপানে নিরস্ত হয় না। কিন্তু মা সব সময়ই কাছে থাকতে পারেন না, তাঁর আরও অনেক কাজ আছে; তাই শিশু মাতৃস্তনের পরিবর্তে তার নিজের অঙ্গুলি লেহন ক'রে ওষ্ঠসঞ্জাত আনন্দের আস্বাদন লাভ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেশী বয়েসের শিশুরা এবং বয়স্কদের মধ্যেও কেউ কেউ আঙুল চোষা অথবা দাঁত দিয়ে নখ খোঁটার অভ্যেস থেকে মুক্তি পাননি। এই সব ব্যক্তি যখন বহির্জগতে বাধার সম্মুখীন হন অথবা কোনরকম আবেগময় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তখন শিশুসুলভ উপায়ে, অর্থাৎ অঙ্গুলি লেহন ক'রে অথবা দাঁত দিয়ে নখ খুঁটে নিজেদের অজ্ঞাতসারে আনন্দের সন্ধান করে থাকেন। তাঁদের এই অভ্যেস নিয়ে হাসি তামাশা করলে অথবা তাদের ওপর উপদেশ বর্ষণ করলে কোনই লাভ হবে না। উত্তেজনাময় পরিবেশ থেকে শিশুদের দূরে রাখা এবং তাদের প্রফুল্ল রাখা; অবসাদ, ক্লান্তি, ক্ষুধা প্রভৃতি অনুভূতিগুলি যেন পীড়াপ্রদ হয়ে ওঠার সময় না পায় সেদিকে নজর রাখা; শাসন ও তিরস্কার না করা এবং মজার মজার খেলা ও কাজ কর্মের মধ্যে তাদের ব্যস্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। উৎসাহ ও প্রশংসা এসব ক্ষেত্রে তিরস্কার ও তাড়না অপেক্ষা অনেক বেশী ফলপ্রসূ।

শিশুর ভালবাসা

ভালবাসার দুটো দিক আছে। ভালবাসার বস্তু (বা ব্যক্তি) এবং ভালবাসার অনুভূতি। শিশুর ভালবাসার প্রথম ব্যক্তিটি হলেন মা। সর্বপ্রথমে মাকে

শিশু কেন ভালবাসতে শেখে তার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ মা শিশুকে ক্ষুধার সময় স্তন্যদান করেন, তার যত্ন নেন, তাকে স্নান করিয়ে দেন, ঘুম পাড়ান ইত্যাদি, এক কথায় তার জৈবিক প্রয়োজনগুলি তিনিই মিটিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ স্তন্যপান কালে শিশুর ওষ্ঠে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার ফলে সে নিবিড় আনন্দের অনুভূতি লাভ করে। মায়ের সুগভীর আলিঙ্গনে, ও সাদর চুম্বনের আনন্দানুভূতি তার সর্বশরীরকে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে। তাই শিশুর কাছে আনন্দ এবং মা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মা হয়ে ওঠেন আনন্দময়ী। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই তার ভালবাসা আরও অনেক বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি সঞ্চারিত হয়। যে তাকে আদর করে, যে তাকে সাহায্য করে, যা কিছু তাকে আনন্দ দেয় তারই প্রতি তার মনে ভালবাসা জাগে। শিশু যত বড় হয় ততই তার মধ্যে বিভিন্ন প্রেরণার উন্মেষ ঘটে। সঙ্গ-প্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এইসব প্রেরণার অন্যতম। তার এই নবোন্মেষিত প্রেরণারাশি যার বা যা কিছুর দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় তাকেই শিশু ভালবাসতে শেখে। সাধারণতঃ শিশু মার পর যাকে বেশী ভালবাসে সে হলো তারই সমলিঙ্গ আর একটি শিশু। অর্থাৎ শিশুটি যদি মেয়ে হয় তাহলে সে তারই মতো আর একটি মেয়েকে ভালবাসে, আর সে যদি ছেলে হয় তাহলে তারই মতো আর একটি ছেলের প্রতি তার ভালবাসা ধাবিত হয়। যৌবনোদ্গমে তার ভালবাসা ভিন্নমুখী হয়, অর্থাৎ ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে ছেলেকে ভালবাসতে সুরু করে। এইটে হলো ভালবাসার সাধারণ ধারা। কিন্তু ধারাটা বস্তুতঃ এতটা সরল নয়। তার কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর পরিচিতির গণ্ডিটা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় এবং তার বন্ধুসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিলাভ করে। সে দেখে ভালবাসার ব্যক্তিটি সব সময়ই তাকে সাহায্য করেনা, বাধাও দেয়। শিশুর সকল কাজই সব সময় তার ভালবাসার ব্যক্তিটির অনুমোদন লাভ করে না। তাই ভালবাসার রাজ্যে ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিরক্তি, ঈর্ষা, আক্রোশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিপরীত অনুভূতিগুলিও ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। এমনি ক'রে ভালবাসার অনুভূতিটা জটিল হতে থাকে।

প্রধানতঃ শিশুর ভালবাসার উৎপত্তি স্তন্যপানকালে তার ওষ্ঠসঞ্জাত উত্তেজনায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের আরো অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। শিশু যখন মাকে কাছে পায় না, তখন তার নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন ক'রে আপন ওষ্ঠকে উত্তেজিত করে। ক্রমে ক্রমে তার পায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা থেকেও সে আনন্দ পায়। প্রথমে ভালবাসা থাকে দেহগত; তার সমূহ অঙ্গের উত্তেজনা, বিশেষতঃ কতকগুলি প্রত্যঙ্গের উত্তেজনা, শিশুকে আনন্দ দান করে। তারপর যখন তার মানসিক

প্রেরণাগুলি পুষ্টিলাভ করে তখন তার আনন্দানুভূতির কেন্দ্রটি দেহ ছাড়িয়ে মনের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। ভালবাসার ক্রমবিকাশ ঘটে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে। দেহের পুষ্টি এবং মনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার প্রকৃতি ও ভালবাসার বস্তুরও বিভিন্নতা ঘটে। শিশু তখন অনেককে এবং অনেক কিছুকে ভালবাসতে শেখে। অনেক বিষয়কে, অনেক বস্তুকে ভালবাসে। আদর্শকে ভালবাসে। সকলকে সমানভাবে ভালবাসে না। একই জনকে সব সময় ভালবাসে না—কোন সময় ভালবাসে, কোন সময় ঘৃণা করে। যে কাজে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে সে কাজ করতে ভালবাসে। যে কাজ করতে অক্ষম হয়, সে কাজ করতে ভয় পায় কিংবা তাতে আগ্রহ পায় না। অন্যের দেখাদেখি (বিশেষ ক'রে যাদের সে ভালবাসে তাদের) অনেক কিছুকেই সে ভালবাসতে শেখে। তার ভালবাসার ব্যক্তিটির মতো রূপগুণের অধিকারী অন্য ব্যক্তিদেরও পছন্দ করে। এই রকম ছোটবড় অনেক কারণেই তার ভালবাসার গণ্ডিটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

কৌতূহল ও আবেগ

শিশু যত বয়েসে বেড়ে ওঠে, ততো তার বুদ্ধি ওঠে বেড়ে। সে ততোই তার চারপাশের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অজস্র প্রশ্ন তার মনের ভেতর ভিড় ক'রে আসে। চারিপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদের সে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। তার অধিকাংশ প্রশ্নই বড়দের কাছে আজব ঠেকে, অদ্ভুত মনে হয়। অনেক সময় বড়রা সে সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বলে থাকেন—তোমার এসব কথা জানবার বয়েস এখনও হয়নি, বড়ো হও তাহলে সব বুঝতে পারবে। কিন্তু শিশুর মন তাতে তৃপ্ত হয় না। বার বার নিরাশ হলে তার বুদ্ধির বিকাশ শ্লথ হয়ে আসে ; জ্ঞান আহরণের ইচ্ছে যায় কমে। তাই যতোদূর সম্ভব শিশুদের প্রশ্নকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে। সদুত্তর দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

শিশু সাধারণতঃ জ্ঞান আহরণের জন্য তার বিকচমান ইন্দ্রিয়গুলির ওপর নির্ভর করে। ঘরের বাইরে কুকুর ডেকে উঠলে, রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে গেলে, কিচির মিচির ক'রে পাখি ডেকে উঠলে সেদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফুলের গাছে কুঁড়ি ধরলে, ফুল ফুটলে, আকাশের মেঘে রঙ্ লাগলে তার লক্ষ্য এড়ায় না। যেসব শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিকে আমরা অহরহ উপেক্ষা ক'রে চলি সেগুলিও শিশুকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সব কিছুর অর্থ আবিষ্কার

করার জন্য তার মনে অদম্য কৌতূহল জাগে। কম্বল গরম কেন, ভেড়ার গায়ে এতো লোম কেন, ফুলের গায়ে বিচিত্র রঙ্ কেন, সূর্যাস্তের মেঘ রাঙা কেন, আকাশের রঙ্ নীল কেন, চিনি মধুর কেন, পাখি ডাকে কেন ইত্যাদি সহস্র সহস্র প্রশ্ন তাকে বিচলিত ক'রে তোলে। যে শিশু যতো বেশী প্রশ্ন করে বুঝতে হবে তার মনের বিকাশ ততো বেশী। কিন্তু শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় মনে রাখতে হবে যেন উত্তরটা তার বোধগম্য হয়।

অনেক সময় শিশুর প্রশ্নগুলি মাতাপিতার নীতিবোধকে আঘাত করে। তাঁরা তাই অস্বাভাবিকভাবে রাগ ক'রে থাকেন। এইসব প্রশ্ন করার জন্য শিশুকে তাড়না করেন, অনেক সময় শাসনও ক'রে থাকেন। ফলে ঐ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল সহস্রগুণ বেড়ে ওঠে। যতো বাধা পায় ততোই তার আগ্রহ উদ্দীপিত হয়। ছেলেমেয়ের দেহগত পার্থক্য, সন্তান জন্মের রহস্য ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নগুলিকে মাতাপিতা অপরাপর প্রশ্নের মত সহজ ক'রে নিতে পারেননা। তাই এসব বিষয়েই সে অধিকমাত্রায় উৎসুক হয়ে ওঠে এবং নানা জায়গা থেকে নানা রকম কুৎসিত কুরুচিসম্পন্ন ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে। মাতাপিতা যদি অতি সহজভাবে এইসব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দেবার চেষ্টা করেন তাহলে শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ হবে। অনেক সময় শিশু বার বার একই রকম প্রশ্ন করলে মাতাপিতা তার নীতিবোধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এটা কিন্তু অত্যন্ত ভুল। শিশু স্বভাবতঃই সেই সব প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করে যার সঙ্গে শুধু তার জ্ঞানপিপাসা জড়িত থাকে, কোনরকম আবেগের রঙ্ লাগে না। ফুল কী ক'রে ফোটে এ প্রশ্ন শিশু করে তার জানবার ইচ্ছাটি তৃপ্ত করার জন্য। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাতাপিতা কোন রকম ইতস্তত করেন না। সহজভাবেই উত্তর দেন, তারও তাই একে ঘিরে কোন রকম আবেগের সঞ্চার হয় না। উত্তরটা শুনলে শিশু সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু আরও অনেক দিকে তার মন চলে যাবার জন্য সে সহজে একথা ভুলে যায়। তাই পুনরায় একই প্রশ্ন করে। কিন্তু আমার নতুন বোনটা কোথায় ছিলো, কী ক'রে হলো, জন্মালো কেমন ক'রে ইত্যাদি ধরণের প্রশ্ন ক'রে শিশু যখন তাড়না খায় তখন তার মন বেশী ক'রে এই দিকেই আকৃষ্ট হয়। এই সব প্রশ্ন তার মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে থাকে। এদের বিষয়ে তার মনের ভাব আর সহজ থাকে না। কিন্তু তাড়না ও শাসনের ভয়ে পুনরায় প্রশ্ন করা থেকে নিরস্ত হয়। শিশু যখন তার জন্মবৃত্তান্ত মার কাছে জানতে চায় তখন তিনি বড়ো মুশকিলে পড়েন। রূঢ় সত্য কথাটা তাকে বলা চলে না, সে কথা বুঝবার শক্তিও তার নেই। অথচ কিছু একটা বলা চাই এবং

সেটা যতোদূর সম্ভব সত্য হয় ততোই ভালো। কিছু না বললে সে তৃপ্ত হবে না। তিরস্কার করলে এ বিষয়ে তার কৌতূহল বেড়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে বলা চলতে পারে—তুই আমার ভেতর ছিলি, তারপর বড়োসড়ো হয়ে বেরিয়ে এসেছিস। যদি বলে কী ক'রে বেরিয়ে এলুম তাহলে বলা যেতে পারে—পেট কেটে। আবার প্রশ্ন করতে পারে শিশু—পেটে কাটা কোথায়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে—কাটা জুড়ে গেছে ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, এটাই শিশুর পক্ষে সবচেয়ে সহজবোধ্য উত্তর এবং পরিপূর্ণ সত্য না হলেও এর মধ্যে সত্যের অপলাপ কমই আছে।

অনেক সময় শিশুরা নিজেদের এবং সঙ্গী-সাথীদের জননেন্দ্রিয় সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন ক'রে থাকে। তাতে বিচলিত হবার কিছুই নেই। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো এই বিশেষ অঙ্গটি সম্বন্ধেও কৌতূহলী হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর ওপর বেশী দৃষ্টি দিলে এ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহলকে আরো বাড়িয়েই দেওয়া হবে, সুতরাং এদিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই।

ইজের বা কাপড় পরা না থাকলে অনেক সময় মাতাপিতা শিশুকে বকাবকি করেন। এর ফলে তার দৃষ্টি একটা বিশেষ দিকে ধাবিত হয়। কৌতূহল বেড়ে ওঠে। তাকে তাড়না না ক'রে 'বেড়ু' করতে যাবার নাম ক'রে যদি ইজের বা কাপড় পরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার নগ্নতা ঢাকার এই আয়োজন সম্বন্ধে সে কিছুই জানবে না, অথচ অতি সহজেই তার মধ্যে সমাজ-চেতনার উন্মেষ-ঘটানো সম্ভব হবে। মোটের ওপর অপরাপর বিষয়ের মতো যৌন বিষয়টাকেও সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

আবেগ জীবনের সুস্থ-বিকাশ

শিশু যাতে একটি সুন্দর সুস্থ আবেগ-জীবনের অধিকারী হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা আমাদের সকলেরি কর্তব্য। শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হলো শিশুর মনটিকে এমন ক'রে গঠন করা যেন সে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে উপযুক্তভাবে আচরণ করতে পারে। আবেগানুভূতি হলো আচরণের প্রধান উৎস। উদাহরণস্বরূপ, ভয়ের অনুভূতি হয় বলেই বিপজ্জনক বস্তু থেকে আমরা দূরে পালাই। সেই রকম করুণার বশবর্তী হয়ে আমরা বিপন্নকে সাহায্য করি, ক্রুদ্ধ হয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করি, সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকি। সুতরাং শিশুকে সঙ্গত আচরণ শিক্ষা দিতে হলে উপযুক্ত পরিবেশে তার মনে যাতে উপযুক্ত আবেগের সঞ্চার হয় সেদিকে লক্ষ্য

রাখতে হবে। শিশুর আবেগ-জীবনটি যদি শান্ত ও সমঞ্জস না হয়, যদি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ক্ষোভের আঘাতে তার মনটি সংক্ষুব্ধ থাকে, তাহলে সে যে শুধু নিজেই ক্লিস্ট হবে তাই নয়, সমাজের সঙ্গে তার অভিযোজনের প্রয়াসও পণ্ড হবে; অধিকন্তু তার অন্তর্নিহিত আরও অনেক সম্ভাবনাও যথারীতি বিকাশ লাভ করতে পারবে না। সযত্ন গবেষণার দ্বারা মনোবিদদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তির আবেগ-জীবনটি সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া দরকার। অনেক শিশু প্রথমে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিলেও পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিবেশে আবেগাহত হয়ে বুদ্ধির সেই ঔজ্জ্বল্য, সেই প্রাখর্য হারিয়ে ফেলেছে এমন দেখা গেছে। সুতরাং কিভাবে শিশুর আবেগ-জীবনটি সুস্থ ক'রে গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার।

শিশুকে আত্মপ্রত্যয়শীল ক'রে গড়ে তুলতে হবে। নিজের ওপর আস্থা থাকে না বলেই অনেক সময় আমরা অক্ষমতা অসহায়ত্ব ও হতাশার অনুভূতিতে কষ্ট পাই। শিশুকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ক'রে গড়ে তুলতে হলে তার ক্ষমতানুযায়ী কাজ দিতে হবে তাকে। প্রথমেই কঠিন কাজ করতে না দিয়ে যে কাজ সে সহজে পারবে তা থেকে সুরু ক'রে ধীরে ধীরে কাজের জটিলতা বাড়াতে হবে। কাজে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। সফলতা অর্জন করলে তাকে প্রশংসা করতে হবে। বিফলতায় যাতে সে নিরুৎসাহ না হয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে চেষ্টা করতে, অনুপ্রাণিত করতে হবে।

আত্মনির্ভরশীল হবার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে। অনেক সময় মাতাপিতার দোষেই শিশু পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। যেমন অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ মাতাপিতা তাঁদের শিশু সন্তানের স্নান আহার পরিচ্ছদ-পরিধান ইত্যাদি সকল কাজেই অতি মাত্রায় সাহায্য ক'রে থাকেন। নিজের কাজ নিজে করবার সুযোগ না পেয়ে সে বয়েসে বাড়লেও অক্ষম শিশুটিই থেকে যায়। এমনও দেখা যায় এই রকম মাতাপিতাই আবার কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে শিশুকে অক্ষম বলে তিরস্কার করে থাকেন। তাতে মুখ ফুটে কিছু না বললেও শিশুর আবেগ-জীবনে প্রচণ্ড সংঘাত জাগে। পক্ষান্তরে, মাতাপিতার ওপর দীর্ঘকাল নির্ভর ক'রে চলার জন্য শিশু আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে না এবং পরনির্ভরতার মনোভাবটি তার স্বভাবগত হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে এই স্বভাবের জন্য তাকে অনেক অশান্তি ভোগ করতে হয়।

শিশুকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিলেমিশে সে চলতে পারে। সামাজিক জীব বলে মানুষ মাত্রেরই অন্য সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলা দরকার। যারা স্বার্থপর, অন্তর্মুখী, ভীরু অথবা লাজুক তারা

সহজে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। এই রকম লোক অন্যের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেক কষ্ট পায়। শিশুকে সামাজিক করতে হলে তাকে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে দিতে হবে। পাঠশালায়, খেলার মাঠে, বিভিন্ন শিশু-সংস্থায় শিশু অন্যান্য অনেক শিশুর নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পায়। সে অন্য শিশুর অথবা তার দলের স্বার্থে নিজের দাবি ত্যাগ করতে বা বদলাতে শেখে; দলগতভাবে কাজ করতে শেখে; অন্যের কাছে আঘাত পেলে সহ্য করতে শেখে। এমনি করে তার মধ্যে পরার্থপরতা, দলপ্রীতি, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণের উন্মেষ ঘটে তাকে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে শেখায়।

স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুভূতি সুস্থ আবেগ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। যে নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তার অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্ত থাকে না। একা একা সময় কাটানো যার পক্ষে ক্লেশকর তার দুঃখের সীমা নেই। একলা থাকলে যার মন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে তার মতো করুণার পাত্র আর কে আছে! শিশুকে তাই প্রতিদিন কিছুক্ষণ একা থাকার শিক্ষা দিতে হবে। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীতচর্চা, পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত গ্রন্থ পঠন, কারুকার্য, মৃৎকার্য, উদ্যান রচনা, যন্ত্রপাতির কাজ, বুদ্ধি-ভিত্তিক বিবিধ নিঃসঙ্গ ক্রীড়া, সাহিত্য-সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করলে ও সেই সেই বিষয়ে শিক্ষা দিলে তার মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অনুভূতি দৃঢ় হবে।

গৃহ ও বিদ্যালয়ে পরিবেশটি হবে সহানুভূতি ও ভালবাসায় সমৃদ্ধ। আবেগ-জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশুর পক্ষে অপরের ভালবাসা ও সহানুভূতি নিতান্ত প্রয়োজন। তাহলেই শিশু নিজেকে সম্পূর্ণ বাঞ্ছিত ও নিরাপদ বোধ করবে; নিজেকে গোপন না ক'রে নির্ভয়ে ও অকপটে তার মনের সকল কথা প্রকাশ করবে। এমনি ক'রে চাপা প্রকৃতির না হয়ে সে সহজ সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। নিজের মনের সঙ্গে অহর্নিশ লড়াই করে তাকে আর ক্ষত বিক্ষত হতে হবে না।

দেখতে হবে শিশু যেন আবেগের ভান না করে। অনেক সময় বড়দের ভয়ে বা প্ররোচনায় শিশু নানা রকম আবেগের ভান ক'রে থাকে। এই ভাবে তার চরিত্রে ভণ্ডামি বা কপটতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং শিশুর মনে যখন বিস্ময়, আনন্দ বা সহানুভূতির উদ্রেক হয়নি তখন সে এই অনুভূতিগুলি প্রকাশ করুক এ রকম দাবি করা ঠিক নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের যা ভালো লাগে আমরা চাই আমাদের শিশুরাও বলুক তাদেরও সেটি ভালো লাগছে। যা দেখে আমাদের মনে সহানুভূতির সৃষ্টি হয় আমরা চাই আমাদের শিশুদের ও

তাই হোক। একথা অবশ্য বলছিনা যে যথাস্থানে শিশুর মনে আনন্দ বা সহানুভূতি সৃষ্টি হবার দরকার নেই। এরকম দরকার নিশ্চয়ই আছে। তারজন্য পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন শিশুর মনে উপযুক্ত পরিবেশে সত্যি সত্যিই উপযুক্ত আবেগের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, দুঃখীর প্রতি শিশুর মনে সহানুভূতির সঞ্চার করতে হলে দুঃখীর দুঃখ-দুর্দশার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তার হাত দিয়ে দুঃখীকে সাহায্য দান করতে হবে, তাকে দিয়ে দুঃখীর সেবা ও যত্ন করাতে হবে। ভালো কবিতা শুনলে তার মনে যাতে আনন্দ হয় সেজন্য কবিতাটি তার কাছে ঠিক মতো পাঠ করতে হবে, কবিতায় বর্ণিত সুন্দরের বর্ণনা এমন ক'রে করতে হবে যেন শিশুর মনশ্চক্ষুতে সেই সব সুন্দর বস্তু জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শিশুর মনে যেন হীনমন্যতার সৃষ্টি না হয়। হীনমন্যতাই মানবজীবনে অশান্তির প্রধান কারণ। যাঁরা আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন কালক্রমে তাঁরা মনের ভারসাম্য হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারেন। পড়াশুনা খেলাধুলা বা অন্য বিষয়ে অক্ষমতা এই রকম অন্য কারণে অনেক সময় শিশু নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে নিজেকে হীন ভাবতে শেখে। এ জন্য মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারাই অনেক সময় দায়ী। তাঁরা অনেক সময়ই শিশুর কাছে এত বেশী আশা করেন, তার সামনে এমন উঁচু আদর্শ স্থাপন করেন যে সে তাঁদের খুশী করতে না পেরে নিজেকে যে শুধু অক্ষম ভাবে তাই নয়, অপরাধীও মনে করে। শিশুর বিফলতাকে ব্যঙ্গ করলে, সব সময়ই তার ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করলে, পদে পদে তার স্বাধীনতা হরণ করলে, কথায় কথায় তাকে শাসন করলে সে আত্ম-প্রেম ও আত্ম-প্রত্যয় হারিয়ে নিজেকে অপদার্থ ও নগণ্য মনে করতে আরম্ভ করে। যে সব শিশুর দৈহিক বিকার আছে—যেমন যারা খঞ্জ, বধির, অন্ধ বা তোতলা—দুর্ভাগ্যবশতঃ তারাও অন্যের কাছে দয়া অথবা বিদ্রূপের পাত্র হয়ে নিজেদের হীন মনে করে থাকে। যে সব পরিবার দরিদ্র এবং সামাজিক মর্যাদা হতে বঞ্চিত সেই সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সঙ্গতিসম্পন্ন ও অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের তুলনায় নিজেদের ছোট মনে করে।

শিশুর মনে যাতে হীনমন্যতার সৃষ্টি না হয় সেজন্য মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সমাজেরই, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। শিশুর কী কী গুণ বা ক্ষমতা আছে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ বা ক্ষমতা আছে। সেগুলির সন্ধান করতে হবে এবং অনুকূল পরিবেশ রচনা ক'রে স্বভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠবার

সুযোগ করে দিতে হবে প্রত্যেকটি শিশুকে। অনুকূল পরিবেশে সকলেই দক্ষতার পরিচয় দেবে, কৃতিত্ব অর্জন করবে। সেই দক্ষতা ও কৃতিত্বকে সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি জানাতে হবে। যেমন, শ্রেণীকক্ষে তার কৃতিত্বের জন্য শিশুকে যদি অভিনন্দিত করা হয় তাহলে তার মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের উন্মেষ হয়ে সে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। ছাত্রছাত্রীদের যদি ছোট ছোট সংঘে বিভক্ত ক'রে তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা যায় তাহলে বিশেষ একটি সংঘের সবচেয়ে নির্বোধ শিশুটিও তার দলের অন্যান্য সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দলের কৃতিত্বে গৌরব বোধ করবে। এইভাবে তার মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে।

শিশুর যে সব অপূর্ণতা দূর করা সম্ভব সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, যার ইংরাজীতে জ্ঞান অল্প তাকে আলাদাভাবে পড়িয়ে ধীরে ধীরে তার শ্রেণীর উপযোগী ক'রে তুলতে হবে। যে অসুস্থতার জন্য লেখাপড়ায় অনগ্রসর তাকে উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে। যে সব অপূর্ণতা দূর হবার নয়—যেমন কুরূপ, খঞ্জত্ব, অন্ধত্ব ইত্যাদি —শিশু যাতে সুস্থ মনে সহজভাবে তাদের স্বীকার ক'রে নিতে পারে, সেজন্য তার মনে কোন লজ্জা ক্ষোভ বা গ্লানি না থাকে সেই মতো শিক্ষা দিতে হবে। যে সব অপূর্ণতা দৈবদত্ত সেজন্য সে যেন কর্ণের মতো সংকোচ বোধ না করে আপন পৌরুষেই অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচণ্ডতম সাফল্যের অধিকারী হবার চেষ্টা করে সেই মতো প্রেরণা দিতে হবে তাকে।

দুরন্ত শিশু

দুরন্ত শিশুদের নিয়ে বড়দের, বিশেষ করে মা-বাবাদের ভীষণ বেগ পেতে হয়। তাদের দৌরাত্ম্য একগুঁয়েমী, অবাধ্যতা আর অত্যাচার অনেক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের সামলাতে গিয়ে বড়রা হিমশিম খান, শেষে অপরাগ হয়ে হয় হাল ছেড়ে দেন, না হয় তাদের ওপর নির্মম হয়ে ওঠেন। অথবা কী করবেন বুঝতে না পেরে অশান্তির জ্বালায় জ্বলতে থাকেন। দুরন্ত দামাল শিশুরা বেশীক্ষণ কোন জায়গায় শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না, সব সময় দাপাদাপি লাফালাফি মাতামাতি করে বেড়ায়, যা চোখে পড়ে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অনেক জিনিষ ভেঙেচুরে ফেলে, গোছালো পরিবেশকে এক নিমেষে তছনছ করে দিয়ে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে; অন্যান্য শিশুদের পেছনে লাগে, নানাভাবে তাদের পীড়ন করে; শাসন মানে না, বারণ শোনে না, ভয় দেখালে ভয় খায় না, উল্টে আরও বেশী মরিয়া হয়ে ওঠে। এদের আচরণ নিজের বাড়িতে যেমন, অন্যের বাড়িতেও তেমনি। তাই মা-বাবাদের অনেক সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়, কখনো কখনো অপদস্থও হতে হয়। এই সব শিশুদের নিয়ে কী করা যায় এটা রীতিমত একটা ভাববার বিষয়। কিন্তু দুরন্ত শিশু কি সত্যিই আমরা চাই না? আমরা কি চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা মিনমিনে পিনপিনে গোবেচারা হবে? নিরীহ ভীরু প্রকৃতির হবে, জড় পুত্তলিকার মতো যেখানে বসিয়ে রাখবো সেখানেই বসে থাকবে, যা করতে বলবো তা-ই করবে? "সে ছেলে কে চায় বল কথায় কথায়, চোখে যার আসে জল মাথা ঘুরে যায়?" আমরা চাই তেমনি শিশু যার, "মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন"। দুরন্ত শিশু তো জীবন্ত শিশু। প্রাণ প্রাচুর্যে সে অহরহ ডগমগ করছে। তার দুরন্ত সাহস, সে ভয় ডর জানে না, কোন কাজে পিছপা হয় না, কোন কিছু তাকে দমিয়ে রাখতে দাবিয়ে রাখতে পারে না। প্রচণ্ড তার গোঁ যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সে সর্বদা প্রস্তুত, অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি, অপরিসীম তার মনের জোর, দুর্নিবার তার কৌতূহল। ঠিক মতো শিক্ষা পেলে এই সব শিশুরাই তো বড় হয়ে বড় বড় আবিষ্কার করবে, দুঃসাহসিক অভিযাত্রী হবে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে সমাজকে সমৃদ্ধির পথে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে উল্কার গতিতে—আমরা তো এমনি শিশুই চাই। দুরন্তপনা ভালো, কিন্তু অশালীনতা, অভব্যতা, অযৌক্তিক অবাধ্যতা, অত্যাচারিতা এসব নিশ্চয়ই ভালো

নয়। দুরন্ত হলেই যে অশালীন অভদ্র অত্যাচারী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। শরৎচন্দ্রের "ইন্দ্রনাথ" ছিল দুরন্ত, রবীন্দ্রনাথের "ছেলেটা" সেও ছিল দুরন্ত। তারা কিন্তু অভদ্র ছিল না, নিষ্ঠুর ছিল না। আমাদের শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা তাদেরই মতো দুরন্ত হোক এটাই আমরা চাই। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তেমনটি হয় না, যারা দুরন্ত তাদের চরিত্রে নানারকম অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠে। আমাদের দেখতে হবে এমনটা হয় কেন ?

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এজন্য আমরা বড়রা বিশেষ করে মা-বাবারাই প্রধানতঃ দায়ী। যে শিশুটি দুরন্ত তার প্রাণশক্তি অফুরন্ত, তার জেদ প্রচন্ড। নানারকম সৃজনশীল কাজে আর খেলাধুলায় যদি তার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় আর সেজন্য যদি তাকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে এই সব নিয়েই সে মেতে থাকবে। ছবি আঁকা, রঙ্ করা, বাড়িতে নিজস্ব ছোটো-খাটো যাদুঘর, চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা, ভালো ভালো ছবি কেটে বা আলোক চিত্র সংগ্রহ করে এ্যালবামে সাজিয়ে রাখা, মাটি চীনামাটি, চক খড়ি প্লাস্টার অব প্যারিস ইত্যাদির সাহায্যে নানান ধরনের পুতুল বানানো, রঙ-বেরঙের কাগজ কেটে সুন্দর সুন্দর নক্সা এবং জীবজন্তু ফুল ফল তৈরী করা, বাগান করা, গল্প কবিতা লেখা, গল্পের বই, গোয়েন্দা কাহিনী, শিকার বৃত্তান্ত, ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের গল্প, দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ, ইত্যাদি পড়া ; সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মজার মজার খেলাধুলা করা এই ধরনের হাজারো রকমের কাজে যদি তার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় এবং তার জন্য যথারীতি ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি আত্ম-প্রকাশের সার্থক ক্ষেত্র খুঁজে পাবে। তা না হলে তার অবরুদ্ধ প্রাণশক্তি যে অবাঞ্ছিত পথে ধাবিত হয়ে তাকে নানারকম অসঙ্গত আচরণ করতে প্ররোচিত করবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে ? এদিকে কিন্তু অনেক মাতাপিতারই কোনরকম হুঁশ থাকে না।

অনেক সময় বাবা-মা নানান কারণে তাঁদের দুরন্ত শিশুটিকে ঘরের বাইরে যেতে দেন না, অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে দেন না। এমন অবস্থায় তার অপরিসীম চঞ্চলতা নিয়ে কেমন করে সে নিজেকে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে শান্ত হয়ে থাকতে পারে ? স্বভাবতঃই সে অধৈর্য হয়ে ওঠে এবং হরেক রকমের দৌরাত্ম্য শুরু করে দেয়। বন্দী দশা থেকে মুক্তি না পেয়ে সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বড়রা যা চান না সেই সব কাজ করে তাঁদের শায়েস্তা করতে চায় ; তাদের কথা শোনে না, তাঁরা যা না বলেন, তার উল্টোটা করে। শাসন করলে আরও বেশী ক্ষিপ্ত আরও বেশী উগ্র হয়ে ওঠে।

তাদের মাঝে মাছে বাইরে নিয়ে গেলে, খেলার মাঠে অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে দিলে তাদের মধ্যে এ রকম প্রবৃত্তি গড়ে উঠতো না।

অনেক সময় বাবা মা নিজেরাই শিশুর অভব্য দুরন্তপনাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন হয় তাঁদের ঔদাসীন্য অথবা প্ররোচনা দিয়ে। শুরুতেই তাঁরা এ ধরনের আচরণকে সংযত না করে যখন বাড়াবাড়ির রূপ নেয় তখন তাঁরা যান শিশুকে দমন করতে। কিন্তু তখন তো এ ধরনের আচরণ করা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, সে তখন তাঁদের কথা শুনবে কেন? অনেক স্নেহান্ধ মাতাপিতা শিশুকে এতটুকুও কঠিন কথা বলতে চান না পাছে সে আঘাত পায়, শুধু তাই নয় এমন মা বাবাও আছেন যাঁরা শিশুকে অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করেন, তার অন্যায় আচরণকে সমর্থন করে থাকেন—যেমন অন্য শিশুকে সে যখন মারধোর করে তখন বলে থাকেন, "বেশ করেছো, আরও মারো।" অনেক সময় মজা দেখার জন্যও তাঁরা তাঁদের শিশুটিকে অন্য শিশুর পেছনে লেলিয়ে দেন। তাঁরা কি কখনো আশা করতে পারেন যে, তাঁদের শিশুটির মধ্যে সত্যিকারের সমাজবোধ ভদ্রতাবোধ কোন দিন গড়ে উঠবে?

শিশু অনুকরণ প্রিয়। প্রথম জীবনে মা-বাবা এবং আর যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন তাঁরাই তার আদর্শ। বড়রা যদি রূঢ় প্রকৃতির হন এবং অন্যের সঙ্গে তাঁদের আচরণ যদি নীতি বিগর্হিত হয় তাহলে শিশুও হবে তাঁদের মতো। দুরন্ত শিশুরা প্রায়ই সাধারণের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, তাদের কৌতূহল এবং পর্যাবেক্ষণ শক্তিও বেশ প্রখর। তাই বড়দের আচার আচরণ তাঁরা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। সুতরাং আমার দুরন্ত শিশুটি যদি অসামাজিক এবং কর্কশ হয়ে ওঠে তাহলে প্রথমেই আমার নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং এই আত্মবিশ্লেষণের আলোকে নিজেকে সংশোধন করতে হবে, সংযত করতে হবে।

শিশু বিগড়ে যায় পরিবেশের দোষে। আর এজন্য যে পরিবেশটি সব চেয়ে বেশী দায়ী সেটা হলো তার গৃহ পরিবেশ, যেখানে তার মা ও বাবার ভূমিকাটাই সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবাকে তাঁদের এই ভূমিকাটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেটি পালন করতে হবে।

শিশুর খেলাধুলা

খেলাধুলার প্রতি শিশুর একটা স্বভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতি আছে। শিশুরা খেলাধুলা ছাড়া থাকতে পারে না। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে তারা প্রচুর আনন্দ আস্বাদন করে এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই খেলার সাহায্যে তাদের দেহ ও মন সুগঠিত হয়ে ওঠে। নানাবিধ অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে তাদের পেশী এবং স্নায়ুগুলি পুষ্টিলাভ করে। তারা নানাভাবে হাত পা প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ-গুলিকে ব্যবহার করবার ক্ষমতা অর্জন করে। চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি রীতিমত ব্যবহার করার ফলে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন রঙ, রূপ, গন্ধ, রস প্রভৃতির অভিজ্ঞতা হয়। বস্তুর দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ভাবে ধারণা জন্মায়। দিক, দূরত্ব প্রভৃতির অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উম্মুক্ত মাঠ, প্রচুর সূর্যালোক ও পর্যাপ্ত বাতাসের মধ্যে খেলাধুলা করার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। মনের প্রফুল্লতা বাড়ে। শিশুদের নানারকম আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা খেলার মধ্যে চরিতার্থ হয়। তাদের কল্পনা খেলার ভেতর রূপলাভ করে। খেলার মধ্য দিয়ে দিয়ে শিশুদের কৌতূহল যেমন মেটে, তেমনি আবার তাদের অনুকরণ করার ইচ্ছাটিও পূরণ হবার সুযোগ পায়। এক সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার জন্য তাদের মধ্যে সমাজ-চেতনার সঞ্চার হয়। একজন অপরজনের কথা ভাবতে শেখে এবং দলের জন্য স্বার্থত্যাগ করবার শিক্ষালাভ করে। এক কথায়, খেলাধুলার ভেতর দিয়ে শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ হয় এবং ভবিষ্যতের উপযুক্ত হয়ে সে গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর খেলাধুলার প্রতি প্রত্যেক মাতাপিতারই লক্ষ্য রাখা দরকার। শিশুর বয়সোপযোগী খেলাধুলার আয়োজন করা এবং খেলা করতে শিশুকে উৎসাহিত করা সকল অভিভাবকেরই নিতান্ত করণীয় কাজ।

এক বছরের ছোট যে সব শিশু, তারা সাধারণতঃ হাত-পা ছুঁড়ে, মাথা ঘুরিয়ে, চোখ কান ফিরিয়ে খেলা করে। আগেই বলেছি তাদের ওপর একরাশ জামা কাপড় চাপিয়ে তাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অঙ্গ সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করা একেবারেই ঠিক নয়। প্রায় এক বছরের সময়, শিশুরা যখন হামাগুড়ি দিতে এবং হাঁটতে শেখে তখন এক জারগায় চুপটি করে বসে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরা যাতে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারে সেজন্য কোন একটা ঘর, অথবা কোন একটা নিরাপদ অথচ উম্মুক্ত জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এবং নানা ধরনের হালকা ছোট-খাটো সামগ্রী (যেমন চুষি, কাগজের ফুল

কমলালেবু, কৌটো ডিবে ইত্যাদি) চারপাশে ছড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে করে তারা তাদের চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারে। বছর দুই বয়েস হলে শিশুর জন্য নানারকম খেলনা এনে দিতে হবে এবং সেগুলি রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা দিতে হবে তাকে। সে যেন ইচ্ছে করলে খেলনাগুলো ব্যবহার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এরপর ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডি যখন তার মনকে আর বেঁধে রাখতে পারবে না তখন গৃহ সংলগ্ন অঙ্গণে বা উদ্যানে তার খেলাধুলার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। এই সব খেলার প্রাঙ্গণে বা মাঠে সূর্যের আলোক, মুক্ত বাতাস এবং গাছের স্নিগ্ধ ছায়া যদি থাকে, তাহলে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। সুতরাং যতদূর সম্ভব শিশুর ক্রীড়াভূমিতে আলো, ছায়া, আর বাতাসের আয়োজন করা দরকার। শিশু যত বড়ো হবে ততো তার খেলার ধরণ যাবে পালটে। যে শিশুটি একদিন হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দ পেতো, সে আজ দৌড়োদৌড়ি করতে, লাফঝাঁপ দিতে, দোলনায় দুলতে, ঘাসের ওপর ডিগবাজি খেতে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মাটির ওপর পিছলে পড়তে ভালবাসে। আরও যারা বড়ো তারা ঘুড়ি ওড়াতে, তিন চাকা সাইকেল চড়ে ছুটে বেড়াতে, লুকোচুরি খেলতে, গাছে চড়তে বেশী ভালবাসে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের যতো পুষ্টি ঘটে খেলাধুলার জটিলতাও ততো বেড়ে যায়। যারা ছোট তারা খেলাধুলায় স্বাধীনতাটা বেশী পছন্দ করে, অর্থাৎ খেলার ভেতর কোন রকম কড়া নিয়ম মেনে চলতে তারা একেবারেই রাজী নয়। কিন্তু যারা বড়ো তারা খেলার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ধারা মেনে চলতে উৎসুক। সুতরাং কোন্ কোন্ শিশুর খেলাধুলার ধরণ কী রকম হবে, সেটা নির্ভর করছে তাদের বয়েসের ওপর। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে বয়েসটাই এক্ষেত্রে সব নয়। দেহ এবং মনের পুষ্টি যে রকম, প্রধানতঃ তারই ওপর নির্ভর করছে একটি বিশেষ শিশুর কী ধরণের খেলাধুলার প্রয়োজন সেটা। বয়েসে ছোট হলেও তার মনের বিকাশ খুব উন্নত ধরণের হতে পারে, আবার দেহের খুব পুষ্টি হলে মনেরও যে তেমনি পুষ্টি হবে সে কথাও সব সময় ঠিক নয়। শিশুকে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে এবং মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে মাতাপিতা তাঁদের শিশুর দেহমনের কী রকম বিকাশ ঘটেছে সেটা বুঝতে পারবেন।

শিশু বড়োদের যা করতে দেখে নিজেও খেলাধুলার ভেতর তা-ই ক'রে থাকে। পুতুল খেলার ভেতর দিয়ে সে মা, বাবা, দাদা, বৌদি ইত্যাদি চরিত্রের অভিনয় করে। তার নিজের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলিরও পুনরাবৃত্তি করে তার খেলার ভেতর। বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে এসে শিশু তার পুতুলের বিয়ে দিতে বসে। বয়েস যতো বাড়তে থাকে শিশুর খেলায় কল্পনার স্থান

ততো বেশী হয়। বেদুইনের গল্প শুনে একটা লাঠির গোছাকে উট খাড়া ক'রে সে কল্পিত মরুভূমি অতিক্রম ক'রে যায়। কাগজ কেটে নানা রকম ফুল, ফল, পাতা, পাখি, জন্তুজানোয়ার সৃষ্টি করে। শিশুর এই সব কল্পনাকে বিকশিত ক'রে তোলার চেষ্টা সকল মাতাপিতারই করা দরকার। নানান রকম রঙীন কাগজ, রঙ, তুলি প্রভৃতি ছবি আঁকার উপকরণ, ভোঁতা কাঁচি, ছুরি, নরম মাটি, নানান আকারের কাঠের টুকরো প্রভৃতি অতি সহজলভ্য সামগ্রীগুলি শিশুদের যদি দেওয়া হয় তাহলে ছবি এঁকে, নক্সা ক'রে, পুতুল গড়ে, ফুল কেটে ইচ্ছে মতো তারা নিজের নিজের কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে সক্ষম হবে।

খেলার সঙ্গী

অনেক মাতাপিতা আপন শিশুকে অন্য কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলাধুলো করতে দেন না। তাঁদের ভয় পাছে সে মন্দ হয়ে যায়। তাই তাঁরা তাঁদের স্নেহাঞ্চলের আড়ালে শিশুটিকে অন্য সবার থেকে আগলে রাখতে চান। এর ফলে তার মনে সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারে না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করবার, নতুন পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার কোনদিনই হয় না। সে আত্মকেন্দ্রিক, অভিমানী এবং ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। নিজের সুখ দুঃখ নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকে। অতি সহজে ভেঙে পড়ে এবং বাস্তব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। কল্পনাপ্রিয়তা অতিমাত্রায় বেড়ে উঠলে তার মধ্যে নানারকম মানসিক ব্যাধিরও উৎপত্তি ঘটতে পারে। সুতরাং আপন আপন শিশুকে আর পাঁচজন শিশুর সঙ্গে মিলে মিশে খেলা করতে উৎসাহিত করা সকল মাতাপিতারই কর্তব্য। অন্যথায় তাঁরা নিজেরাই নিজেদের স্নেহ-পুত্তলিটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলবেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশুর সঙ্গী নির্বাচন করা খুব সোজা কাজ নয়। যে সব শিশুর দেহ এবং মনের পুষ্টি প্রায় একই রকম, অর্থাৎ সাধারণতঃ যাদের মধ্যে বয়েসের তারতম্য বড়ো একটা নেই, তারা যদি একসঙ্গে খেলাধুলো করবার সুযোগ পায় তাহলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। সঙ্গীদের বয়েস যদি খুব বেশী হয় তাহলে খেলার প্রকৃতিটা হবে অন্য রকম। তার ফলে শিশুর দেহ ও মনের ওপর চাপ পড়বে খুব বেশী। তাছাড়া বড়রা সব সময়ই তার ওপর কর্তৃত্ব করার ফলে শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি ব্যাহত হয়ে তার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবার এবং চিন্তা করবার শক্তি জাগবে না।

পক্ষান্তরে, তার সঙ্গীরা যদি তার চাইতে খুব বেশী ছোট হয় তাহলে সে আত্মশক্তিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে সকল ক্ষেত্রেই প্রভুত্ব করতে চাইবে— বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি তার মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে না। শিশুর সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। খেলার সঙ্গীদের মধ্যে যদি ঝগড়াঝাটি হয় তাহলে অভিভাবক যেন কোন একটি বিশেষ শিশুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করেন। অনেক সময় সমস্ত ঘটনাটা না জেনেই মাতাপিতা তাঁদের নিজেদের শিশুর পক্ষ নিয়ে অন্য শিশুদের তাড়না করেন। শিশুমনে এর রীতিমত প্রতিক্রিয়া হয়। শিশু মাতাপিতাকে ভালোমন্দ সকল কাজেই তার সমর্থক বলে ভাবতে শেখে এবং তার মধ্যে নীতিজ্ঞান ঠিকমতো বিকাশলাভ করেনা। ঝগড়াঝাটির যথার্থ কারণ নির্ণয় ক'রে তা দূর করবার চেষ্টাই করতে হবে এসব ক্ষেত্রে।

অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার যেমন প্রয়োজন আছে শিশুর, তেমনি আবার একা একা খেলা করারও তার দরকার আছে। নির্জনতাকে ভালবাসতে না শিখলে একাগ্রতার শিক্ষা হয় না। একাগ্রতার অভাব ঘটলে কাব্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন প্রতিদিন কিছুক্ষণ একাকী থাকতে শেখে। ভালো ভালো গল্পের বই, ছবির বই পড়তে দিলে, গান গাওয়া শেখালে, ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারলে শিশু এই সব দিয়ে তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে কাজে আর আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে। তার কল্পনাশক্তি প্রখর হবে। একাগ্রতার গভীরতা বাড়বে। সৃষ্টি করবার মতো মানসিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে সে।

ক্রীড়াতত্ত্ব

শিশুর বিচিত্র খেলাধুলোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্বের উত্থাপন করা হয়। একদল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক মনে করেন জীবন ধারণের জন্য শিশুদের বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হয় না। বড়রাই তাদের লালনপালন ও ভরণপোষণ ক'রে থাকেন; তাই শিশুর প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি বিভিন্ন ক্রীড়ার আকারে উৎসারিত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত স্পেনসার (Spencer) এই মতাবলম্বীদের অন্যতম। অপরপক্ষে গ্রুজ (Groos) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ধারণা শিশু খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী ক'রে

গড়ে তোলে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের ফলে তার দেহ সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়। শিশু মাতাপিতা ও অন্যান্য ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় ক'রে ভাবী কালের সমাজ-জীবনের উপযুক্ত ক'রে নিজেকে তৈরী করতে থাকে। অবশ্যই এ সব কাজ সে জ্ঞানতঃ করে না। আর একদল বৈজ্ঞানিক একটু নতুন ধরণের চিন্তা করেন। এঁদের বলে মনঃসমীক্ষক। এঁরা মনে করেন শিশু খেলার ভেতর দিয়ে তার অপূর্ণ ইচ্ছারাশিকেই চরিতার্থ করে থাকে। মনের চাপা আক্রোশ পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে নিজেকে হাল্কা করে। এমনি করে খেলার সাহায্যে তার মনের ভারসাম্যটি অক্ষুণ্ণ থাকে। যে শিশুটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা না করার জন্য প্রতি-দিন শিক্ষকের কাছে তিরস্কৃত হয় সে খেলার মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে, শিশুদের তিরস্কার করে শাস্তি দিয়ে শিক্ষকের প্রতি তার যে আক্রোশ সেটা পরোক্ষভাবে মিটিয়ে থাকে। পিতার মতো কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা যে শিশুর মনে প্রবল সে খেলার মধ্যে পিতার চরিত্র অভিনয় ক'রে তৃপ্তি লাভ করে। বলা বাহুল্য, শৈশবের সমস্ত স্তরের খেলাধুলোকে কোন একটিমাত্র মতবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মতবাদ প্রযোজ্য। শিশুর খেলাধুলার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এবং বিভিন্ন খেলায় সে যে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তার বিশ্লেষণ করলে তার বুদ্ধি, আগ্রহ, সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারা যায় এবং সেইমতো তাকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

শিশুর সঙ্গ ও সঙ্গী

শিশুর সঙ্গ

শিশুর তুলনা করা হয়েছে ফুলের সঙ্গে, কারণ সে ফুলেরই মতো সুন্দর। যে ফুল আর শিশু ভালবাসে না সে নির্মম। সুন্দর বস্তু যার মনে দাগ কাটে না, সৌন্দর্যের প্রতি যে কোন আকর্ষণ বোধ করে না কেমন করে বলবো তার মনটি কোমল? যে দরদী মরমী সে কি সুন্দরকে ভাল না বেসে পারে? কিন্তু ফুলের সঙ্গে নয়, ফুটন্ত কুঁড়ি অথবা বাড়ন্ত চারাগাছের সঙ্গেই শিশুর তুলনাটি বোধ করি আরও বেশী যথার্থ হবে। কারণ ফুল তো একটা পরিণতি —ফুল তো 'ফুটে ওঠা' নয়, 'ফুটে যাওয়া'। কিন্তু শিশু তো পরিণত মানুষ নয়, কুঁড়ি যেমন বিকচমান ফুল, শিশু তেমনি বিকচমান মানুষ, চারাগাছ যেমন বাড়তে বাড়তে বনস্পতি হতে চলেছে, শিশুও তেমনি চলেছে পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যময় পথ-রেখাটি বেয়ে। যাঁরা গাছপালা ভালবাসেন, গাছ-পালার পরিচর্যা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ফুল দেখায় যে আনন্দ তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ, অনেক বেশী বিস্ময় জমা হয়ে আছে কুঁড়িকে ধীরে ধীরে ফুল হয়ে ফুটে উঠতে দেখায়। একটি একটি করে একটু একটু করে পাপড়ি মেলতে মেলতে, রঙের আগুন ছড়াতে ছড়াতে, সৌরভের ঝর্ণা ঝরাতে ঝরাতে, কুঁড়িটি কেমন করে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, যিনি তা লক্ষ্য করেছেন তিনি অনেকদিন ধরে অনেক রকমের বিস্ময়কর আনন্দে তাঁর মনের পেয়ালাটিকে ভরে নিতে পেরেছেন। তেমনি বীজ থেকে হঠাৎ একদিন কেমন করে উদ্ভিদ শিশু উঁকি মারলো মাটির ওপর আকাশের তলায়, কেমন করে ক্রমে ক্রমে তার শাখা-প্রশাখা গজালো, পত্র-পল্লবের উদ্গম ঘটলো, কেমন করে বাড়তে বাড়তে একদিন সে বিরাট একটা মহীরূহে পরিণত হলো, ফুলে ফলে ভরে গেল—এই নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনগুলি যিনি লক্ষ্য করেছেন তিনি জানেন কত বেশী আনন্দ রয়েছে তাঁর এই অভিজ্ঞতায় নিছক একটি বনস্পতি দেখার তুলনায়।

শিশু পর্যবেক্ষণের কাজটিও এমনি আনন্দের, বিস্ময়ের। আশ্চর্য মধুর সে এক অভিজ্ঞতা, কচি কচি মিষ্টি মিষ্টি শিশুর দল, ডাগর ডাগর চোখে রাজ্যের কৌতূহল, অদ্ভুত অদ্ভুত তাদের প্রশ্ন, পরস্পরের সঙ্গে এই আড়ি, এই ভাব, কারো মুখে এখনো বুলি ফোটেনি, কেউ বা আলতো-আলতো কথা বলতে শিখেছে, কেউ এখনও দাঁড়াতে শেখেনি, কেউ বা টলমল করে হাঁটছে। যে

দৌড়তে শিখেছে তার দৌরাত্ম্য কতো! কিছুতেই তাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না, ঘরময় ছুটোছুটি করে জিনিসপত্র ভেঙে চুরে সবাইকে সে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। অসতর্ক মুহূর্তে ঘরের বার হয়ে ফড়িং, প্রজাপতি টিকটিকি, গিরগিটির পেছনে ঠা ঠা রোদ্দুরে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা বাগানে কোন একটা গাছের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে কাঠবেড়ালী, পিঁপড়ে, মৌমাছি কিংবা পাখ-পাখলীর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা। শিশুর জগতে যাঁদের আনাগোনা আছে তাঁরা এই ধরনের অজস্র মনমাতানো ছবি নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন যা তাঁদের অবসর মুহূর্তগুলিকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দেবে। নিজের অজ্ঞাতে তাঁরা ফিরে যেতে পারবেন বহু দূরে ফেলে আসা তাঁদের শৈশবের সেই সোনালী দিনগুলিতে যার ফলে শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সহজ ভাবে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সামান্য বস্তু থেকেই তাঁরা অসামান্য আনন্দ আহরণ করতে পারবেন—যে আনন্দের তুলনা হয় না, যে আনন্দ ধনদৌলত, ক্ষমতা, সম্মান কোন কিছুতেই পাওয়া যায়না। এই আনন্দের স্বাদ পেয়েই এক কবি লিখেছেন—"আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ, মনিক্য মুকুতা নিধি আমারে দিওনা বিধি, চাই না এ জগতের রাজত্ব সম্মান"। অন্য কবির কথায়—"তুমি তো আমার কাজ ভোলানোর খেলা, তুমিই আমার সোনারঙ ছেলেবেলা।"

শিশুর সঙ্গ আনন্দের, কিন্তু আরও বেশী আনন্দের কেমন করে ধীরে ধীরে সে বড় হয়ে উঠেছে দরদ দিয়ে সেই বিচিত্র প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা। শিশুটি কেমন করে ধীরে ধীরে বসতে দাঁড়াতে হাঁটতে দৌড়তে শিখছে, কেমন করে একটির পর একটি শব্দ আয়ত্ত করে একদিন পুরোপুরি কথা বলতে শিখছে—কি ধরনের শব্দ আগে আয়ত্ত করছে, কেমন করে ক্রমে ক্রমে জটিলতর বাক্য গঠন করে শিখছে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে। উচ্চারণের ধারা বদলাচ্ছে কেমন করে, কোন্ কোন্ অবস্থায় তার মনে কী কী ধরনের আবেগের সঞ্চার ঘটছে, কেমন করে সে তার বিচিত্র আবেগগুলিকে ফুটিয়ে তুলছে, বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি কী রকম, কেমন করে সেই সব ধারণা বদলে বদলে যাচ্ছে, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের ভেতর দিয়ে সে তার বিচিত্র চিন্তা আর দুরন্ত কল্পনাকে মেলে ধরছে কেমন করে, সমাজ-চেতনা নীতিবোধ বন্ধুপ্রীতি কীভাবে তার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে—এই সব ব্যাপার খুঁটিনাটি ভাবে লক্ষ্য করায় শুধু যে অফুরন্ত আনন্দ আছে তা-ই নয়, শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ধারাটি জানতে হলে, শিশু জীবনের ক্রমবিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে সব সূত্র সেগুলি আবিষ্কার করতে হলে, এক কথায় শিশু-মনের নাগাল পেতে হলেও এই ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। তাই শিশুর জীবন পর্যালোচনা

করলে আমরা একই সঙ্গে পেতে পারি কাব্য উপন্যাস ও বিজ্ঞান চর্চার অনবদ্য জীবন্ত একীভূত এক আনন্দ।

শিশুর সঙ্গ বড়োদের কাছে শুধু লোভনীয় নয়, বড়োদের জীবনের ওপর তার প্রভাবটিও কম নয়। A man is known by the company he keeps. শিশুদের সঙ্গী যিনি তাঁর মধ্যে শিশুদের গুণগুলিও সঞ্চারিত হয়। তাদের দুটি বড়ো গুণের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি তাদের সরলতা, অন্যটি তাদের অনাসক্তি। শিশু সরল—এ কথার অর্থ এই নয় যে তার মধ্যে হিংসা দ্বেষ লোভ মোহ ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলির অস্তিত্ব নেই। সবই আছে। তবে সে এখনো ভণ্ডামি শেখেনি। যখন তার মনে যে ভাবটির উদ্রেক হয় অকপটে সে তা প্রকাশ করে ফেলে। এখানেই তার সরলতা। তার সরলতার প্রকাশ আরও ঘটে তার মনের নির্মলতায়। এখন সে যার ওপর রাগ করছে, যাকে হিংসে করছে পর মুহূর্তেই তার সঙ্গে তার গভীর ভাব জমে উঠছে, তার প্রতি তার মনে আর এতটুকুও আক্রোশ থাকছে না। আমরা বড়োরা হয়তো সব সময় আমাদের মনের আবেগ প্রকাশ করতে পারবোনা, কিন্তু শিশুর সান্নিধ্যে এসে যদি আমরা আমাদের পরস্পরের প্রতি অবাঞ্ছিত আবেগগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পারি তা হলে আমাদের সমাজ-জীবনটি নিশ্চয়ই অনেক আনন্দের হবে, অনেক সুখকর হয়ে উঠবে। শিশু যখন কোন একটা জিনিস নিয়ে মেতে ওঠে তখন তার মধ্যে সে তার মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। যে জিনিসটা সে চাইছে, সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন, না পেলে সে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসে। জিনিসটা পেলে সে জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে তাই নিয়ে মেতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় যা নিয়ে এত কাণ্ড এত মাতামাতি তাই পড়ে রইলো অবহেলায়—তার দিকে সে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। গীতায় যে অনাসক্তির কথা বলা হয়েছে শিশুর জীবনে তো তারই জীবন্ত প্রকাশ ঘটে চলেছে দিন-রাত্তির। আমরা বড়োরা বুঝতে পারিনা নিরাসক্ত হয়ে মনপ্রাণ ঢেলে কর্তব্য পালন করা কেমন করে সম্ভব, কিন্তু শিশুই তো তার জীবন্ত উদাহরণ। শিশুর সান্নিধ্যে এসে এই মহান ক্ষমতাটি যদি আমাদের চরিত্রে জাগিয়ে তুলতে পারি তা হলে অনেক হতাশা অনেক দুঃখ-কষ্টের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে আমাদের জীবনকে আমরা অনেক বেশী সুন্দর ও সুখের করে তুলতে পারবো।

যত দিন যাচ্ছে ততই ছোটদের সঙ্গে বড়োদের সম্বন্ধে বেশী করে চিড় ধরছে। সমাজের অন্যান্য বয়স্কদের কথা দূরে থাকুক, নিজের ছেলে-মেয়েদের ওপর বাবা-মায়ের যে নিয়ন্ত্রণ সেটাও ক্রমশঃ শিথিল হয়ে ধসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তাই কিশোর কিশোরীরা, এমন কি একটু বড়ো শিশুরাও বড়োদের

আর মানছেনা, বড়োরাও তাদের দেখতে শুরু করেছেন সন্দেহের চোখে। বড়োদের মূল্যে বোধের কোন আকর্ষণ নেই ছোটদের কাছে। তাই সমাজের সংহতি শৃঙ্খলার ভিত উঠেছে নড়ে, আত্মকেন্দ্রিকতা আর অপরাধপরায়ণতার প্রসার ঘটে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। কেন এমন হলো ? তার একটা কারণ শিশুদের সঙ্গে থেকে বড়োরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গোড়া থেকে তাদের সঙ্গে না মিশে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে, তাদের অভাব অভিযোগগুলি বুঝতে এবং মেটাতে চেষ্টা না করে, ঠিক ঠিক মতো তাদের শিক্ষা না দিয়ে হঠাৎ একদিন, যখন তারা রীতিমত বড় হয়ে গেছে, যখন তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটি প্রকট স্বাতন্ত্র্য বোধ, বাইরের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে তাদের ওপর, তখন যদি বাবা-মা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে যান তাহলে তারা তাদের কথা শুনবে কেন ? তাই সমাজকে যদি ক্ষয় আর ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষে করতে হয়, যদি মানব জাতির জন্য একটি উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ রচনা করতে হয়, তা হলে বয়স্কদের মিশতে হবে শিশুদের সঙ্গে বন্ধু ভাবে, তাদের জন্য দরদভরা একটি মন নিয়ে।

কত কী করবার তো আমরা সময় পাই, তাগিদ বোধ করি। নিজের জীবন মধুতে ভরে তুলতে আর সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে শিশুদের সঙ্গে সহজ হয়ে মিশবার মতো মানসিকতা আর সময় কি আমরা করে নিতে পারবো না, যদি একান্ত ভাবে তা চাই ?

শিশুর সঙ্গী

মানুষ সামাজিক প্রাণী। দলবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে আমরা ভালবাসি। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবতেও আমাদের ভয় করে। নিঃসঙ্গ জীবনের ভয়াবহতার চিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে রবিনসন ক্রুশোর নির্জন দ্বীপে অতিবাহিত দিনগুলির বর্ণনায়, জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর আয়োজন করেও মনুষ্যসঙ্গের জন্য হাহাকারকে কিছুতেই সে প্রশমিত করতে পারেনি। আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের মুখেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি, "হায়,, যদি আমার কবুতরের মতো এক জোড়া ডানা থাকতো তাহলে এক্ষুনি এই মুহূর্তেই উড়ে চলে যেতাম আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-পরিজনের মাঝখানে!" হতভাগ্য দ্বীপান্তরিত বন্দীদের নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনীও প্রমাণ করে মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গ কত মূল্যবান, কত লোভনীয়। তাদের অনেকেই নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গেছে, অনেকে করেছে আত্মহত্যা। রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" কাহিনীটি মনস্তত্ত্বের বিচারে অভ্রান্ত, তারও মূল বক্তব্য—রাশি রাশি সোনাদানা মনিমুক্তো মানুষকে পারে না সেই তৃপ্তি সেই আনন্দ সেই স্ফূর্তি এনে দিতে যা পারে মানুষের সঙ্গ আর উদার মুক্তি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সাধুসন্ত, মুনিঋষিদের কথা বলছি। তাঁরা পারেন মাসের পর মাস বছরের পর বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে; নির্জন গিরিগুহায়, জনহীন গভীর অরণ্য প্রদেশে সচ্চিদানন্দের ধ্যানের গভীরে নিমগ্ন হয়ে, কিন্তু তাঁরা ক'জন? তাছাড়া তাঁরা তো অসাধারণ। অবশ্য নিঃসঙ্গ জীবন আমাদের কাছে দুর্বিষহ হলেও নিঃসঙ্গ মুহূর্ত আমরা সবাই কামনা করি, বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর চিন্তাশীল, যাঁরা কবি শিল্পী দার্শনিক অথবা অধ্যাত্ম জীবনের পথে যাঁরা যাত্রা শুরু করেছেন তাঁরা। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিতে আমরা নিজেদের মুখোমুখি হয়ে বসতে পারি, নিগূঢ় আনন্দানুভূতিগুলির রসাস্বাদন করতে পারি নিবিড় করে, আপন আপন সৃজনশীল চিন্তাগুলিকে ধীরে ধীরে ভেঙে-গড়ে নিজের মতো করে রূপ দিতে পারি।

মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গ নিছক আনন্দের বস্তু নয়, প্রয়োজনেরও। একক চেষ্টায় সমস্ত অভাব মেটানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভর করতেই হবে। বিপদে আপদে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি নিতান্তই দরকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বলশালী শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য চাই দলবদ্ধ প্রতিরোধ, একার চেষ্টায় যা সম্ভব

নয়। অনুকরণ করে, শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, অন্যের উপদেশ ও পরামর্শ নিয়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করি, একক চেষ্টায় যা কখনোই সম্ভব হতো না। মানুষ যদি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতো তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কখনোই অগ্রগতি ঘটতো না। এই রকম আরও অনেক কারণেই মানুষের পক্ষে মানুষের সঙ্গ অপরিহার্য।

শিশুকে যদি সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে তাকে সামাজিক করে তুলতে হবে। এজন্য আরও পাঁচটি শিশুর সাহচর্য দিতে হবে তাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে আজকাল মা-বাবারা বেশ মুস্কিলে পড়েছেন। যৌথ পরিবার প্রথা লোপ পেতে বসেছে। একক পরিবারগুলিও ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। আগেকার দিনে পরিবারে বহু সংখ্যক শিশু থাকায় তাদের সঙ্গীর অভাব ঘটতো না। এখন কিন্তু এটাই একটা প্রধান সমস্যা। তাছাড়া পরিবেশের সামাজিক চেহারাটাও শিশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে সব সময় অনুকূল নয়, যার জন্য সতর্ক মাতাপিতারা সন্তানদের বিপথে যাবার আশঙ্কায় বাইরে পাঠাবার সাহস পান না। পক্ষান্তরে নানান কারণে নিজেরাও দিনের বেশীক্ষণটাই ঘরের বাইরে থাকেন বলে শিশুদের সাহচর্য দিতে পারেন না। দিতে পারলেও সেটা যথেষ্ট হতো না। কারণ শিশুর মন আর বয়স্কদের মন তো এক নয়। বয়স্করা যতই স্নেহপ্রবণ হোন না কেন তাঁরা কিছুতেই শিশুর স্তরে নেমে আসতে পারেন না, নেমে আসা তাঁদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। শিশুর চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন-কল্পনা-অভিরুচি, পছন্দ-অপছন্দ সব কিছু নিয়ে যে জগৎ, সেই অপূর্ব বিচিত্র জগৎটি আমরা বড়রা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি—বুদ্ধির পরিপক্কতায়, বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই জগৎটি আমাদের কাছে আজ অর্থহীন হয়ে গেছে। সুতরাং যতই চেষ্টা করি না কেন হারিয়ে যাওয়া শিশু মনটিকে কিছুতেই আর ফিরে পাই না। তাই শিশুর সঙ্গে সহজ হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে শিশুর মতো মিশতে পারি না। শিশুও তাই আমাদের মধ্যে তার মনের মতো সঙ্গী খুঁজে পায় না, আমাদের আচরণের কৃত্রিমতা অনায়াসেই তার কাছে ধরা পড়ে যায়। তাছাড়া অজস্র সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আমরাও পারি না সব সময় আমাদের মনটিকে অনাড়ম্বভাবে শিশুর সামনে মেলে ধরতে, পারিনা তার প্রয়োজন মতো সাড়া দিতে। সে গল্প শুনতে চায়, তখন গল্প বলার মেজাজ আমার থাকে না। সে যখন চায় খেলা করতে, আমি বলি—বই নিয়ে বসো। তার সমস্যার কথা শুনে হয় হেসে উঠি, নয়তো বা উদাসীন হয়ে থাকি। কারণ সেটা আমার কাছে নিতান্তই একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তাই সে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারে না, পারে না আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ

করতে। সোজা কথা বড়রা কখনো শিশুদের সমকক্ষ হতে পারে না, তাই তাদের মধ্যে ভাবের বিনিময়, ভাবনার আদান প্রদান ঘটতে পারে না। সমকক্ষতা না থাকলে বন্ধুত্ব জমে না। তাছাড়া বড়রা যতই সহজভাবে শিশুর সঙ্গে মিশুন না কেন, শিশু কিছুতেই তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না, কারণ বড়রা বড় বলেই তাঁদের সে ভয় করে, সমীহ করে, এড়িয়ে চলতে চায়। যে শিশু সমবয়সী শিশুদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত, যে নিঃসঙ্গ অথবা একমাত্র বড়রাই যার সঙ্গী তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। সে আত্মকেন্দ্রিক এবং চাপা প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সহজভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে না, দ্বিধা এবং সংকোচ পদে পদে তাকে আড়ষ্ট করে রাখে। সহানুভূতি, দরদ, সহযোগিতা ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলির উন্মেষ ঘটতে পারে না তার চরিত্রে। সে যদি অতি যত্নে মানুষ হয় তাহলে একগুঁয়ে হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে পরনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে না সে। অতিরিক্ত অবহেলায় মানুষ হলে হয় সে হতাশ, নিরাশাবাদী এবং আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে পড়ে, অথবা তার মনে অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি হয়। এমনি করে নিঃসঙ্গ শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে, যখন সে আর শিশুটি থাকে না, যখন তাকে বয়স্কের দায়িত্ব বহন করতে হয়, তখন সে পদে পদে বিপদে পড়ে, অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না, মানিয়ে চলতে না পারার অসহনীয় ক্লেশ তাকে অনুক্ষণ ক্লিস্ট করে, তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, কর্মজীবনে সে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করে নিজেকেই জর্জরিত করে। চূড়ান্ত অবস্থায় তার পক্ষে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলাও অসম্ভব নয়। যাদের শৈশব সাথীহীন অবস্থায় কেটেছে তারা সমাজের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে নানানরকম অসামাজিক কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে।

সুতরাং মাতাপিতাকে দেখতে হবে তাঁদের সন্তান যেন সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ মেলামেশার সুযোগ পায়। সঙ্গীরা সমবয়স্ক হলে সহজভাবে সে তাদের সঙ্গে মিশতে পারবে, তার মনে ভয় বা আড়ষ্টতা থাকবে না। সমবয়স্কদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সে সহযোগিতা শিখবে; শুধু দাবি নয়, দায়িত্ব সম্বন্ধেও সে সচেতন হয়ে উঠবে, কিছু পেতে হলে কিছু দিতেও হয় তার মধ্যে এই বোধ জন্মাবে; তাদের সঙ্গে তার ভাবের এবং ভাবনার আদান প্রদান ঘটবে; মান অভিমানের মধ্যে সে শিখবে আত্মবিশ্লেষণ করতে, নিজেকে সংযত ও সমুন্নত করতে।

অবশ্যই সন্তানের জন্য সঙ্গী নির্বাচনে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। যেখানে নিকট পরিবেশে উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব রয়েছে সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। শিশু-সঙ্ঘ, বিদ্যালয়ের ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিশু-উদ্যান, বাড়িতে নির্দিষ্ট

সময়ে বন্ধুবান্ধবদের ছেলেমেয়েদের মিলিত হবার এবং নানাবিধ কাজকর্ম ও খেলাধুলার আয়োজন—এই ধরনের কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা। আর একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার। কোন একটি শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তার সমবয়স্ক ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই সাহচর্য দরকার। স্ত্রী পুরুষ দু-ই নিয়ে সমাজ। পারিবারিক এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই উভয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। স্ত্রী পুরুষের সার্থক অভিযোজনের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করছে ব্যক্তি ও সমাজের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। একের ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্য তাই অন্যের সাহচর্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আগেই বলেছি নিঃসঙ্গ জীবন আমরা চাইনা, কিন্তু কখনো কখনো চাই নিঃসঙ্গ মুহূর্ত। নিঃসঙ্গ মুহূর্তের প্রয়োজন কেন সে সম্বন্ধেও দুচার কথা আগেই বলা হয়েছে। যে মানুষ সব সময়ই পরসঙ্গনির্ভর সে সত্যিই হতভাগা, তার মধ্যে কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আত্মপ্রীতি, আত্মপ্রত্যয়, চিন্তাশীলতা সৃজনশীলতা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ গড়ে উঠতে পারে না। তাই সমবয়স্কদের সাহচর্য দেওয়া যেমন দরকার, তেমনি দরকার মাঝে মাঝে শিশুদের একলা থাকার শিক্ষা দেওয়া। এজন্য তাদের মধ্যে কতকগুলি সখ (hobby)-এর সৃষ্টি করতে হবে। বই পড়া, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লেখা, বাগান করা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা শেখা, দেশ-বিদেশের ডাক টিকিট সংগ্রহ করা, সংগ্রহশালা গড়ে তোলা ইত্যাদি হরেক রকমের সুন্দর সুন্দর সখ শিশুদের মধ্যে গড়ে তোলা যায় যার সাহায্যে তারা আনন্দদায়ক সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে নিজেদের নিঃসঙ্গ মুহূর্ত-গুলিকে ভরে রাখতে পারবে, পারবে তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির বিকাশ সাধন করে নিজেদের উদ্ঘাটিত করতে, প্রসারিত করতে।

আর একটা কথা। মানুষ একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। সে বিশ্বপ্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলের সঙ্গে তার একটা নাড়ীর যোগ আছে, আছে একটা আত্মিক বন্ধন। শুধু তাই বা কেন, মুনি-ঋষি-বিজ্ঞানীদের মতে শুধু জীবের সঙ্গে নয়, জড়ের সঙ্গেও মানুষের একটি আত্মীয়তা আছে—একই শক্তির বিকাশ ঘটেছে সকলের মধ্যে, বিশ্বজগৎ একটি অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব। এই কারণেই মানুষ শুধু মানুষেরই সঙ্গ ভালবাসে না, ভালবাসে পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-প্রান্তর, নদী-সমুদ্র, মেঘ-নক্ষত্র, গাছপালা পশু-পাখি কীটপতঙ্গ সকলেরই সাহচর্য। এই সর্বজনীন ভালবাসার মধ্যেই মানুষের চরমতম উপলব্ধির ইঙ্গিতটি পরিস্ফুট। তাই শিশুকে যেমন শিশুর সাহচর্য দিতে হবে, তেমনি দিতে হবে প্রকৃতির সাহচর্য। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবার শিক্ষা দিতে হবে তাকে। ঋতুভেদে গাছপালার পরিবর্তন, হাজারো পাখির

বাহার, ফড়িং প্রজাপতি, গিরগিটি, টিকটিকি, কাঠবিড়ালী, বেড়াল-কুকুর, গোরু-মোষ. ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি বিচিত্র প্রাণীর আশ্চর্য সব কাণ্ড কারখানা, নৈশ আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্রের অপার্থিব রূপচ্ছটা, মেঘের বৈচিত্র্য, রামধনুর রঙ্‌ পর্যবেক্ষণ করে বিশাল বিশ্বের সঙ্গে এক আশ্চর্য মধুর একাত্মতা অনুভব করবে সে—সে শিখবে স্বার্থপরতার আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে অসীমতার মধ্যে নিজেকে বিস্তারিত করে দিতে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে।

জীবনের লক্ষ্য জীবনকেই সুন্দর করে গড়ে তোলা। সেজন্য শিশুদের সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে।

শিশুর কল্পনা

মানব-জীবনে কল্পনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বস্তুতঃ মানুষের যা কিছু কীর্তি, যা কিছু সৃষ্টি তার মূলে আছে তার উর্বর কল্পনা। কল্পনা করতে পারি বলেই অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানকে গ্রথিত ক'রে আমরা আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাটি অনুভব করতে পারি ; কার্য-কারণের আলোকে আমাদের পরিবেশকে ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং তার সঙ্গে নিজেদের সহজে অভিযোজন করতে পারি। কল্পনার সরস সাহচর্যে আমাদের অবকাশ মুহূর্তগুলি মধুময় হয়ে ওঠে। রূঢ় বাস্তবের আঘাতে মনে যত ক্ষত হয় সেগুলি কল্পনার স্নিগ্ধ পরশে জুড়িয়ে যায়।

সামাজিক অভিযোজন এবং সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশ নির্ভর করে কল্পনার ওপর। কেমন আচরণ করলে অন্যের কাছে কী রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশু সেটা কল্পনা করতে শেখে এবং সেইভাবে নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমনি করে সে ক্রমে-ক্রমে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে। সার্থকভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতে হলে পরস্পরের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে হবে। কিন্তু সহানুভূতির উদ্ভব হয় কেমন ক'রে ? কল্পনার কোলেই এই মহৎ গুণটি জন্ম। অন্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম কল্পনা করেই আমরা তার আনন্দে উৎফুল্ল এবং দুঃখে ক্লিষ্ট হই। এই ভাবেই আমাদের মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। শিশুর পক্ষে অন্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম কল্পনা করা সহজ, কারণ তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধ জেগে ওঠে ধীরে ধীরে। এই স্তরে, অর্থাৎ যখন সে নিজেকে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করতে শেখেনি তখন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে শিশুর মনে সহানভূতির বোধটি দৃঢ়তর হবে ; ফলে বড়ো হয়েও সে একজন বিবেচক ও দরদী নাগরিক হয়ে উঠবে। শিশুর কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে একই প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে নীতিজ্ঞান, কর্ম-নিষ্ঠা ইত্যাদি আরও অনেক সদ্‌গুণেরও বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। যদি শিশুকে বাস্তব বা কাল্পনিক চরিত্র সম্বন্ধে বই পড়তে দেওয়া হয় অথবা গল্প শোনানো হয়, তাহলে সে কল্পনা করবে সে নিজেই যেন এই সব নায়ক-নায়িকার মতো আচরণ করছে। তার সম্মুখে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার অজ্ঞাতসারেই সেটি তার চরিত্রে রূপায়িত হয়ে উঠবে। আমরা জানি চরিত্রের ভিত্তি হলো কতকগুলি মূল্যবোধ (Sense of values)। যার মূল্যবোধ যে রকম তার চরিত্রও সেই রকম। উপযুক্ত উপায়ে বাঞ্ছিত মূল্যবোধ সৃষ্টি

করার ব্যাপারেও কল্পনার গুরুত্ব কম নয়। উদাহরণ স্থাপন, জীবনী পাঠ ও আলোচনা, মহান ব্যক্তিদের জন্মদিবস পালন, ইত্যাদি এই রকম কয়েকটি উপায়।

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাযথ ভাবে উত্তেজিত বা উদ্দীপিত হয়ে যে অভিজ্ঞতা হয় তার নাম সংবেদন (sensation)। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বকের উত্তেজনা থেকে আমরা যথাক্রমে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শাদির সংবেদন লাভ করি। তাছাড়া পেশীর সঞ্চালন থেকে যে অভিজ্ঞতা হয় তাও একধরণের সংবেদন। দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন অবস্থায় আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আরাম, যন্ত্রণা ইত্যাদি অন্য আর এক ধরণের সংবেদনও লাভ ক'রে থাকি। উত্তেজক বস্তু যতক্ষণ আমাদের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করে ততক্ষণই আমাদের সংবেদন হয়; যতক্ষণ একটা বস্তু চোখের সামনে থাকে ততক্ষণ ধরে সেটাকে দেখি, কিন্তু বস্তুটা চোখের আড়াল হলেই আমাদের আর দর্শনের সংবেদন হয় না। যতক্ষণ কানের কাছে একটা শব্দ হতে থাকে ততক্ষণ ধরে সেটা আমরা শুনতে পাই, শব্দটা থেমে গেলে শোনার অনুভূতিটাও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু উত্তেজকের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সংবেদনের অবসান ঘটলেও আমরা মনে মনে প্রতিটি সংবেদনের একটা ছবি এঁকে রাখি। যেমন, একটা শ্বেত পদ্মের দিকে যতক্ষণ তাকিয়ে থাকি ততক্ষণ সেটা দেখতে পাই, কিন্তু আমার সম্মুখ থেকে শ্বেতপদ্মটি সরিয়ে নিলে যদিও সেটা দেখা আর সম্ভব হয় না তবু আমার মনশ্চক্ষুতে তার রূপটি যখন তখন ভেসে উঠে। শুধু দর্শনের বেলাতেই নয়, সকল রকম সংবেদনেরই একটি মানসচিত্র (image) আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। অবশ্য সকল রকম মানসচিত্র সমান উজ্জ্বল হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় দৃশ্য বস্তুর মানসচিত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল, তারপরেই শ্রাব্য বস্তুর স্থান; সংবেদন সংক্রান্ত মানসচিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের কথাবার্তায় ও লেখায় দৃশ্য এবং ধ্বনিসূচক শব্দেরই প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন মানসচিত্রের আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক—অর্থাৎ একজনের ক্ষেত্রে যে ধরনের মানসচিত্র খুব স্পষ্ট অন্যের ক্ষেত্রে হয়তো তা খুবই ক্ষীণ।

কারো কারো বেলায় কোন কোন মানসচিত্র এতই স্পষ্ট ও সজীব যে সেগুলি বাস্তবের মতোই স্পষ্ট। কবি, শিল্পী, দার্শনিকেরা কোন কোন সময়ে এই ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকেন। আমরা আগেই বলেছি ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মানসচিত্র অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম। যারা অল্পবয়স্ক তারা অনেক সময় তাদের জীবন্ত মানস চিত্রের সঙ্গে বাস্তবের বিভেদটা বুঝতে পারে না; কল্পনায়

যা প্রত্যক্ষ করে সেটাকে বাস্তব বলে ভুল ক'রে বসে। এই ধরণের একটি শিশু প্রায়ই তার কল্পনার চিত্রকে বাস্তব বলে ভুল করতো। একদিন ট্রেনে চড়ে বাবা-মার সঙ্গে সে কোন এক জায়গায় যাচ্ছে। খোলা জানালার পাশে বসে মুক্ত প্রান্তরের ওপর তার দৃষ্টিটি প্রসারিত ক'রে দিয়েছে। হঠাৎ বাবা-মাকে সম্বোধন ক'রে বলে উঠলো—ঐ দেখো, একটা সবুজ গোরু কেমন আমাদের দিকে চেয়ে আছে। বাবা-মা তাকিয়ে দেখলেন সবুজ গোরু তো দূরের কথা কোন জন্তুই নেই, এমনকি কোন লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ও নেই সেখানে। আর একদিন ছেলেটা তাদের বাড়ীর বারান্দায় বসে সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়েছিল। পাশে ছিলেন আর একজন। হঠাৎ সে বলে উঠলো—দেখো, দেখো দুটো লাল বেড়াল কেমন লড়াই করছে। মাঠে তখন কোন বেড়ালই ছিল না। সবুজ গোরু, লাল বেড়াল তার কল্পনা-রাজ্যের প্রাণী হলেও শিশুটির কাছে কিন্তু তারা ছিল বাস্তব। কল্পনার প্রাচুর্য ও গভীরতাই এই ধরণের অভিজ্ঞতার জন্য দায়ী। আগে বলেছি এই ধরণের শিশুকে মাতা-পিতা (বা অন্যান্য বয়স্করা) অনেক সময় মিথ্যেবাদী বলে ভুল করেন এবং তিরস্কার ক'রে থাকেন। তার কারণ শিশুর কল্পনার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের অভাব। বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে যে সীমারেখাটি রয়েছে তার সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করা নিশ্চয়ই দরকার; কিন্তু তার মধ্যে এই বোধটির অভাব দেখলে হতাশ হবার বা তাকে সেজন্য তাড়না করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। শিশু যত বড়ো হবে, তার বুদ্ধি যত পরিপক্ক হবে, আবেগ যত সংযত হবে, তার অভিজ্ঞতার পরিধি যত বিস্তৃত হবে ততই সে নিজে থেকে বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারবে। অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে, মানসচিত্রগুলিকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারলে, শিশুকে শিক্ষাদানের কাজটা সহজ হবে। বস্তুতঃ কল্পনার প্রখরতার সঙ্গে নানারকম দক্ষতার একটি নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান। যে ছেলেটির কথা একটু আগে বললাম তার অংকন-শৈলী পরিবারের পরিচিত শিল্পীদেরও মুগ্ধ করেছিল। এমন অনেক বিখ্যাত চিত্রকরের কথা শোনা যায় যাঁদের কল্পনার বস্তুটি এতই জীবন্ত যে কাগজের দিকে চোখ রেখে বস্তুটার কথা কল্পনা করলেই কাগজের ওপর সেটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, তারই ওপর তখন তাঁরা তুলি বুলিয়ে যান।

যার মানসচিত্রগুলি যত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে তার পক্ষে সংশিলষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করা তত সহজ হবে। নির্ভুলভাবে শিশুকে বানান শেখাতে হলে সুকৌশলে তার চাক্ষুষ, শ্রাবক ও পৈশিক মানস-চিত্রগুলিকে জাগিয়ে তুলতে

হবে। যদি সে বার বার বানানটা দেখে, বলে, এবং লেখে তাহলে তিন ধরণের মানসচিত্রের সাহায্যে বানানটা সে নির্ভুলভাবে লিখতে ও বলতে পারবে। কোন হাতের কাজ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হলে ঠিক ঠিক স্পর্শ ও পেশী সঞ্চালনের মানসচিত্রগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যথার্থভাবে দৃশ্যের ও শব্দের মানস-চিত্রগুলিকে উদ্দীপিত করতে পারলে কবিতার রসাস্বাদন সহজ হবে।

মানসচিত্রগুলিই কল্পনার প্রাথমিক রূপ। নানাবিধ মানসচিত্রকে নানারকম সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা কল্পনার জাল বুনে চলি। কল্পনা কখনো বাস্তবধর্মী হয়, অর্থাৎ বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজি আমরা কল্পনার মধ্যে; কখনো বা কল্পনা হয় অবাস্তব, দুর্বার, অলীক অথবা অর্থহীন। কখনো কল্পনা হয় সৃজনশীল, যেমন কবি শিল্পী বৈজ্ঞানিকের কল্পনা; কখনো বা অন্যানুসারী, যেমন লেখকের অনুসরণে পাঠকের কল্পনা (লেখক যেমনটি কল্পনা করেছেন পাঠক তেমনটিই কল্পনা করেন)।

কল্পনার উৎকর্ষ নির্ভর করছে মানসচিত্রগুলির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির ওপর। তাই শিশুর কল্পনাকে সমৃদ্ধ করতে হলে তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটিকে ব্যাপক ও বিচিত্র করতে হবে। নানা উপায়েই সেটা করা যায়।

শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তিটাকে উন্নত করতে হবে। তাহলে তার চতুষ্পার্শ্বে অহরহ যে সব বিচিত্র ঘটনা ঘটছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেগুলি লক্ষ্য ক'রে সে অজস্র অভিজ্ঞতা লাভ করবে। প্রকৃতিপাঠে শিশুকে কৌতূহলী ক'রে তুললে এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হবে। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীতচর্চা, মৃৎ-কর্ম, উদ্যান-রচনা ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের প্রতি যদি শিশুকে অনুরাগী ক'রে তোলা যায় তাহলে তার চিত্ত-ভূমিটি সরস ও উর্বর হয়ে সৃজনশীল কল্পনার উদ্গম হবে। খেলাধূলার মাধ্যমেও শিশুর কল্পনা সম্পদশালিনী হয়ে ওঠে। সকলেই লক্ষ্য করেছেন শিশুর কল্পনা নানাবিধ খেলার মাধ্যমে অবাধে মুক্তিলাভ করে; তার দুরন্ত কল্পনা রূপ নেয় তার বিচিত্র খেলাধূলায়। পাঠাভ্যাস গড়ে তুললে শিশুর মনে অজস্র ধারণার উন্মেষ হয়ে তার কল্পনাকে ঐশ্চর্যময়ী ক'রে তুলবে। শিশুকে গল্প বলতে এবং গল্প লিখতে হলে তাকে নতুন ক'রে বিশেষ ভঙ্গিমায় তার মানসচিত্রগুলিকে সাজাতে হবে। এইভাবে তার মধ্যে সৃজনশীল কল্পনার ক্ষমতাটি গড়ে উঠবে। একই উদ্দেশ্যে শিশুদের প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করতেও বলা যেতে পারে। ভ্রমণেও শিশুর কল্পনা সমৃদ্ধ হয়। নানান স্থানে শিশু নানা রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বই পড়ে বা অন্যের মুখে শুনে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয় নিজে

প্রত্যক্ষ করলে সেই সব বস্তু সম্বন্ধে তার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট ধারণা জন্মে। এই জন্যই শ্রেণী কক্ষের চার দেয়ালের মাঝখানে ইতিহাস ভূগোল সমাজবিদ্যা ইত্যাদির আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার। অনেক সময় নিকট পরিবেশেই এমন অনেক কিছু থাকে (যেমন গ্রামের ভূ-প্রকৃতি, বিভিন্ন পাড়া, ইত্যাদি) যা প্রত্যক্ষ করলে শিশুর ধারণা স্পষ্ট ও কল্পনা সমুজ্জ্বল হয়। অনেক সময় পাহাড় পর্বত, ঐতিহাসিক ইমারত, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বিজ্ঞান-মন্দির ইত্যাদি দেখবার জন্য শিশুদের দূর পরিবেশেও নিয়ে যাবার দরকার ঘটতে পারে। তার সবটাই সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও যতটা সম্ভব ততটাই করা বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে চড়ুইভাতির আয়োজন করলে মুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে অবাধ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে শিশুদের কল্পনা বিস্তার লাভ করবে। বিদ্যালয়ে বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে তাতে যোগদান করে তাদের কল্পনা শানিত হতে পারবে। শিশুরা নাটকাভিনয় ভালবাসে, তার কারণ প্রধারণতঃ দুটি। প্রথমতঃ শিশু সূক্ষ্ম চিন্তা অপেক্ষা স্থূল বস্তুর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। স্থূল বস্তু বা ঘটনাকে যত সহজে সে বুঝতে পারে তত সহজে সূক্ষ্ম চিন্তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাই সূক্ষ্ম বিষয় বোঝাবার জন্য। নানাবিধ স্থূল সামগ্রী (concrete) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ ক্রীড়ার প্রতি শিশুর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। নাট্যাভিনয় শিশুর এই দুটি চাহিদাই পূরণ করে। শিশু চোখের সামনে কতকগুলি ঘটনাকে স্থূলভাবে ঘটতে দেখে এবং অভিনয়টাকে এক ধরণের খেলা বলেই মনে করে। তাই যথাসম্ভব শিশুদের দিয়েই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলে তারা যেমন মজা পাবে, তেমনি তাদের কল্পনাও উন্নতিলাভ করবে। তাদের পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা রকমের অভিনয় আয়োজিত হতে পারে। তাতে পাঠ্য বিষয়টাও তারা ভালো করে আয়ত্ত করতেই পারবে।

কল্পনার প্রয়োজন যে অনেক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। মানুষ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে কল্পনার রাজ্যে যত বেশী প্রবেশ করে ততই সে বাস্তব জীবনের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। তখন সে সমাজের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজন করবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। এমন কী নিজের জৈবিক প্রয়োজন সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে উদাসীন হয়ে ওঠে।

বাস্তব সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে সে তখন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে বেড়ায়। এই রকম অবস্থা স্পষ্টতঃই এক ধরনের মানসিক ব্যাধির লক্ষণ। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে শিশুর মধ্যে যেন অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতার সৃষ্টি না হয়। তার বাস্তব সমস্যাগুলি আমাদের বুঝতে হবে এবং তাদের সমাধানে তাকে সাহায্য করতে হবে। শিশুর জীবনে বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে যাতে একটা সুস্থ ভারসাম্য গড়ে ওঠে সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের।

শিশুর শিক্ষা

শিক্ষার অন্ত নেই। মানুষ জন্ম মুহূর্ত থেকে সুরু করে মৃত্যু বরণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু শৈশব কালে মানুষ যা শেখে তার বিচিত্রতা এবং দ্রুততা সত্যি সত্যিই বিস্ময়কর। যে শিশুটি কিছুকাল আগে দিনরাত্তির বিছানায় শুয়ে শুয়েই সময় কাটাতো, সে ক্রমে ক্রমে বসতে, হামাগুড়ি দিতে, হাঁটতে, হাত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী ধরতে, কথা বলতে, খেলা করতে শিখেছে। প্রতি মুহূর্তে সে নতুন নতুন কাজ করার ক্ষমতা ও কৌশল আয়ত্ত করেছে। এইসব কাজ আমাদের কাছে খুব সহজ মনে হলেও এগুলি আয়ত্ত করা কিন্তু এত সহজ ছিল না। তার জন্য দেহ মনের অত্যন্ত জটিল পরিপুষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ না ঘটলে এগুলি আয়ত্ত করা কখনই সম্ভব হত না।

শিক্ষা বহু বিচিত্র হলেও প্রধানতঃ তাকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ইন্দ্রিয়-শিক্ষা, পৈশিক-শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং মানসিক শিক্ষা। শিশু যে সব ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে আয়ত্ত করবার জন্য এবং বিকশিত ও পরিপুষ্ট করে তোলার জন্য তাদের চালনা ও ব্যবহার করা দরকার। চারিপাশের অজস্র রূপ রঙ শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শের সংস্পর্শে এসে শিশুর চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ পুষ্টিলাভ করে। শিশু প্রতি মুহূর্তেই এই সব ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে তাদের আয়ত্ত করতে শেখে চারিপাশের বিচিত্র বস্তুর সংস্পর্শে এসে, তাদের নাড়াচাড়া করে। দিকে দিকে ছুটোছুটি করে সে তার অপরিসীম কৌতূহল চরিতার্থ করে এবং তার অজ্ঞাতেই বিভিন্ন পেশীর ওপর তার অধিকার জন্মায়। সে যতো বড়ো হতে থাকে ততোই সমাজের প্রভাব তার ওপর বেশী করে পড়ে। সমাজের ভয়ে ও প্ররোচনায় সে নিজের মনের অনেক গোপন প্রেরণাকে সংযত করতে শেখে। ধীরে ধীরে শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানভাণ্ডারটিও পূর্ণতর হয়। তার বুদ্ধিশক্তিরও উৎকর্ষ ঘটে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার বুদ্ধির বিকাশকে দ্রুততর করে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য সে বুদ্ধির প্রয়োগ করতে শেখে।

শিম্পাঞ্জী গরিলা বানর কুকুর বেড়াল খরগোস মুরগী পায়রা ইত্যাদি উন্নত ধরনের পশুপক্ষী এবং মানবশিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পণ্ডিতগণ শিখন (learning) সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব (theory) রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঠেকে শেখা

পশুপক্ষী তো দূরের কথা মানুষই অনেক সময় ঠেকে শেখে। যখন কোন জটিল সমস্যা আমাদের সামনে এসে হাজির হয় তখন আমরা তার সমাধানের জন্য অন্ধের মতো আচরণ করে থাকি। এই ধরনের আচরণকে "নির্বোধের আচরণ" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একটা চেষ্টা ব্যর্থ হলে আর একটা নতুন উপায় অবলম্বন করে সমাধানের জন্য নতুন করে চেষ্টা করি। দৈবাৎ কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ঠেকে শেখার উদাহরণ মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। একটি ক্ষুধার্ত বেড়ালকে খাঁচার ভেতর আটকে বাইরে খাবার রাখলে খাবারের কাছে আসবার জন্য সে ছটফট করতে শুরু করবে। বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাবার আশায় অন্ধের মতো খাঁচাটার বিভিন্ন অংশে সে আক্রমণ চালাবে। দাঁত দিয়ে এটা কামড়াবে, নখ দিয়ে ওটাকে বিদীর্ণ করতে চাইবে। এইভাবে পণ্ডশ্রম করতে করতে অকস্মাৎ যদি খাঁচার খিলটা খুলে যায় তাহলে মুহূর্ত মধ্যে খাবারের কাছে ছুটে গিয়ে বেড়ালটা তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে আনন্দ লাভ করবে। পুনরায় যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে খাঁচায় ভরা যায় তাহলে ক্রমান্বয়ে পণ্ডশ্রমের পরিমাণ এবং খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দুটোই হ্রাস পেতে পেতে এমন একটা সময় আসবে যখন খাঁচায় ভরা মাত্রই বেড়ালটা বেরিয়ে আসতে পারবে, অর্থাৎ বেরিয়ে আসবার কৌশলটা সে শিখে ফেলবে। যতই সময় অতিবাহিত হবে ততই সে বেদরকারী আচরণগুলো পরিত্যাগ করে দরকারী আচরণগুলোকে আয়ত্ত করতে শিখবে এবং অনাবশ্যক শ্রম ত্যাগ করে শুধু আবশ্যক মত শক্তি ব্যয় করতে নিপুণ হয়ে উঠবে।

পণ্ডিতপ্রবর থর্নডাইক (Thorndike) মনে করেন, ঠেকে শেখার প্রণালীটা প্রধানতঃ দুটি সূত্র অনুসরণ করে চলে। প্রথম সূত্রটির নাম অনুশীলন সূত্র, দ্বিতীয়টির নাম পরিণতি সূত্র। অনুশীলন সূত্র অনুসারে, যে কাজটি যত বেশী করা হয় সেটি ততো বেশী সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং যে কাজটি সম্প্রতি করা হয়েছে, সেটি আগে করা কাজের তুলনায় বেশী সহজে এবং বেশী নিখুঁতভাবে করা সম্ভব। অনুশীলন-সূত্রের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোন একটা নূতন কাজ শিখতে হলে বার বার সেটা সম্পাদন করা এবং মাঝে মাঝে তার অনুশীলন করার দরকার কথাটা সত্যি হলেও সকল ক্ষেত্রেই এটা সত্যি নয়। যেমন, বেড়াল নিয়ে যে পরীক্ষার কথা আগে বলা হলো তাতে দেখা গেছে সে যতবার খাঁচার খিল খুলেছে তার চাইতে অনেক বেশীবার অনেক ভুল আচরণ করেছে; কিন্তু বার বার করা সত্ত্বেও এই ভুল আচরণগুলো ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রথম

সূত্রটির এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেই থর্নডাইক দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করেন। পরিণতি সূত্র অনুযায়ী, যে কাজের পরিণতি সন্তোষজনক সেটি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, আর যে কাজের পরিণতি হতাশাব্যঞ্জক সে কাজটি করার প্রবণতা হ্রাস পায়। এই কারণে বারবার করা সত্ত্বেও ভুল আচরণগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি; পক্ষান্তরে, সার্থক আচরণগুলি অল্প কয়েকবার করা হলেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পরিণতি-সূত্রটিও যে বহুক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শাস্তির ভয়ে আমরা অনেক কাজ করা থেকে বিরত হই; পুরস্কারের লোভে অনেক কাজ শিক্ষা করার প্রেরণা লাভ করি। প্রশংসা ভালোবাসা স্বীকৃতি উৎসাহ শিশুকে শিখতে প্রেরণা জোগায়। পক্ষান্তরে, শাস্তি তিরস্কার রূঢ় ব্যবহার ঠাট্টা বিদ্রূপ শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে ভয় ও ঘৃণার বস্তু করে তোলে।

দেখে শেখা

শিক্ষালাভের দ্বিতীয় প্রণালীটার নাম দেখে শেখা, অর্থাৎ অন্যকে অনুকরণ করে কোন কিছু শিক্ষালাভ করা। মানুষ এবং অধিকাংশ জীবজন্তুই এই প্রণালীতেই অনেক কিছু শিখে থাকে। পশুপাখীর শাবকেরা তাদের বাবা-মাকে অনুকরণ করে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং খাবার জোগাড় করতে শেখে। মানব-শিশু বয়স্কদের অনুকরণ করে চলতে, কথা বলতে, আত্মসংবরণ করতে এবং আরও অনেক কিছু করতে বা না করতে শেখে। এর ফলে শিক্ষার্থীর বহু শক্তি অযথা ব্যয়িত না হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সব কিছু শিখতে হলে অনেক শক্তি, দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর চেষ্টার প্রয়োজন হতো। তা ছাড়া সফলতা লাভ করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারতো। সেক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া স্বতন্ত্র প্রাণীমাত্রেরই পক্ষে প্রায় অসম্ভব হতো এবং ধরাপৃষ্ঠ হতে ধীরে ধীরে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাই প্রকৃতি প্রায় সকল প্রাণীর মধ্যেই অনুকরণস্পৃহাটিকে স্বভাবগত করে দিয়েছেন।

প্রতিবন্ধ শিক্ষা

তৃতীয় শিক্ষাপ্রণালীর নাম প্রতিবন্ধ শিক্ষা। রুশীয় বৈজ্ঞানিক পাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) এই প্রণালীটির আবিষ্কর্তা। আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক ওয়াট্‌সন (Watson) মানবশিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রণালীটির প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। খাবার সংস্পর্শে এলে জিভ থেকে লালা ঝরে। এই প্রতি-ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই চেষ্টা করে এই আচরণটি শিখতে হয় না। কিন্তু পাভ্‌লভ্‌ তাঁর পরীক্ষাগারে লক্ষ্য করলেন যে, একটি কুকুরের মুখে খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা তার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যদি ঘণ্টাধ্বনি করা যায় তাহলে বেশ কয়েকবার এই রকম ঘটবার পর শুধু ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরের জিভ থেকে লালা ঝরবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লালা ক্ষরণের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনির বিন্দু-বিসর্গও সম্বন্ধ নেই, কিন্তু বার বার খাদ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ঘণ্টাধ্বনিটাই খাদ্যবস্তুর মতো কাজ করতে সুরু করে দিয়েছে। ওয়াট্‌সন লক্ষ্য করেছেন জোর শব্দকে শিশুরা ভয় পায়। শিশু প্রথমে খরগোসকে ভয় করতে জানে না। কিন্তু সে খরগোসটাকে ধরতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি খুব জোর শব্দ করা হয় তাহলে দেখা যাবে ক্রমে ক্রমে সে এই নিরীহ প্রাণীটাকেই ভয় করতে শিখেছে। ওয়াট্‌সন মনে করেন আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা এই ভাবেই ঘটে থাকে। সুতরাং শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে কাজটাকে মজার করতে হবে। যে শিশুটিকে নির্দিষ্ট সময়ে শয্যা গ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাকে যদি সেই সময় বিছানায় শুইয়ে রোজ একটি করে সুন্দর গল্প অথবা মিষ্টি গান শোনানো হয় তাহলে উৎসাহিত হয়ে সে প্রতিদিনই সেই সময়ে শুতে যাবে। তারপর দেখা যাবে গল্প অথবা গান না শোনালেও নির্দিষ্ট সময়ে তার চোখদুটি ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। যে কোন অভ্যাস তৈরী করতে হলেই তার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে হবে। কাজটি করার সময় দুঃখ বা পীড়াজনক কোন রকম অভিজ্ঞতা যাতে না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই শিক্ষা-প্রণালীটির সঙ্গে পরিণতি-সূত্রের মিল যথেষ্ট। গান শিশুকে আনন্দ দেয়। সঙ্গীতের সঙ্গে শয়নকে যদি যুক্ত করা হয় তাহলে শয়নে শিশুর আনন্দ হবে, আর শয়নের পরিণতি আনন্দ—একই কথা, শুধু বলার ভঙ্গিটাই আলাদা।

অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষা

টেনেরিফ্‌ দ্বীপের গভীর অরণ্যপ্রদেশে একটি পরীক্ষাগার নির্মাণ করে কোলার (Kohler) শিম্পাঞ্জীদের শিক্ষা বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা করে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য অনুরূপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তিনি মনে করেন এই সব প্রাণীর বুদ্ধিশক্তি প্রখর এবং মানুষেরই মতো তারা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সমস্যার সমাধান করে থাকে। তাঁর বহু-বিচিত্র পরীক্ষার মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করছি।

প্রথম পরীক্ষা ঃ একটা বিরাট খাঁচা। শিম্পাঞ্জীর হাতের নাগালে অনেক উঁচুতে ছাদ। ছাদের তলা থেকে কতকগুলো কলা ঝুলছে। খাঁচার ভেতর একটা টুল। টুলটা এমন উঁচু যে শিম্পাঞ্জী তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে তবেই কলার নাগাল পাবে। প্রথমে দেখা গেল প্রাণীটা বেশ কয়েকবার লাফালাফি করে ফলগুলো পাড়বার চেষ্টা করলো, অবশেষে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে খাঁচাটার এককোণায় গিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে টুলটাকে ফলগুলোর ঠিক তলায় এনে রাখলো এবং তার ওপরে উঠে ফলগুলো পেড়ে নিয়ে খাঁচাটার একপাশে বসে নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে সুরু করলো।

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ খাঁচার বাইরে অনেক দূরে এক গুচ্ছ ফল। ভেতরে দুটো লাঠি (একটা ফাঁপা), কিন্তু সেগুলো এমনই ছোটো যে কোন একটার সাহায্যে গোটা হাতটা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিলেও তার পক্ষে ফলের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সে যদি দুটো লাঠি এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে বাইরে হাত বাড়ায় তাহলে অনায়াসেই ফলের গুচ্ছটাকে খাঁচার কাছে টেনে আনতে পারবে। পরীক্ষার সময় দেখা গেলো শিম্পাঞ্জীটা প্রথমে একটা লাঠি নিয়ে তাই দিয়ে ফলগুলোকে খাঁচার কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করলো। অনেক চেষ্টা করেও যখন বিফল হলো তখন একপাশে বসে লাঠিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। হঠাৎ নিরেট লাঠিটা ফাঁপা লাঠির ভেতর ঢুকে যাবার ফলে একটা বড়ো লাঠি তৈরী হলো দেখে তাই দিয়ে সে ফলগুলোকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে টেনে আনলো।

তৃতীয় পরীক্ষা ঃ খাঁচার বাইরে ফল, অথচ নাগালের বাইরে। ভেতরে কোন লাঠি নেই, শুধু খাঁচার মধ্যে আর একটা কুঠুরীতে শিম্পাঞ্জীর শয্যা-সামগ্রী রয়েছে। এই পরীক্ষা যখন করা হয় তার আগে অবশ্যই প্রাণীটা লাঠির ব্যবহার করতে শিখেছে। শিম্পাঞ্জীটা প্রথমে অনেক অযথা পরিশ্রম করলো। শেষে শুধু হাতে নাগাল না পেয়ে তার শয়নকক্ষ হতে একটা কম্বল নিয়ে এসে তাই দিয়ে ফলগুলোকে খাঁচার পাশে টেনে আনলো।

কোলার এইরকম আরও অনেক পরীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিম্পাঞ্জীগুলি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান করেছে। প্রথমে টুলের সঙ্গে ফলের, একটা লাঠির সঙ্গে আর একটা লাঠির, তাদের সঙ্গে ফলের এবং লাঠির সঙ্গে কম্বলের, আর কম্বলের সঙ্গে ফলের কী সম্বন্ধ তা তারা বুঝতে পারেনি। তাই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রচুর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু অকস্মাৎ অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাবে তাদের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠায় পরিস্থিতির রূপটাই গেছে বদলে। যে লাঠিটা আগে অর্থহীন ছিলো তাই হয়ে উঠেছে অর্থময়, যে টুলটা ছিলো অনাবশ্যক সেটাই অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। আপত্তি উঠতে পারে প্রাণীগুলি যদি বুদ্ধিমানই হবে তবে গোড়াতেই পরিস্থিতির প্রকৃত তাৎপর্যটা তারা বুঝতে পারলো না কেন? এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু অবান্তর। কারণ মানুষ যে বুদ্ধিমান প্রাণী তাতে তো কারও সন্দেহ নেই। অথচ সম্পূর্ণ নূতন একটি পরিস্থিতিতে পড়লে এই অতি বুদ্ধিমান প্রাণীটিও নির্বোধের মতই আচরণ করতে বাধ্য হয়, অন্য প্রাণীর কথা তো দূরের কথা। বিজ্ঞানাচার্য আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক, কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তারও উদ্ভাস ঘটেছিলো নিতান্তই আকস্মিক ভাবে। সূত্র আবিষ্কারের আগে অনেকবারই আর্কিমিডিস্ চৌবাচ্চায় স্নান করেছিলেন, গ্যালিলিও অনেক সামগ্রীকেই দুলতে দেখেছিলেন, নিউটন অনেক কিছুকেই শূন্য হতে মাটিতে পড়তে দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁদের কাছে এই সব ব্যাপার ছিলো অর্থহীন; অনেক পরে অতি অকস্মাৎ ভাবেই তাদের অর্থ তাঁদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

প্রধান প্রধান শিক্ষা-প্রণালীগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলুম। যদিও একদল পণ্ডিত নিজেদের আবিষ্কৃত প্রণালীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অপরাপর প্রণালীগুলির প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন, তবু যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন এইসব সমালোচনা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। নিজের মতটিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে একজন আর একজনের মতবাদকে বিকৃত করেছেন অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আপন মতবাদের প্রতিকূল ঘটনাবলীকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। এইসব বাদানুবাদের মধ্যে যাবার দরকার নেই। আমরা শুধু একথাই বলতে চাই যে, সকল রকম শিক্ষাকেই যে কোন একটা তত্ত্বের সাহায্যে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না, সুতরাং কোন তত্ত্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অবশ্যই যে প্রাণী যতো বেশী বুদ্ধিমান

তার শিক্ষায় বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ততো বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে অন্য তত্ত্বগুলি তার ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না একথা কিছুতেই বলা চলে না। অতএব এই চারটি প্রধান তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুকে কোন কিছু শেখাবার আগে লক্ষ্য করতে হবে তার দেহমন সেই বিশেষ কাজটি করবার উপযোগী কি না। মলাশয় ও মূত্রাশয়কে যেসব স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের যথারীতি পুষ্টি সাধনের আগেই যদি শিশুকে মলমূত্র নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে এই শিক্ষা লাভ করতে সে কিছুতেই সফল হবে না এবং নতুন কিছু আয়ত্ত করার আগ্রহও তার কমে যাবে। তেমনি দু-তিন বছরের শিশুকে যদি অনেকক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সে কখনোই তা পারবে না; তার কারণ তার দেহের মধ্যে অহরহ যে সব পরিবর্তন ঘটছে সেগুলি স্বভাবতঃই তাকে চঞ্চল করে রাখে, চুপ করে তাকে বসে থাকতে দেয় না। আবার যে শিশুর অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার মতো দেহ এবং মনের বিকাশ ঘটেছে তাকে যদি ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়া হয়, তাহলে তারও ওপর অত্যাচার করা হবে। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

যে কোন কাজ ঠিকমত শিক্ষা করতে হলে বার বার সেটি করা দরকার। কিন্তু কাজটি যদি আনন্দের না হয়ে কষ্টের হয় তা হলে শিশু তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইবে না। অতএব কাজটিকে মজার করে তুলতে হবে। যে শিশুকে নিজের হাতে খাবার খেতে শেখানো হচ্ছে তাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। সে যদি হাত দিয়ে চামচে বাটি গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করবার সুযোগ পায় তাহলে নিজের কৃতিত্বে সে আনন্দ ও গর্ব বোধ করবে। তার স্বাধীনভাবে চলার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং অতি সহজেই কাজটা সে শিখে ফেলবে। কোন একটি বিশেষ কাজ বার বার করার জন্য শিশুকে যদি খুব বেশী পীড়াপীড়ি করা হয়, অথবা তার ব্যর্থতার রূঢ় সমালোচনা করা হয় (যেমন "তুমি কি গ্লাসটা এইভাবে ধরতে পারো না, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না দেখছি", ইত্যাদি) তাহলে কাজটির প্রতি শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মাবে। তার কাজ করার সকল আগ্রহ উবে যাবে। অতএব এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ে বড়োদের যথেষ্ট সাবধান হওয়া দরকার। কাজটি যাতে শিশুর পক্ষে সহজসাধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে শিশুটিকে জামা কাপড় পরার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার জামা কাপড়গুলো যদি খুব হাল্কা হয় এবং সেগুলি পরিধান করা যদি সহজ হয় তাহলে অনায়াসেই কাজটা সে করতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কী করে অল্প সময়ে ও স্বল্পশ্রমে কোন বিষয় মুখস্থ করা যায় এবং দীর্ঘকাল সে বিষয়টা সার্থকভাবে মনে রাখা যায় সে সম্বন্ধে যে সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ এই প্রসঙ্গটিও শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। কোন কবিতা যদি মুখস্থ করতে হয়, আর সেটা যদি খুব দীর্ঘ না হয়, তাহলে টুকরো টুকরো করে মুখস্থ না করে গোটা কবিতাটাই বার বার পড়তে হবে। যথাযথ ছন্দ সহকারে কবিতাটি পড়তে হবে। যে বিষয়টা মুখস্ত করতে হবে, সেটা মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত এক নাগাড়ে না পড়ে কিছুক্ষণ পড়বার পর বিরতি দিতে হবে, তারপর আবার পড়তে হবে। বিষয়টির মধ্যে বর্ণিত বস্তু বা ঘটনাগুলিকে মনে মনে কল্পনা করতে হবে। বিষয়টি মুখস্থ হয়ে যাবার পরও সেটি আরো বেশ কয়েকবার পড়তে হবে যাতে শেখাটা পাকাপোক্ত হয়। একটা জিনিস মুখস্থ করবার অব্যবহিত পরেই অনুরূপ অন্য কোন জিনিস—যেমন একটা কবিতা মুখস্থ করবার অব্যবহিত পরেই অন্য একটা কবিতা মুখস্থ করবার চেষ্টা না করাই ভালো। করলে আগের মুখস্থ করা কবিতাটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী। যথেষ্ট আগ্রহ, মনোযোগ ও উৎসাহের সঙ্গে বিষয়টি শিক্ষা করতে পারলে শেখাটা যেমন ত্বরান্বিত হবে তেমনি স্থায়ী হবে। লেখাপড়ার ব্যাপারে গোড়া থেকেই শিশুকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন সে তোতাপাখীর মতো কোন বিষয় মুখস্থ না করে বুঝে সুজে পড়ে; বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা যেন অনুধাবন করতে শেখে।

তোতাপাখীর মতো না বুঝে মুখস্থ করার মধ্যে কোন আনন্দ নেই, সেটা চিনির বলদের মতোই কিছু খবরের বোঝাকে কিছু কালের জন্য বয়ে বেড়ানোর সামিল। কিন্তু বুঝে পড়ার মধ্যে আনন্দ আছে, রস আছে। তাই যে সব ছেলে-মেয়ে না বুঝে পড়া মুখস্থ করে তাদের কাছে লেখাপড়াটা একটা আনন্দহীন বিড়ম্বনা মাত্র। তারা নিজেরাই যে শুধু লেখাপড়ার প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে তা-ই নয়, নানা রকম বিশৃংখলার সৃষ্টি করে বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশটাকেই জ্ঞানচর্চার পক্ষে প্রতিকূল করে তোলে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাঠ্য বিষয় বুঝতে পারে সে দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে, নিছক মুখস্থ করার (cramming) ওপর জোর না দিয়ে জোর দিতে হবে বুঝে পড়ার (comprehension) ওপর। মুখস্থ করার দরকার যে একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু না বুঝে মুখস্থ করলে বেশী দিন সেটা মনেও থাকে না, কার্যকরও হয় না; পক্ষান্তরে বুঝে পড়লে সহজেই তা মুখস্থ হয়, দীর্ঘকাল মনে থাকে এবং যথা সময়ে সেটি মনে পড়ে। এইভাবে বিষয়বস্তুটি

আয়ত্ত করতে পারলে নিজের ভাষায় নিজের মতো করে সেটি প্রকাশ করাও সম্ভব হয়, অন্ধের মতো বই-এর ভাষার ওপর নির্ভর করতে হয় না।

ছেলেমেয়েরা যাতে বিষয়বস্তু বুঝতে পারে সেজন্য অনেক কিছু করার আছে। সহজ ভাষায় বিষয়বস্তুটি আলোচনা করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযুক্ত পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করতে হবে। কেউ বুঝতে না পারলে তিরস্কার না করে ধৈর্যের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে আবার বোঝাতে হবে। শ্রেণীকক্ষে এবং পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর দিতে হলে বিষয়বস্তুটি রীতিমত বুঝতে হয়, অন্ধের মতো মুখস্থ করে যার উত্তর দেওয়া যায় না। মৌল ধারণাগুলি (Basic concepts) ঠিকমত বুঝতে না পারলে জটিল ধারণাগুলি কখনোই বোঝা সম্ভব নয়। কোন একটি বিষয় বুঝতে হলে যে প্রাথমিক জ্ঞানের দরকার যতক্ষণ সেই জ্ঞান অর্জিত না হচ্ছে ততক্ষণ বিষয়টি কিছুতেই বোঝা যাবে না। জটিল প্রক্রিয়ার প্রয়োগ জানতে হলে সরল প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োগ আগে জানতেই হবে। সুতরাং বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যখন একটি শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয় ধরতে পারছে না তখন বুঝতে হবে প্রাথমিক বিষয়েই তার ব্যুৎপত্তি হয়নি। তাই প্রাথমিক বিষয়গুলিই তাকে আগে বোঝাতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে আহ্বান করবেন। তাঁর পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীরাই পাঠ্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। এক একজন শিক্ষার্থী এক একদিন শিক্ষকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার কথা চিন্তা করলে একজন শিক্ষকের পক্ষে সমস্ত ছাত্রের দিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেবার কথা বলা চলে না। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পরস্পরের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষক বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য নিজেই যে শুধু উপযুক্ত উদাহরণের উল্লেখ করবেন তা-ই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরও নিজস্ব উদাহরণ দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন। অনেক সময় আমরা শিক্ষকেরা নিজে যা বলি বা বই-এ যেটুকু বলা হয়েছে উত্তরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে মাত্র সেই-টুকুই প্রত্যাশা করি, ওরা যদি নতুন কিছু বলে তাহলে সেটা তলিয়ে না দেখেই বাতিল করে দিই। আমাদের এই মনোভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে—ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বিচার করতে হবে উদারভাবে, তাহলেই তাদের মধ্যে বিষয়বস্তু বুঝবার এবং সে সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা করবার আগ্রহ জন্মাবে। মোটের ওপর পাঠ্য বিষয় না বুঝতে পারলে পড়াশুনোয় আগ্রহ কখনোই আসতে

পারে না। সুতরাং শিক্ষকের প্রধান কাজই হলো বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করা। কীভাবে তা করা যায় সে সম্পর্কে দু-চারটি কথা মাত্র এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করেছি, নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু করবার আছে, দরদী শিক্ষক আরো অনেক পন্থা নিজেই উদ্ভাবন করে নেবেন তাঁর সন্তান প্রতীম ছাত্রছাত্রীদের তথা সমগ্র জাতির প্রকৃত কল্যাণের কথা চিন্তা করে। আদেশ অপেক্ষা উপরোধ এবং উপদেশ শিশুকে কিছু শেখাবার জন্য অনেক বেশী উপযোগী। ভয় দেখিয়ে বা শাস্তি দিয়ে তাকে কিছু শেখানো যায় না। তার ভুলের জন্য তাকে তিরস্কার না করে ভাল করার জন্য তাকে প্রশংসা করায় বেশী কাজ হয়, অর্থাৎ তার ত্রুটিটাকে বড়ো করে না দেখে কৃতিত্বটাকে বড়ো করে দেখলে ফল হয় বেশী।

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সুষ্ঠু বিকাশ। শিশুর মধ্যে যে সব সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার, বিকশিত করে তোলার নামই শিক্ষা। শিশুর সুপ্রবৃত্তিগুলিকে সম্যক্‌রূপে জাগিয়ে তোলা এবং তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে সুপথে চালিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই মহান উদ্দেশ্যটি সফল করার কাজটা কিন্তু একেবারেই সহজ নয়। তার জন্য প্রতিটি একক শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রেরণাগুলিকে যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করা দরকার। অনেক উন্নত দেশে নার্সারীর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি শিশুর কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ লক্ষ্য করে থাকেন। যে শিশুর মধ্যে যে রকম প্রবণতা আছে, অনুকূল পরিবেশ রচনা করে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। যার ছবি আঁকার ঝোঁক আছে তাকে ছবি আঁকাবার সুযোগ করে দেন। যার খেলার ঘরবাড়ী তৈরী করার সখ তাকে নানা-বিধ সরঞ্জাম দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী করতে উৎসাহিত করেন। যে শিশুটি রীতিমত অসামাজিক ও নিঃসঙ্গ তাকে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশবার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিহাসে যার আগ্রহ নেই, গল্পচ্ছলে ইতিহাসের কাহিনী পরিবেশন করে ধীরে ধীরে তাকে বিষয়টির প্রতি অনুরাগী করে তোলেন। মোটের ওপর শিশুর প্রেরণা প্রবণতা ও প্রবৃত্তিগুলিকে তাঁরা বাঞ্ছিত পথে বিকশিত করেন। তাঁদের এই মহান কাজে তাঁদের সাহায্য করেন শিশুর মা-বাবা। একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে বিশেষ একটি শিশুকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যেমন কঠিন শিশুটির মাতাপিতার পক্ষে কাজটা তেমন কঠিন নয়। তার কারণ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে একাধিক শিশুর ওপর দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া তাঁরা কোন একটি বিশেষ শিশুকে সব সময়ই নিজেদের কাছে পান না এবং মাতাপিতার সান্নিধ্য থেকে তাকে

বেশীক্ষণ বিচ্ছিন্ন করে রাখাটাও ঠিক নয়। তাই শিশুটির সম্বন্ধে তাঁরা যা জানতে পারেন না, তার মাতাপিতা তাঁদের সেই সব কথা জানিয়ে দেন। এজন্য মাতাপিতারও উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বিভিন্ন উন্নত দেশে যে সব 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক্স' বা 'চাইল্ড গাইডেন্স সেণ্টার্স' আছে সেগুলি মা-বাবাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিশু-পর্যবেক্ষণ বিষয়ে তালিম দিয়ে থাকে। আপন আপন শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেই কিন্তু মাতাপিতার দায়িত্ব শেষ হয় না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও মনস্তাত্ত্বিকের পরামর্শ মতো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন করতে হয়; অনেক কু-অভ্যাস বর্জন করতে হয় এবং গৃহে শিশুর সুস্থ বিকাশের উপযোগী একটি পরিবেশ রচনা করতে হয়। তাঁরাও সন্তানের মঙ্গলের জন্য সাগ্রহে এই সব কাজ করে থাকেন। তাঁদের এই মহান কাজে সরকার এবং জনপ্রতিষ্ঠানগুলিও নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। শিক্ষালয়ে খেলাধুলোর নানা রকম সরঞ্জাম থাকে। কোন কোন স্কুলে খেলা করার জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বা বাগান আছে। নানারকম জন্তু-জানোয়ারের ছোট খাটো চিড়িয়াখানাও আছে। শিক্ষা দানের রীতিটা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। সরকার এবং জনপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক শিক্ষার শেষে অনেক শিশুকেই জলপানি দিয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। শিশু-শিক্ষণ বা সংশোধন কেন্দ্রে শিশুদের পরীক্ষা ও পরিচালনা করার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার পর দক্ষতা আগ্রহ দৈহিক স্বাস্থ্য সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যাকে যে শিক্ষার উপযোগী মনে করা হয়, তাকে সেই মত শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়। সরকারী কেন্দ্রে জনপ্রতিষ্ঠানে, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে, বিদ্যালয়ে এবং কলেজে কোন্ কোন্ ছেলে-মেয়ের কী কী বিষয়ে বা কাজে পারদর্শিতা লাভ করার সম্ভাবনা আছে, সেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিরূপণ করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য নার্সারী স্কুলের রিপোর্ট এবং মা-বাবার কাছ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন খবরাখবরের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুর আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগ যেমন তাকে দেওয়া হয়, তেমনি ছোট বেলা থেকেই তার মধ্যে শৃঙ্খলাপ্রীতি উদ্ভাবনীশক্তি স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মনোভাব চিন্তাশীলতা সামাজিকতা প্রভৃতি সদ্গুণের উন্মেষ করবার চেষ্টাও চলতে থাকে। কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করতে হয়। অবসর সময়ে কাজের কথা ভুলে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। অপরের কাজে বাধা দেবার রীতি নেই। ঝগড়া করতে নেই। বিদ্রূপ করা নীতিবিরুদ্ধ। শৈশব থেকেই এই সব দেশের ছেলেমেয়েরা এই রকম শৃঙ্খলা শিক্ষা করে। তাই যখন তারা বড়ো হয় তখন শৃঙ্খলা-প্রীতি তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। সেখানে পদে পদে শৃঙ্খলা, কিন্তু তা পদে পদে শৃঙ্খল হয়ে বাজে না। কেউ কারো কাজে

বাধা দেয় না, তাই সকলেরই গতিবিধি সহজ ও সাবলীল। শংকা নেই, সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। এই সব দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষাদানের ধারাটা স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অর্থপুস্তকেরই ওপর বেশী নির্ভর করে। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী আশা করে শিক্ষক তাদের জ্ঞাতব্য যা কিছু আছে সবই বলে দেবেন। অর্থাৎ শিক্ষক ক্লাশে যা বলবেন তার অতিরিক্ত কিছুই যেন জানবার নেই, অথবা থাকলেও সেটা জানা নিষ্প্রয়োজন। উন্নত দেশের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন যে, পড়াশুনাটা তাদের নিজেদেরই কাজ। যেখানটা তারা বুঝতে পারবে না, শুধু সেইটা বুঝতে সাহায্য করাই তাঁর কাজ। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পুস্তক রীতিমত মন দিয়ে পড়তে হয়। তা না হলে গুরুমশাই এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর দেওয়া সহজ নয় এবং উত্তর দিতে না পারলে ফাঁকি ধরা পড়ে গিয়ে ছাত্রকে ভীষণ লজ্জায় পড়তে হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েরা অর্থাভাববশতঃ পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারে না। প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পাওয়া যায় এমন পাঠাগারও এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যে দু-চারটে পাঠাগার আছে সেগুলোও আবার অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগেনা। বই সব সময় বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না, কিন্তু বসে পড়ারও যথারীতি ব্যবস্থা নেই। উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর পাঠাগার আছে এবং প্রত্যেকটিই চমৎকার। একজন ছাত্র অনায়াসে অনেকগুলি পাঠাগারের সদস্য হতে পারে। চাইলেই বই পায়। বসে পড়ার ব্যবস্থাও মনোরম। পাঠাগারগুলি তাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উপযুক্ত শৃংখলাবোধ ও নীতিশিক্ষার গুণে বাজে নাম ঠিকানা দিয়ে (তার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও) কেউ বই চুরি করে নেয় না। যথাসময়ে বই ফেরৎ দেয়। বইটি যখন কারো কাছে থাকে, তখন সে তার পুরোপুরি যত্ন করে। দরকারী পাতা বা ছবি ছিঁড়ে রাখে না। পাঠাগারে কেউ কোনরকম সাড়াশব্দ করে অন্যের বা নিজের পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। নিজের স্বার্থের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখে, তেমনি দৃষ্টি রাখে অন্যের স্বার্থের দিকেও। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্র সকলেই মিলিত হয়ে মাঝে মাঝে এক একটা বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করেন। এর ফলে বিষয়টা পরিষ্কার ও সহজ হয়ে যায় এবং নতুন নতুন পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। এমনি করে ছেলেমেয়েরা চিন্তাশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রচুর প্রতিভা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থাভাবে তারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে না। অর্থের জন্য

হয় তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় কিংবা অন্যের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। এর ফলে তাদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ হয়ে অনেক সময়ই তারা অস্বাভাবিক, পরনির্ভরশীল এবং বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কেউ কেউ নির্জীব হয়ে পড়ে, কেউ বা আবার দুরন্ত প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সময়াভাবে অনেকে যথারীতি লেখাপড়া করতে পারে না। ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল দেখে অনেকে লেখাপড়ায় উৎসাহ পায় না। অনেক সময় মাতাপিতার ইচ্ছায়, অথবা ভবিষ্যতে ভালো চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে ভেবে এমন বিষয় পড়তে বাধ্য হয়, যাতে তাদের আন্তরিক আগ্রহ অথবা যোগ্যতা কোনটাই নেই। তার ফলে তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না, অনেক অবাঞ্ছিত পথে তাদের কৌতূহল ধাবিত হয়, ক্লাশে তারা নানা রকম গোলমালের সৃষ্টি করে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। পড়ানোর ধরন ধারনটাও তেমনি। পরীক্ষায় এমন সব প্রশ্ন আসে যার উত্তর অর্থপুস্তক পড়েই দেওয়া চলে। সুতরাং তারা পাঠ্যপুস্তক পড়ার উৎসাহ পায় না। অনেক সময় অর্থপুস্তকের ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাদান করা হয়। তার কারণ শিক্ষককে একই দিনে অনেকগুলি বিষয় পড়াতে হয়, অনেক বেশী ক্লাশ নিতে হয়, অর্থ-পুস্তকাতিরিক্ত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখেন, তাতে ছাত্রদের আগ্রহ নেই, কারণ সেটা বুঝতে হলে আগে যা যা শেখা দরকার সেগুলো তারা শেখেনি, নতুন করে শেখাবার সুযোগও তাঁর নেই। সুতরাং তিনিও সে চেষ্টা অবিলম্বে ত্যাগ করেন। তাছাড়া শিক্ষকের নিজস্ব অনেক সমস্যা তো আছেই।

একদিনেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো দূর করা যাবে না। সেটা করতে হবে ধীরে ধীরে এবং পাঠশালা থেকে সুরু করে। পাঠশালা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধন না করে, ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তা এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষা না দিয়েই যদি উচ্চতর পরীক্ষায় প্রশ্নাবলী এমন করা যায়, যার উত্তর কেবলমাত্র অর্থ পুস্তক পড়ে অথবা অধ্যাপকের বক্তৃতার উপর নির্ভর করে দেওয়া যাবে না, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা যে বিভ্রান্ত হবে তাতে আর বিস্মিত হবার কী আছে। তাই পাঠশালা থেকেই শিক্ষাসংস্কার সুরু করতে হবে। শৈশবশিক্ষা ত্রুটিযুক্ত হলে সমস্ত শিক্ষাব্যাপারটাই দুর্বল হতে বাধ্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু সংস্কার ও যথার্থ উন্নতি নির্ভর করছে কোন একটি ব্যক্তি বা সংস্থার ওপর নয়, সমগ্র সমাজের ওপর, প্রত্যেকটি ব্যক্তির ওপর। আমরা যদি আমাদের দেশকে ভালবাসি, আমাদের শিশুদের ভালবাসি, তাহলে সকল শুভ প্রয়াসই আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সার্থক হয়ে উঠবেই।

জড়বুদ্ধি শিশু

মানুষের মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো বুদ্ধিরও তারতম্য দেখা যায়। সব মানুষের বুদ্ধি সমান না হলেও অধিকাংশ মানুষই কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থাৎ বেশীরভাগ মানুষই বুদ্ধির দিক দিয়ে প্রায় সমান, পরস্পরের খুবই কাছাকাছি। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক হলেও প্রতিভাবান মানুষ যেমন আছেন তেমনি কমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও দেখা মেলে। এদের জড়বুদ্ধি (feebleminded) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেদিন থেকে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে সেদিন থেকেই জড়বুদ্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত উন্মাদ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের এক করে দেখা হতো। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করলেন জড়বুদ্ধিরা উন্মাদ নয়, তাদের বুদ্ধি কম। বুদ্ধির ঘাটতি থাকায় তাদের মানসিক বৃত্তিগুলো ঠিক ঠিক কাজ করতে পারে না।

প্রাচীনকালে জড়বুদ্ধি এবং উন্মাদ ব্যক্তিদের ওপর নির্মম অত্যাচার করা হতো। যীশুখৃষ্ট যখন পৃথিবীকে প্রেমের বাণী শোনালেন তখন থেকেই এই হতভাগ্য মানুষগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করলো। গীর্জার পাদ্রীরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তৈরী করলেন। কিন্তু শীঘ্রই এদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব আবার বিরূপ হয়ে উঠলো। খৃষ্টধর্মের মধ্যে দুটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হলো। Roman Catholic বা রক্ষণশীলেরা প্রাচীন ধর্মমত এবং আচার আচরণ ও সংস্কারকে নির্বিচারে মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু Protestant বা বিদ্রোহীদল প্রাচীন আচার আচরণ ও সংস্কারের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এঁরা ঘোষণা করলেন প্রত্যেক মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী হতে হবে। কেউ মন্দ কাজ করলে শাস্তি পাবে, ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত হবে। উন্মাদ এবং জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে ফেলতো। Protestant দের প্ররোচনায় তাই এদের অবাঞ্ছিত কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো। এদের ওপর ঐ সময় এমনি পীড়ন শুরু হলো যে ঐতিহাসিকেরা সে সময়টাকে 'বেত্র ও শৃংখলের যুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন। এই যুগের অবসান ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময় জড়বুদ্ধি এবং উন্মাদদের মধ্যে বিভেদ আবিষ্কৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় এদের প্রতি মানুষের মনোভাবের আবার পরিবর্তন ঘটে।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। ফ্রান্সের অন্তর্গত এভিরণ

নামক স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে। কয়েকজন শিকারী একটি বন্য মানবশিশুকে আবিষ্কার করেন। শিশুটি 'এভিরণের বন্য শিশু' নামে অভিহিত। তার হাবভাব দেখে বোঝা গেলো সে জড়বুদ্ধি। এই শিশুটিই প্রথম জড়বুদ্ধি যাকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। প্যারীতে তাকে নিয়ে আসবার পর তার শিক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্কের সূচনা হয়। Pinel প্রমুখ একদল বৈজ্ঞানিক বললেন শিশুটি জড়বুদ্ধি তাই তার পক্ষে কোন রকম শিক্ষালাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু de Condillac-এর দল এই মতের প্রতিবাদ করলেন। তাঁদের ধারণা শিশুটির বুদ্ধিশক্তি স্বাভাবিক মানুষেরই মতো, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তার বিকাশ সম্ভব হয়নি, যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তবে সে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে। Itard সাহেব এই শিশুটির শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। সযত্নে তাকে পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা চালালেন তিনি। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ প্রয়াস ব্যর্থ হলো। তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, শিশুটি প্রকৃতই জড়বুদ্ধি। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন স্বাভাবিক এবং জড়বুদ্ধি মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান তা পূরণ করা কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি সব চেষ্টা ত্যাগ করলেন। Itard কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল ঠিক মতো বুঝতে পারেননি। তাঁর ছাত্র Seguin লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর গুরুর প্রয়াস যথেষ্ট ফলবতী হয়েছে। Itard যখন জড়বুদ্ধি শিশুটিকে শিক্ষাদানে বিরত হলেন তখন Seguin সেই গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। পরিশেষে তিনি কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করতে বাধ্য করলেন যে জড়বুদ্ধিদেরও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এই ঘটনার পর পৃথিবীর নানাস্থানে জড়বুদ্ধিদের শিক্ষাদানের জন্য নানান ধরনের শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হলো। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Witman-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার বোধিপীঠ এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে জড়বুদ্ধিতার প্রধানতম কারণ বংশক্রম (heredity)। Godard সাহেব এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত 'কালিকাক্ পরিবার'—এর বংশ বৃত্তান্ত রীতিমত তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক। ফরাসী বিপ্লবের (French Revolution) সময় পর্যন্ত এই পরিবারের বংশ ইতিহাস অনুসরণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। জনৈক সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে জনৈকা জড়বুদ্ধি রমণীর অবৈধ মিলনের ফলে যে দীর্ঘ বংশের সৃষ্টি হয়েছিল তার অধিকাংশ ব্যক্তিই ছিল জড়বুদ্ধি। পরবর্তী সময়ে উক্ত পুরুষের সঙ্গে জনৈকা তীক্ষ্মবুদ্ধি রমণীর বৈধ মিলনের ফলে যে সকল

বংশধরের উদ্ভব হয় তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রতিভাবান ও খ্যাতিসম্পন্ন। বংশক্রম জড়বুদ্ধিতার প্রধান কারণ হলেও কখনো কখনো দেখা যায় কঠিন শারীরিক পীড়ার পরও বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়। তাছাড়া শারীরতত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন Thyroid প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরস্থ কতকগুলি গ্রন্থির সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক নিবিড়। এই সকল গ্রন্থি হতে ক্ষরিত রস অর্থাৎ হরমোনের পরিমাণ যথেষ্ট না হলে ব্যক্তি জড়বুদ্ধি হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের তুলনায় জড়বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ কম। এজন্য কোন মানুষ জড়বুদ্ধি কিনা জানতে হলে তার বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে। স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিমাপটি জানতে হবে। Alfred Binet সর্বপ্রথম বুদ্ধিমাপ করবার উদ্দেশ্যে একটি অভীক্ষা (Test) প্রস্তুত করেন এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে অভীক্ষাটিকে নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলেন। এর দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন বয়েসের শিশুর বুদ্ধির গড় নির্ণয় করেছেন। কোন একটি শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার বয়েসের গড় বুদ্ধির তুলনা করলে বোঝা যাবে সাধারণ শিশুর চেয়ে সে বেশী কী কম বুদ্ধিমান। Binet-এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বুদ্ধির বিকাশ স্তব্ধ বা ব্যাহত হলে জড়-বুদ্ধিতার উদ্ভব হয়, আর বুদ্ধিশক্তির ক্রিয়া অসম্বদ্ধ হয়ে পড়লে মানুষ উন্মাদ হয়ে পড়ে। Binet-এর পর আরও অনেক মনীষী বুদ্ধি মাপবার বিবিধ উপায় আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মনস্তত্ত্ব গবেষণাগারগুলিতে এই ধরনের অভীক্ষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের তুলনায় জড়বুদ্ধিরা কম বুদ্ধিমান হলেও সকল জড়বুদ্ধির বুদ্ধির পরিমাণ কিন্তু সমান নয়। বিজ্ঞানীরা এইদিক দিয়ে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যাদের বুদ্ধি সবচেয়ে কম তাদের 'নির্বোধ' অথবা 'অত্যল্পবুদ্ধি' (Idiots) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের চেয়ে যাদের বুদ্ধি কিছু বেশী তাদের 'অল্পবুদ্ধি' বা 'কিঞ্চিৎবুদ্ধি' (Imbeciles) নামে অভিহিত করা হয়। জড়বুদ্ধিদের মধ্যে যারা সর্বাধিক বুদ্ধিমান অথচ সাধারণ মানুষের চেয়ে যাদের বুদ্ধি কিছু কম তাদের 'মিতবুদ্ধি' (Morons) বলা হয়।

নির্বোধেরা নিজেদের যত্ন নিতে এবং আত্মরক্ষা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যারা অল্পবুদ্ধি তারা ক্বচিৎ লেখাপড়া শিখতে পারে এবং কিছু কিছু সহজ কাজকর্ম করতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর জড়বুদ্ধিরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে লিখতে পড়তে পারে, সহজ সহজ অঙ্ক কষতে পারে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে নানা রকম দরকারী কাজও করতে পারে, কিন্তু তাদের কাজ স্বাভাবিক মানুষের কাজের মতো হয় না।

জড়বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ বুদ্ধিশক্তির প্রতিহত বিকাশ। স্বাভাবিক মানুষের

তুলনায় এদের বুদ্ধিবিকাশের গতি অত্যন্ত শ্লথ এবং সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া জড়বুদ্ধিগণ অনেক দেরীতে হাঁটতে এবং কথা বলতে শেখে এবং তাদের দৈহিক পুষ্টিও নানানভাবে বিঘ্নিত হয়। এদের দেহে নানারকম অপূর্ণতা বা ত্রুটি থাকে। এরা সহজেই পীড়িত হয়ে পড়ে এবং বেশী দিন বাঁচেও না।

জড়বুদ্ধিদের সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব নয়। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা দিলে তাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়। মানুষের কার্যক্ষমতা বিচিত্র। স্মৃতিশক্তি এইরকম একটি ক্ষমতা। কোন কোন জড়বুদ্ধির স্মৃতিশক্তি খুবই প্রবল হতে দেখা যায়। এদের ইংরাজীতে Idiot Savant বলে। উপযুক্ত শিক্ষা দিলে বিশেষ ক্ষমতাগুলি উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। শিক্ষার গুণে উন্নত স্তরের জড়বুদ্ধিরা কুটীরশিল্প, চিত্রাঙ্কন, উদ্যানরচনা, সংগীত-শিক্ষা, গৃহস্থালীর কাজকর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যার যে বিষয়ে যোগ্যতা এবং অনুরাগ আছে তাকে সেই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে সে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারে। Thyroid প্রভৃতি গ্রন্থির পুষ্টির জন্য যে সব শিশু জড়বুদ্ধি হয় অতি শৈশবে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে তারা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অধিক বয়েসে এরকম চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল হয় না।

মানবসমাজে জড়বুদ্ধির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, যদিও মোট জনসংখ্যার তুলনায় তাদের হার খুবই কম। সমাজ তাই এদের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। সমাজকেই এদের অন্নবস্ত্র জোগাতে হয়, সুতরাং এদের কাছে বিনিময়ে সমাজ অবশ্যই কিছু দাবী করতে পারে। আমরা বলেছি মনস্তত্ত্ববিদের তত্ত্বাবধানে এদের দিয়ে নানাবিধ মূল্যবান কাজ শেখানো সম্ভব। এদের শিক্ষা এবং রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠান দরকার। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলে এবং ঠিক ঠিক মতো এদের শিক্ষা দিতে পারলে এরা সমাজের দায় না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে।

শিক্ষায় অনগ্রসর শিশু

শিশুদের যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে মাতাপিতাকে সচরাচর বিব্রত ও উদ্বিগ্ন হতে হয় শিক্ষায় অনগ্রসরতা বা পশ্চাদ্‌বর্তিতা (educational backwardness) তার মধ্যে অন্যতম। বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট গবেষক স্যার সিরিল বার্ট (Sir Cyril Burt)-এর মতে যে শিশু তার বিদ্যালয়-জীবনের মাঝামাঝি স্তরে উপনীত হয়ে তার বয়সোপযোগী শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণীর কাজও করতে পারেনা তাকেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষায় অনগ্রসর বা পশ্চাদ্‌বর্তী শিশু বলা চলে। অবশ্য পশ্চাদ্‌বর্তিতা যে কোন শ্রেণীতেই ঘটতে পারে এবং যথা সময়ে তার উপযুক্ত প্রতিকার বা প্রতিবিধান না করলে ক্রমান্বয়ে অবস্থার অবনতি ঘটে পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয়।

পশ্চাদ্‌বর্তিতার সাধারণ অর্থ হলো শ্রেণী কক্ষের সাধারণ অগ্রগতির (Progress) সঙ্গে তাল রেখে চলার অক্ষমতা, অর্থাৎ শিক্ষকমশাই যতটা পড়াচ্ছেন শিশু যখন ততটা বা তার অনেকটাই শিখতে পারছেনা তখন বলা চলে যে সে পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ পিছিয়ে পড়ছে।

পশ্চাদ্‌বর্তিতা বিশেষ কোন বিষয়ে বা মোটামুটি সব ক'টি বিষয়েই সামগ্রিকভাবে ঘটতে পারে। এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যারা কোন কোন বিষয়ে ভালো—হয়তো বা খুবই ভালো, কিন্তু অন্য কয়েকটি বিষয়ে রীতিমত কাঁচা। আবার এমন ছাত্রেরও অভাব নেই যারা প্রায় সব বিষয়েই সমান কাঁচা। অনগ্রসর শিশুরা যে গোড়া থেকে সব সময়ই অনগ্রসর ছিল তা কিন্তু সব সময় ঠিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশুটি ভালোভাবেই লেখাপড়া করছিল, অর্থাৎ তার ফলাফল ভালোই হচ্ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে এবং বিশেষ একটা স্তরে এসে সে আর অগ্রসর হতে পারছে না। এই রকম শিশুদের নিয়ে মাতাপিতাকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়, তার কারণ তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধেই যে শুধু তাঁদের আশঙ্কা জাগে তাই নয়, তাদের আচার-আচরণে নানা রকম অপসঙ্গতি দেখে তাদের বর্তমান সম্বন্ধেও তাঁরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ লেখাপড়ায় পশ্চাদ্‌বর্তী শিশুদের প্রায়ই ভীরু লাজুক নিরুদ্যম ও অমনোযোগী অথবা দুরন্ত অশিষ্ট বদ্‌মেজাজী ও দুষ্কৃতিপরায়ণ হতে দেখা যায়। সুতরাং লেখাপড়ায় পশ্চাদ্‌বর্তিতা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলেনা।

কিন্তু কেন শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়? এর কারণ সন্ধান করতে হলে আমাদের প্রধানতঃ চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ বিষয়গুলি

হলো (ক) শিশু নিজে ; (খ) তার গৃহ পরিবেশ ; (গ) তার বিদ্যালয় পরিবেশ ; এবং (ঘ) তার সমাজ পরিবেশ।

অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধির স্বল্পতা অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ। বুদ্ধি মূলতঃ বংশগত। যারা অল্প বুদ্ধির অধিকারী হয়ে জন্মেছে তাদের যদি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে এক সাথে সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে স্বভাবতঃই তারা অন্যদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেনা এবং ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়বে। এরকম শিশুদের জন্য তাই স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বুদ্ধির স্বল্পতা যেখানে বংশগত সেখানে প্রতিকারের সুযোগ বড়ো একটা থাকেনা। এ রকম শিশুদের কাছে খুব একটা আশাও করা যায় না, করলে নিরাশ হতে হয়। তবে তাদের স্বতন্ত্রভাবে সহানুভূতি সহকারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে যেটুকু সম্ভাবনা তাদের মধ্যে সুপ্ত আছে তাকে পরিস্ফুট করে তোলা যেতে পারে। অনেক সময় বুদ্ধির স্বল্পতা অন্য কারণেও ঘটে থাকে—যেমন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মস্তিষ্কের বা থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্ষতি হলে। এ রকম ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে বুদ্ধির স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির বৈশিষ্ট্যের ওপর আমাদের মেজাজ (temperament) বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রন্থির বিশিষ্টতার তারতম্যের ফলে কেউ হয় ধীর শান্ত, কেউ বা অতিরিক্ত চঞ্চল ও উচ্ছল ; কেউ সহজে মনোনিবেশ করতে পারে, কেউ বা পারেনা। যে শিশু এই কারণে অতিরিক্ত চঞ্চল ও ছটফটে তার পক্ষে দীর্ঘক্ষণ পাঠ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সে পাঠ্য বিষয়ে মন দিতে পারে না, ফলে ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে পড়ে। উপযুক্ত হরমোন চিকিৎসার দ্বারা এই রকম গ্রন্থিগত ত্রুটি কোন কোন ক্ষেত্রে দূর করা যেতে পারে।

যে শিশু প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে তার পক্ষে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হয়না এবং বাড়তেও তার পড়াশুনো হয়না। আগের পড়া আয়ত্ত হয় না বলে পরের পড়া সে বুঝতে পারে না। এমনি করে ক্রমান্বয়ে সে পিছিয়ে পড়তে থাকে। শিশুর শারীরিক সুস্থতার দিকে এবং যাতে সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে সেদিকে তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

যে শিশুটি অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির, সে পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ বুঝতে না পারলেও কারো কাছে তা প্রকাশ করে না। এমনি করে মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে তার কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে পারেনা বলে জটিলতর বিষয় সে বুঝতে পারেনা এবং পড়াশুনোয় আগ্রহ হারিয়ে নিজের অবস্থাটাকে

শোচনীয় করে তোলে। মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাই এমন আচরণ করতে হবে যেন শিশু তাঁদের কাছে নিজের সমস্যা খুলে বলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় শিশু কিছু বুঝতে চাইলে আমরা বোঝাতে চাইনা. বোঝাতে গেলে যদি সে বুঝতে না পারে তাহলে তার ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে তিরস্কার করি, যেটা নিজে বোঝাতে পারিনা সেটা যাতে সে অন্যের কাছে বুঝে নিতে পারে সেরকম কোন ব্যবস্থাও করিনা। ফলে শিশু তার সমস্যাগুলি নিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসবার সাহস এবং উৎসাহ দুই-ই হারিয়ে ফেলে। স্পষ্টতই আমাদের এরকম আচরণ করা ঠিক নয়। যথাসাধ্য শিশুকে সাহায্য করতে হবে। এজন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন। শিশু তার সমস্যাগুলি নিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসবে তার প্রতীক্ষায় না থেকে তার কোন সমস্যা আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের নিয়মিত খোঁজ খবর নিতে হবে।

অনেক সময় শিশুর শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হবার ফলে শিক্ষকমশাই যা বলেন তা সে ঠিক মতো শুনতে পায় না, বোর্ডের এবং বই-এর লেখা ঠিক মতো দেখতে পায় না। তাই পড়ায় সে যেমন আনন্দ পায় না, তেমনি শেখায় তার অনেক ভুল ত্রুটিও থেকে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাই ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি অনগ্রসরতার একটি কারণ হতে পারে। শিশুর হাবভাব ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তার চোখের বা কানের দোষ আছে কিনা। যার চোখের দোষ দেখা দিয়েছে সে প্রায়ই মাথা ব্যথার কথা বলে, পড়বার সময় বই-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে, ভুল পড়ে। যার কানের দোষ ঘটেছে সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়, চেঁচিয়ে কথা বলে, অন্যকে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলে, বার বার একই প্রশ্ন করে এবং এক প্রশ্নের আর এক উত্তর দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের এরকম আচরণের প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। কোন শিশু যদি বলে সে ভালো দেখতে পাচ্ছেনা তাহলে মনে করি সে চশমার লোভে মিছে কথা বলছে, এজন্য তাকে বকাঝকা করি। এর ফলে পরিণতিটা হয় আরও শোচনীয়। সুতরাং এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই রকম ছেলেমেয়েদের শ্রেণীকক্ষে প্রথম সারির বেঞ্চিতে বসাতে হবে। শিক্ষকমশাইকে উচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় পাঠ দান করতে হবে, বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে বোর্ডে লিখতে হবে।

অনেক শিশু আছে যাদের কোন কিছু বুঝতে দেরী হয়। এদের বলা হয় 'শ্লথ শিক্ষার্থী' (Slow learners)। বুদ্ধির স্বল্পতা এবং জ্ঞানের অল্পতার জন্য এটা হতে পারে, আবার মানসিক গঠনও এর কারণ হতে পারে। অনেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অনেক বয়স্ক উচ্চপদস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সহজে অন্যের বক্তব্য

বুঝতে পারেন না ; বলে থাকেন—আবার বলুন, একটু ভালো করে বলুন, নইলে ঠিক বুঝতে পারছিনা। কারো কারো ক্ষেত্রে এ রকমটা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং বুঝতে সময় নিলেই যে বুদ্ধির ঘাটতি আছে সটা সব সময় মনে করা ঠিক নয়। শ্লথ শিক্ষার্থীদের তাই ধীরে ধীরে, প্রয়োজন হলে বার বার বলে, পাঠ্য বিষয়টি ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষায় শিশুর অনগ্রসরতার জন্য তার গৃহ পরিবেশটিও কম দায়ী নয়। যে গৃহে দৈন্য দুর্দশার অন্ত নেই, অভাব অনটন নিত্যই লেগে আছে সেখানে মনের প্রসার ঘটতে পারেনা। বই কাগজ পেন্সিল কলমের অপ্রতুলতা পদে পদে শিশুর পাঠে আগ্রহ হরণ করে। তাছাড়া এইসব পরিবারে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেও শিশুমনের বিকাশ বিঘ্নিত হয়। কোন কোন শিশু প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

দরিদ্র সংসারে শিশুকেও নানা রকম গৃহ কর্মের দায়িত্ব বহন করতে হয়। হয়তো পড়ায় একটু মন বসেছে এমন সময় বিশেষ কাজে তাকে অন্যত্র পাঠানো হলো। এইসব কারণে সে পড়ার সময় পায়না এবং তার আগ্রহে ভাটা পড়ে। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে তার পড়াশুনোয় বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়েও সাধ্যমত সতর্ক থাকতে হবে।

যে বাড়ির লোকেদের শিক্ষার অভাব থাকে অথচ গৃহ শিক্ষক রাখবার সামর্থ্যও থাকে না তাদের ছেলেমেয়েরা পরিচালনার অভাবে ধীরে ধীরে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। সুশিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে পায় বলেই সাধারণতঃ পড়াশুনাতে তারা উন্নত হয় এবং তাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধিটাও হয় বিস্তৃততর।

যে পরিবারে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিবাদ লেগে আছে, কলহ কোন্দল কথা কাটাকাটি যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে শিশুর মনে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেকে অসহায় মনে করতে শুরু করে। এমন অবস্থায় পড়াশুনোয় মন বসানো তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবারের সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক ও সংযত হতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর পড়াশুনো সম্পর্কে মাতাপিতা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে এবং গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেই তাঁরা মনে করেন তাঁদের দায়িত্ব শেষ। তাঁদের এ ধরনের মনোভাব শিশুর অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। তার পড়াশুনোয় মাতাপিতার উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব দেখলে পড়াশুনোর গুরুত্ব তার কাছে কমে যায়। সে ক্রমে ক্রমে পড়ায় ফাঁকি দিতে আরম্ভ করে। যাতে এরকম না ঘটে সেজন্য শিশুর লেখাপড়ায় সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ

করা, তার পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিত পর্যালোচনা করা, যে যে বিষয়ে সে দুর্বল সেই সেই বিষয়ে তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করা মাতাপিতার একটি নিতান্ত করণীয় কাজ।

বিদ্যালয়ে পরিবেশটা যদি সুস্থ না হয়—যদি শিক্ষক নিয়মিত পড়া না ধরেন, যদি পড়ানোর রীতিটা চিত্তাকর্ষক না হয়, যদি তিনি ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়ান, যদি গৃহের কাজ নিয়মিত ও নিখুঁত ভাবে না দেখে দেন, যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পাঠনের উপযোগী উপকরণের অভাব থাকে বিদ্যালয়ে, যদি যোগ্যতানুসারে শিশুকে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করা না হয়, যদি অযোগ্যতা সত্ত্বেও উচ্চতর শ্রেণীতে তাকে তুলে দেওয়া হয়, যদি পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম আনন্দদায়ক কাজকর্মের আয়োজন করা না হয়—তাহলে পড়াশুনোয় শিশুর মন বসবেনা। এবং ফলে সে যে ক্রমাগত অনগ্রসর হয়ে পড়বে তাতে আর বিস্মিত হবার কী আছে ? অবশ্য নানা কারণেই বিদ্যালয়ের অবস্থা সন্তোষজনক নাও হতে পারে। যেমন, অর্থাভাবে পাঠনোপযোগী উপকরণ কেনা সম্ভব হয় না। তবু এটাও তো সত্যি যে ইচ্ছে করলেই ছাত্রদের সাহায্যেই সামান্য বস্তু সামগ্রী দিয়ে অনেক মজার মজার পাঠনোপকরণ (teaching aids) তৈরী করা যায়। আর একটা বড়ো সমস্যা হলো ছাত্রসংখ্যা। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে কোন শিক্ষকের পক্ষেই প্রতিটি ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে একে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলেনা। তবে যথাসম্ভব এ সমস্যাটার অন্ততঃ আংশিক সমাধান হতে পারে যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে এবং প্রতিটি দলকে তাদের মতো করে পড়িয়ে; ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ (common) ত্রুটিগুলো যুক্ত শ্রেণীকক্ষে (combined class) আলোচনা করে ; ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাব তৈরী করে এবং মাঝে মাঝে বিতর্ক ও আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করে। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্কটা এমন হওয়া দরকার যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তারা তাঁর কাছে এগিয়ে আসে এবং নিজের অসুবিধের কথা নিঃসঙ্কোচে খুলে বলে। তাঁর পক্ষে কার কী অসুবিধে তা জানা সব সময় সম্ভব নয়, কিন্তু তারা যদি তাঁর কাছে এগিয়ে আসে তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন কার কী ধরনের সাহায্য দরকার। ভর্তি এবং প্রমোশনের ব্যাপারেও বিদ্যালয়গুলি প্রায়ই অভিভাবকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অভিভাবকেরা বোঝেন না যে এর ফলে শিশুর যতটা উপকার তাঁরা করেন তার চাইতে অপকার

করেন অনেক অনেক বেশী। সুতরাং অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

শিশুর ওপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবটিও কোন অংশেই কম নয়। যে পরিবেশে শিশু বাস করে সেখানে যদি লেখাপড়ার অবমূল্যায়ন হয়, শিক্ষিত ব্যক্তিকে যদি শিশু প্রতিষ্ঠিত হবার পরিবর্তে দুর্দশাগ্রস্ত হতে দেখে, যদি বড়োদের দেখে ফাঁকি দিতে, অসৎ পথ অবলম্বন করতে, তাহলে সে সৎ ও সাধুভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করবে এরকম আশা বা দাবী করাটা নিতান্তই অযৌক্তিক।

অসৎ সঙ্গে পড়েও অনেক ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতে আরম্ভ করে। অবাঞ্ছিত কাজকর্মে সঙ্গীদের বাহবা পেয়ে সেদিকেই বেশী করে তাদের মন যায়। তার ফলে ধীরে ধীরে তারা লেখাপড়ায় পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে পড়ে।

মোট কথা—শিশু কেন অনগ্রসর হয়েছে সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এজন্য নানারকম মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সাহায্য নিতে হতে পারে। তবে একথাটা ঠিক যে অনগ্রসরতার পশ্চাতে খুব কম ক্ষেত্রেই একটি বা দুটি মাত্র কারণ থাকে, বস্তুতঃ একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রভাবেই অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। আরও দেখা যায় অনগ্রসরতার জন্য শিশু নিজে যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী তার গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের পরিবেশ। সুতরাং তাদের অগ্রসর করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন আমাদের নিজেদের সংশোধন করা।

প্রতিবন্ধী শিশু

অন্ধ খঞ্জ মূক বধির বিকলাঙ্গ জড়বুদ্ধি শিশুদের প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়। প্রতিবন্ধ কথাটার অর্থ বাধা। কোন না কোন শারীরিক ত্রুটির জন্য এই সব শিশু স্বাভাবিক শিশুদের মতো সহজভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই এদের বলা হয় প্রতিবন্ধী।

সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায়ই কী গৃহ কী সমাজ কোনখানেই এরা স্বাভাবিক শিশুদের মতো মর্যাদা স্বীকৃতি বা সমাদর পায় না, উল্টে এদের করুণার পাত্র এবং গলগ্রহ বলেই মনে করা হয়। কখনো কখনো অন্যান্য শিশুরা, এমন কি বড়রাও, নিষ্ঠুরভাবে এদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে থাকেন, নানানভাবে ব্যঙ্গ করে এদের মনে আঘাত হেনে আনন্দ পান। ব্যঙ্গ কথাটার দুটি অর্থ—(১) বিকলাঙ্গ আর (২) বিদ্রূপ। এ থেকেই বোঝা যায় সমাজের কাছে বিকলাঙ্গরা, তথা প্রতিবন্ধীরা, বিদ্রূপের পাত্র হয়েই আছে। এটা সমাজের পক্ষে লজ্জা এবং কলঙ্কের কথা। তার কারণ প্রতিবন্ধীরাও অন্যদের মতোই মানুষ, এবং মানুষের অধিকারে তাদের সমান দাবি। সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। তাছাড়া মানবিকতা বলে তো একটা কথা আছে। ক্লিষ্ট দুস্থ মানুষের জন্য সুস্থ মানুষের প্রেম ও সহানুভূতি মানবিকতার লক্ষণ। মানুষ যদি মানবিক না হয়, তাহলে কে হবে?

সাধারণতঃ মাতাপিতারা তাঁদের প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে শুধু যে লজ্জা-বোধ করেন তাই নয়, তাদের বোঝাস্বরূপ মনে করে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের এই মনোভাব কিন্তু একেবারেই অসঙ্গত।

জগতে অনেক প্রতিবন্ধী মানুষ বিরাট প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইংরেজ কবি মিল্টন ছিলেন অন্ধ, আর স্কট, বায়রণ ছিলেন খঞ্জ। বাঙালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্ধ ছিলেন। যশস্বিনী আমেরিকা-নন্দিনী হেলেন কেলার দেড় বছর বয়সে কঠিন অসুখে ভুগে অন্ধ মূক ও বধির হয়ে যান। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পোলিওগ্রস্ত ছিলেন। বধির হয়েও বিঠোফেন অপূর্ব মূর্ছনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে গেছেন। বাংলার বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে আর চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় দৃষ্টিহীন হয়েও আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ছিলেন বধির। এ রকম আরো অজস্র উদাহরণ পাওয়া

যাবে ইতিহাসের পাতা উল্টোলে। সুতরাং প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে লজ্জিত বা উদ্বিগ্ন হবার কী আছে? স্বাভাবিক শিশুদের মতোই প্রতিবন্ধী শিশুরাও নানারকম দক্ষতা অর্জন করবার প্রবণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সহানুভূতির সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তারাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্ব-নির্ভর হতে পারে, এমনকি পরিবার ও সমাজের উপকারেও আসতে পারে।

সাধারণভাবে প্রতিবন্ধীদের কতকগুলি অতিরিক্ত ও আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হতে দেখা যায়। যেমন, যারা অন্ধ তাদের স্পর্শ ও ঘ্রাণশক্তি অস্বাভাবিক রকমের প্রখর। যারা মূক তাদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ন, অন্যের সামান্যতম মুখভঙ্গিও লক্ষ্য করে তারা তার অর্থ বুঝতে পারে। যারা বধির অথবা অন্ধ তাদের একাগ্রতা খুব বেশী, তার কারণ বাইরের কোন শব্দ বা দৃশ্য তাদের মনোযোগে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। সেইজন্য এদের কল্পনাও খুব সজীব। সমস্ত মন দিয়ে এরা কল্পনার বস্তুগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মোটের ওপর প্রতিবন্ধীদের এক দিকের ঘাটতি প্রকৃতি পূরণ করে দেন অন্য দিকে প্রাচুর্য দিয়ে। প্রতিবন্ধীদের অসাধারণ ক্ষমতাগুলিকে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং কাজ দিয়ে সমাজের কাজে লাগানো যেতে পারে। এমন অনেক কাজ আছে যার জন্য এক নাগাড়ে একই জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়, যেমন কোন কিছুর ওপর নজর রাখার কাজ। খঞ্জরা এ ধরনের কাজ করতে পারে। এমন অনেক কাজ আছে যাতে তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তির দরকার হয়, যেমন, চা-এর গুণাগুণ অনেকটাই নির্ভর করে তার গন্ধের ওপর, তাই চা-বাছাই-এর কাজ ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অন্ধদের দিয়ে এ কাজটা ভালো-ভাবে হতে পারে। তাদের আশ্চর্য স্পর্শশক্তির সাহায্যে তারা অদ্ভুত অদ্ভুত হাতের কাজ, এমনকি বাগানের কাজও করতে পারে। সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে শিক্ষা দিলে প্রতিবন্ধী শিশুরা আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বভাবতঃই সংকুচিত হয়ে থাকে, তার কারণ নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ সচেতন এবং সেজন্য একটা হীনমন্যতার বোধ তাদের অহরহ পীড়া দেয়। তার ওপর অন্যদের নির্মম উপহাস তাদের আত্মগ্লানি ও অসহায়ত্বের অনুভূতিকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। ভালবাসা দিয়ে স্নেহ দিয়ে তাদের গ্রহণ না করলে তাদের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে, কখনোই তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠবে না। প্রতিবন্ধী শিশুদের আমরা সাহায্য করতে পারি—তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চেষ্টা করে; সেটা যদি সম্ভব

না হয় তাহলে সহজভাবে সেটিকে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়ে ; আর অন্য বিশেষ কোন ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব অর্জন করার সুযোগ দিয়ে। অনেক সময় সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা অন্ধত্ব বধিরত্ব জড়বুদ্ধিতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সারিয়ে তোলা যায়। সুতরাং প্রথমেই আমাদের সেইরকম চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আবার চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, অবস্থার সামান্য একটু উন্নতি বা হেরফের হতে পারে মাত্র। যেমন, যার একটা পা কাটা গেছে তাকে সত্যিকারের পা আর দেওয়া যাবে না, কাঠের পা দেওয়া যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে সহজ মনে নিজের বিকৃতি বা অপূর্ণতাকে মেনে নেবার শিক্ষা দিতে হবে প্রতিবন্ধী শিশুকে, আর সঙ্গে সঙ্গে যেদিকে উৎকর্ষ লাভ করবার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে সেই দিকে উন্নতি লাভ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ তাকে দিতে হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সক্রেটিশ, তাই তাঁর কুশ্রীতার গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি ; চিররুগ্ন রবার্ট লুই স্টিভেনসন অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী রচনা করে ব্যাধির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই যাঁদের নাম করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা জয় করেছিলেন। প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যেই কোন না কোন দিকে উৎকর্ষ লাভ করবার প্রবণতা আছে। মাতাপিতা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানতে হবে কোন্ প্রতিবন্ধী শিশুটির কোন্ দিকে বড় হবার সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই মতো তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই মতো পরিবেশ তৈরী করতে হবে তাদের জন্য।

প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বভাবতঃই খুব বেশী সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। একটু সহানুভূতি পেলে তারা যেমন উৎফুল্ল হয়, তেমনি সামান্য সমালোচনায় তারা আহত বোধ করে। স্নেহ ও সহানুভূতির সাহায্যে তাদের এই সংবেদনশীলতা ও স্পর্শকাতরতাকে সংগীত চিত্রাঙ্কন নৃত্য ইত্যাদি নন্দন শিল্পের প্রতি অনুরাগে রূপান্তরিত করা সম্ভব। বকুলতলা দিয়ে বকুল বিছানো পথ বেয়ে যাবার সময় "পায়ের তলায় নরম ঠেকলো কী, আস্তে একটু চল্না ঠাকুরঝি" অন্ধ বধূর এই উক্তিটি সমস্ত প্রতিবন্ধীর অপূর্ব সৌন্দর্য-প্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেমের প্রতীক স্বরূপ।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে শুধু এ কথাই বলতে চাই যে প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধী বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার অথবা উপহাস করার কোন নৈতিক যুক্তিই আমাদের নেই, কারণ প্রতিবন্ধকতা শুধু দেহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারে

না, মনের প্রতিবন্ধকতাও প্রতিবন্ধকতা। আর সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিবন্ধী, কারণ অজস্র কুসংস্কার আর ভয়ে এবং সংকোচে আমরা প্রায় সর্বদাই আড়ষ্ট হয়ে আছি। বাইরে থেকে আর নিজের ভেতর থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে যা করা উচিত তা আর করতে পারছি কই? প্রতিবন্ধকতার শৃংখল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে দৈহিক এবং মানসিক সকল রকম বাধাকে জয় করার শিক্ষা প্রতিটি শিশুকেই দিতে হবে।

সদভ্যাস গঠন ও বদভ্যাস বর্জন

আমাদের জীবনে অভ্যাসের প্রভাব অপরিমেয়। বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির ওপর অভ্যাসের প্রভাব কত বেশী। সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর থেকে রাত্রিবেলা শয্যাগ্রহণ করা পর্যন্ত আমরা যেসব কাজ করি তার অধিকাংশই করি অভ্যাসবশে। ঘুম ভাঙার পর মুখ ধোওয়া, মুখ ধোওয়ার পর প্রাতরাশ করা, স্নানের পর আহার, আহারের পর কর্মস্থলে যাওয়া, সেখানে গিয়ে যথারীতি কাজ করা এই মতো সকল কাজই একটা নির্দিষ্ট ধারা মেনে চলে। সকলের পক্ষে কাজের ধারাটি একই রকম না হলেও প্রত্যেকেই প্রতিদিন মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি ধারা মেনে চলে। প্রত্যেকটি কাজও আমরা প্রতিদিন মোটামুটি একই ভাবে করে থাকি। একই ভাবে মুখ ধুই, জামা কাপড় পরি, জুতোয় ফিতে বাঁধি, চুল আঁচড়াই, খাবার খাই। হাঁটা চলা শোওয়া বসা সব কিছুর ওপরেই অভ্যাসের প্রভাবটি সুস্পষ্ট। অভ্যাস বশে আমরা যে শুধু কাজই করি তাই নয় আমাদের চিন্তাধারণা কথাবার্তা আবেগ-অনুভূতি এসবও অনেকটাই অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব চিন্তাধারা, একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রভাবে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করবার প্রবণতা জন্মেছে এবং সেই ভাবে চিন্তা করতে করতে সেটা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এমনি বদ্ধমূল যে সহজে আমরা তার সম্বন্ধে অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি না। যেভাবে আমরা আমাদের চিন্তা প্রকাশ করি সেটাও আমাদের অভ্যাসেরই ফল। আমাদের সকলেরই কথা বলার ও লেখার একটা নিজস্ব ধরন আছে। প্রত্যেকেরই কতকগুলি প্রিয় শব্দ আছে যেগুলি ঘুরে ফিরে তার কথায় বা লেখায় হাজির হয়। প্রত্যেকের বাক্য গঠনের ভঙ্গিমাটিও স্বতন্ত্র। একই শব্দ বার বার প্রয়োগ করতে করতে এবং একইভাবে বাক্য রচনা করতে করতে আমাদের মধ্যে সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করবার একটি প্রবণতা গড়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট আবেগ বার বার অনুভব করতে করতে আমরা অসংখ্য আবেগাত্মক অভ্যাসও গঠন ক'রে ফেলেছি। অন্যকে অনুকরণ করে বা অন্যের নির্দেশে প্রথম প্রথম মন্দির দেখলেই ভক্তিভরে মাথা নুইয়েছি। তারপর নিজে থেকেই এরকম আচরণ করেছি। বার বার করতে করতে সেটা আমাদের এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে মন্দির দেখলেই এখন মনে ভক্তির সঞ্চার হয়, মাথা নিজে থেকে নুয়ে পড়ে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বস্তু বা পরিবেশের সংস্পর্শে এলে

আমাদের মনে আনন্দ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি বিশেষ ধরনের আবেগ দেখা দেয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যাসের ফল। অভ্যাসের প্রভাবটি আমাদের ওপর এতই বেশী যে নতুন পরিবেশে আমাদের ঘুম আসে না, এলেও সেটা সুখের হয় না ; অন্যের বাড়ীতে সমূহ আদর আপ্যায়ন পেয়েও অস্বস্তি বোধ করি।

অভ্যাসের ফলে আমাদের জীবনযাত্রাটি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়েছে। বার বার পড়তে পড়তে পড়ার কাজটা সহজতর হয়েছে। বহুবার লিখে লিখে এখন সহজেই লিখতে পারি। অতি শৈশবে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খেতাম। আজ কত অনায়াসে সে কাজটা করতে পারছি। অভ্যাসের জন্য অনুশীলনের দরকার। অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি ঘটে এবং নানাবিধ দক্ষতার সৃষ্টি হয়। অভ্যাসগত কাজগুলি সহজে এবং কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করেই করতে পারি বলে নতুন নতুন কাজে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনায়াসে আমরা মন দিতে পারি। আর তা পারি বলেই মানবসভ্যতার ধারাটি স্তব্ধ না হয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে।

অভ্যাসের ফল সব সময় কিন্তু আমাদের পক্ষে ভালো হয় না। অভ্যাসের দাস হয়ে পড়লে আমরা গতানুগতিক, নিরুদ্যম ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়ি। উদ্ভাবনী শক্তির যথাযথ উন্মেষ ঘটতে পারে না আমাদের মধ্যে। উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব না হয়ে মন সংকীর্ণ ও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া নানারকম কুঅভ্যাস যে আমাদের কী পরিমাণ ক্ষতি করে এবং কখনো কখনো অন্যের কাছে আমাদের কতো বেশী হাস্যাস্পদ করে তোলে তা তো আমরা সকলেই জানি।

শিশু যাতে সদভ্যাস গড়ে তুলতে পারে এবং বদভ্যাসগুলি পরিহার করে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা দরকার।

জেমস্ অভ্যাস গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ যে কাজটি অভ্যাসে পরিণত করতে চাই স্থির সংকল্প ও অনমনীয় সিদ্ধান্ত দিয়ে সে কাজটি সুরু করতে হবে, কাজটির উপযোগী একটি পরিবেশও রচনা করতে হবে। যেমন কেউ যদি ভোরে ওঠার অভ্যাস করতে চান তাহলে তাঁকে কৃতসংকল্প হতে হবে যে তিনি ভোরে উঠবেনই। যাতে এ কাজটা সহজে করতে পারেন সেজন্য তিনি এলার্ম ঘড়ি ব্যবহার করতে পারেন এবং বাড়ির আর পাঁচজনকে বলেও রাখতে পারেন যেন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বড়দের পক্ষে আপনা থেকেই সংকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হলেও শিশুদের পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব।

তাই শিশুদের পুরস্কার প্রশংসা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির সাহায্যে কাজটি করতে প্রণোদিত করতে হবে। তাহলে তাদের মনে সংকল্প জাগবে। শিশু যাতে কাজটি অনায়াসে করতে পারে সেজন্য একটি অনুকূল পরিবেশও থাকা চাই।

যে কাজটি অভ্যাসে পরিণত করতে চাই সেটি যত শীঘ্র সম্ভব সুরু করতে হবে। আজ যদি ভোরে ওঠার অভ্যাস করবো এই রকম সংকল্প করি, তাহলে কাল থেকেই ভোরে উঠতে হবে। রামায়ণে পড়েছি রাবণ মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনই তিনি ভাবতেন কাজটা পরের দিন থেকে সুরু করবেন। এই করতে করতে কত কাল পেরিয়ে গেল, ক্রমে তাঁর জীবনকালও ফুরিয়ে গেল। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজটি তিনি আর করে যেতে পারলেন না। আমাদেরও অনেক কিছু করবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু দীর্ঘ সূত্রতার জন্য আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ দৃঢ়ভাবে অভ্যাস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই ব্যতিক্রম ঘটতে দেওয়া চলবে না। একবার যদি ভোরে ওঠা সুরু করি তাহলে আবহাওয়া অসুস্থতা বিশ্রাম অথবা অন্য কিছুর দোহাই দিয়ে এক দিনও দেরী করে ওঠা চলবে না। ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিই বলেই আমাদের কতো শুভ প্রয়াস সুরুতেই ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং দেখতে হবে সদভ্যাস গঠনের উদ্দেশ্যে শিশু যেন নির্দিষ্ট কাজটি তাড়াতাড়ি সুরু করে এবং সুরু করার পর একদিনও বাদ না দিয়ে নিয়মিত সেটি করে চলে।

তৃতীয়তঃ জোর করে প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু কাজে মন বসাতে হবে। তাহলে অভ্যাস গঠনের জন্য যে রকম অদম্য মনোবলের প্রয়োজন ধীরে ধীরে সেটি গড়ে উঠবে। বার বার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করতে হলে আত্মসংযমের ক্ষমতা দৃঢ় হয়, ফলে আলস্য ও অনিচ্ছা জয় করে বাঞ্ছিত কাজটি আরম্ভ করে নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া সহজ হয়। তাই প্রতিদিনই শিশু যাতে কিছুক্ষণের জন্যও জোর করে কোন না কোন কাজে মন বসায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে এ কাজটা করতে হবে খুবই সতর্কতার সঙ্গে। দেখতে হবে কাজটা যেন খুব বেশী কঠিন না হয়। সে যাতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে সেটাও দেখতে হবে। আসল কথা, কাজটি করার জন্য তাকে যেন অন্য কিছু করবার ইচ্ছাটিকে সাময়িকভাবে দমন করে প্রদত্ত কাজে একাগ্রচিত্ত হতে হয়, সেটি সম্পাদন করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়। আবার কাজটা এমন হবে যেন খুব বেশীক্ষণ সেটা নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে না হয়। তা না হলে সে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠবে।

উল্লিখিত নীতিগুলি শুধু যে অভ্যাস গঠনের পক্ষেই অনুকূল তাই নয়, বদভ্যাস বর্জনের ব্যাপারেও সেগুলি সমান প্রযোজ্য। সদভ্যাস গঠনের মতো বদভ্যাস ভাঙবার জন্যও অনমনীয় সংকল্প, তৎপরতা এবং ব্যতিক্রম-বিমুখতার বিশেষে প্রয়োজন। মানুষই অভ্যাস গঠন করে, সুতরাং মানুষই পারে অভ্যাস বর্জন করতে। তার জন্য চাই বজ্র-দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই রকম প্রতিজ্ঞার জোরে কতো লোক দীর্ঘকালের কতো অভ্যাস মুহূর্তে ত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দেখা গেছে অভ্যাস ত্যাগ করার পর সহস্র প্রলোভন উপেক্ষা করেও তাঁরা প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছেন।

অনেক সময় শিশুদের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত প্রাক্ষোভিক অভ্যাসও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন টিকটিকি আরশুলা মাকড়সা ইত্যাদি নিরীহ কীট পতঙ্গের ভয়; মিষ্টি জিনিসে অস্বাভাবিক আসক্তি, ইত্যাদি। কীভাবে এই সব অভ্যাস থেকে শিশুদের মুক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে মেরী কোভার জোন্স তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। সকল ক্ষেত্রে সবগুলি পদ্ধতি সমানভাবে প্রযোজ্য না হলেও ক্ষেত্র বিশেষে কোনো না কোনোটি কার্যকর হতে পারে।

ভয়ের বস্তু থেকে শিশুকে বেশ কিছুদিন দূরে রাখলে যোগাযোগের অভাবে বস্তুটির প্রতি তার ভয়ের ভাবটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসবে এবং এক সময় ভয়টা আর থাকবেই না। সময়টা সুদীর্ঘ হলে তার মধ্যে শিশু বেশ বড় হয়ে উঠবে, তখন বস্তুটা দেখলেও তার আর ভয় হবে না। এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ সব সময় সম্ভব নয়, তার কারণ এমন অনেক বস্তু আছে (যেমন কুকুর, বেড়াল, টিকটিকি, মাকড়সা, অন্ধকার, ইত্যাদি) যা সব জায়গাতেই বিদ্যমান। তাই এদের থেকে শিশুকে সম্পূর্ণভাবে দূরে রাখা যায় না। তাছাড়া ভয়টা দুর্বল হলেও একেবারে বিনষ্ট না হয়ে চাপা থাকতে পারে এবং পরবর্তীকালে বস্তুটার সংস্পর্শে এলে আবার জেগে উঠতে পারে।

বস্তুটার থেকে দূরে রাখলে যেমন ফল পাওয়া যায় তেমনি আবার বার বার শিশুকে বস্তুটার সংস্পর্শে আনলেও কাজ দিতে পারে। অবশ্যই দেখতে হবে শিশু এবং বস্তুটার মধ্যে সব সময়ই যেন একটা নিরাপদ ব্যবধান থাকে। সেই সঙ্গে বস্তুটা যে একেবারে ভয়ংকর নয় বড়রা তাঁদের আচরণের দ্বারা যদি সেটা দেখিয়ে দেন তাহলে আরও ভাল হয়। যে শিশু বেড়াল দেখলে ভয় পায় তাকে যদি দূর থেকে যখন তখন বেড়াল দেখানো হয় এবং তার সামনেই বড়োরা যদি প্রাণীটিকে কোলে নিয়ে আদর করেন, তাহলে প্রাণীটার প্রতি শিশুর ভয় আর থাকবে না।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কিছুর জন্য শিশু ভীষণ রকম আবদার ধরে এবং সেটা না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। যেমন, কোন কোন শিশু যখন তখন মিছরী অথবা লজেন্সের জন্য বায়না ধরে। এসব জিনিস বেশী খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর; তাছাড়া শিশুর এধরনের ভয়ংকর জেদ এবং লোভ একেবারেই সমর্থন করা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে ধৈর্য সহকারে শিশুকে উপেক্ষা করতে হবে। জিনিসটা না পেয়ে তার কান্না এবং রাগের মাত্রা হয়তো বেড়েই চলবে। কিন্তু তাতে বিচলিত হলে চলবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও রাগ করা চলবে না। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তার আচরণের প্রতি কোন গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে শিশু ধীরে ধীরে তার আবদারের নিষ্ফলতা ও অসারত্ব বুঝতে পেরে বদভ্যাসটি ত্যাগ করবে।

অভ্যাসগত কাজটি শুরু করবার প্রাক্কালেই শিশুর দৃষ্টি যদি বেশী চিত্তাকর্ষক অন্য কিছুর দিকে আকর্ষণ করা যায় তাহলে অব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে অভ্যাসটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন যে শিশুর মধ্যে অসময়ে ঘুমোবার অভ্যাস গড়ে উঠেছে তাকে যদি ঐ সময়ে নতুন নতুন ছবি দেখানো যায়, গল্প বলা হয় অথবা গান শোনানো হয়, তা হলে ধীরে ধীরে তার অসময়ে ঘুমোবার অভ্যাসটা কেটে যাবে। সেই রকম ভয়ের বস্তুর আশেপাশে যদি মন ভোলানো খেলার সামগ্রী ছড়িয়ে রাখা যায় তাহলে ভয়টা ক্রমে ক্রমে কমে আসবে।

শিশু তার চারপাশে যারা আছে তাদের মতো হতে চায়। অনেক সময় সে অন্যদের অনুকরণ করে নানা রকম বদভ্যাস গঠন করে থাকে। যেমন অনেক সময় মা-মাসীদের দেখে ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা (বোধ করি বেশী কাছাকাছি থাকার জন্যই) আরশুলা মাকড়সা, ইত্যাদি নগণ্য প্রাণীদেরও ভয় করতে শেখে। শিশুর এই ধরনের ভয় ভাঙাতে হলে বড়োদের ঐ ধরনের ভয় আগে ত্যাগ করতে হবে। তাহলে শিশুও আত্মশক্তি প্রয়োগ করে ভয়টাকে জয় করতে শিখবে। বস্তুটাকে যে অন্যেরা ভয় করছে না এই বাস্তব ঘটনাটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

উপদেশ দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর বদভ্যাস ভাঙানো সম্ভব। কিন্তু যারা একেবারেই শিশু, অর্থাৎ যাদের মধ্যে বিচার বুদ্ধি এখনো ঠিকমতো হয়নি, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন লাভ হয় না। তেমনি অভ্যাসের মূলে যদি প্রচণ্ড আবেগ থাকে তাহলে বিচার বুদ্ধির কাছে আবেদন করে লাভ হয় না। বিচার-বুদ্ধি এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা বড়োরাই আবেগের তাড়নায় কতো অযৌক্তিক কাজ করে বসি। সুতরাং যুক্তি দিয়ে আবেগকে দমন করা শিশুর পক্ষে রীতিমত কঠিন।

শাস্তি দিয়ে কখনো কখনো শিশুকে বদভ্যাস-মুক্ত করা গেলেও সেটা করা ঠিক নয়, কারণ তাতে শুধু যে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না তাই নয়, কাজটি করার প্রেরণা অবদমিত হয়ে শিশুমনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেটা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু দুঃখের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতাপিতা এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শাস্তি ও ভৎর্সনার সাহায্যেই শিশুকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেন।

মেরী কোভার জোন্স এই পদ্ধতিগুলির কথা বলেছেন। তাছাড়া আরও অনেক পদ্ধতির প্রয়োগও সম্ভব। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে বদভ্যাসটির মূলে যে প্রেরণা আছে তার বিপরীত প্রেরণাটিকে উদ্বোধিত করতে পারলে কাজ দেয়। কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ একটা চিন্তা দ্বারা অহরহ জর্জরিত হন। বারে বারেই কারও মনে হয়তো এই চিন্তার উদয় হয় যে তিনি রুগ্ন বা অসুস্থ। এই রকম চিন্তা তাঁকে খুবই পীড়া দেয়। তিনি যদি পারেন বিপরীত চিন্তাটিকে সব সময় মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে, সব সময় এই কথা ভাবতে যে তিনি অমৃতের সন্তান, চির স্বাস্থ্যের অধিকারী—তাহলে ধীরে ধীরে অসুস্থতার আশংকা তাঁর মন থেকে দূর হয়ে যাবে।

কখনো কখনো দেখা যায় ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্যই বদভ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। লিখতে গেলেই কোন এক ব্যক্তির হাত কাঁপতো। দেখা গেল কলম ধরবার ধরনটাই তাঁর ত্রুটিযুক্ত। ঠিক মতো কলম ধরতে যখন শিখলেন তখন আর হাত কাঁপলো না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"Prevention is better than cure." প্রতিকারের অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়ঃ। সুতরাং শিশু যাতে কোন রকম বদভ্যাস গঠন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনও বদভ্যাসের সূচনা দেখা দিলেই তার মোকাবিলা করতে হবে। আমরা বড়োরাই অনেক সময় শিশুদের বদভ্যাসের জন্য দায়ী। অনেক সময় আমাদের দৃষ্টান্ত দেখেই তারা বদভ্যাস অর্জন করে। অনেক সময় আমরাই আবার তাদের নানা রকম বদভ্যাসকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। বার বার তাদের অপূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করে তাদের মনে নানা রকম দুর্ভাবনার সৃষ্টি করি। ঠিক মত চলতে বলতে লিখতে পড়তে না শিখিয়ে তাদের দোষ দিই।

বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাড়ার ফলে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বদভ্যাস (যেমন অনেক ভয়) নিজে থেকেই চলে যায়। এ কথাটা জানিনা বলেই আমরা বড়রা অনেক সময় শিশুদের বদভ্যাস সম্পর্কে অতিরিক্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকি। তার ফলে শিশুদের মনে বদভ্যাসগুলি দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়ে বসে। সুতরাং বিচলিত না হয়ে আমাদের বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে অভ্যাস গঠন এবং বর্জন দুই-ই পুরোপুরি মানুষেরই ইচ্ছাধীন।

মৌলিক চিন্তার বিকাশ সাধন

জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই প্রগতির মূলে আছে মৌলিক চিন্তা। প্রগতির অর্থ প্রকৃষ্ট অগ্রগতি। নতুনের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন না হলে নূতন পদক্ষেপ সম্ভব নয়, আর নতুন পদক্ষেপ না ঘটলে অগ্রগতিও অসম্ভব। আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের মূলে আছে মানুষের মৌলিক চিন্তা। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, বাণিজ্য, ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রেই তখনি প্রগতি ঘটেছে, যখন কোন না কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর অমূল্য মৌলিক চিন্তার সাহায্যে নতুন কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেছেন।

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। চিন্তা সকলেই করে এবং প্রত্যেকের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান গরিমা ও অভিজ্ঞতার পটভূমিটি স্বতন্ত্র বলে প্রত্যেকেরই চিন্তায় একটি স্বকীয়তা আছে। তার সব কিছু নিয়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই একটি অনন্য সত্তা। সে অনন্য। এই অর্থে সকলের চিন্তাকেই মৌলিক চিন্তা বলা যেতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ মৌলিক চিন্তা বলতে আমরা শুধু স্বতন্ত্র বা অনন্য চিন্তাকেই বুঝি না, বুঝি সেই রকম স্বতন্ত্র চিন্তাকে যা সৃষ্টিশীল বা সৃজনধর্মী।

তাই যে কোন দেশ বা জাতিকে প্রগতিশীল হতে হলে তাকে মৌলিক চিন্তার অধিকারী হতে হবে। এজন্য সমস্ত প্রগতিকামী দেশেই শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীগণের মানস-জীবনে মৌলিক চিন্তার বিকাশ সাধন করা। আমাদের দেশ একদিন তার অপূর্ব মৌলিক চিন্তার প্রভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিষ্পেষণে আমরা সেই অমূল্য মৌলিক চিন্তার শক্তিটি হারাতে বসেছিলাম। অত্যন্ত সুখের বিষয় পরাধীনতার নিগড়মুক্ত হয়ে দেশ আজ আবার প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ছাত্রছাত্রীদের মানসজীবনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ সাধন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে, যদি না শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি মৌলিক চিন্তার উন্মীলনের পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক হয়।

শুধু ডিগ্রীধারী শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী, যদি না আমরা নব নব উদ্ভাবনে জ্ঞানের ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধতর করতে পারি? যদি না পারি নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনকে সুন্দরতর করতে? আমাদের দেশের গৌরব বর্ধিত করতে? কী লাভ শুধু পরের নকল করে, অপরের প্রতিচ্ছবি হয়ে? যদি আমাদের দেশজননীকে আমরা একটি বিশিষ্ট সম্মানের

অধিকারিণী করতে চাই, যদি চাই সমান অধিকারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রগতির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে যাত্রা করতে, তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে হবে।

কিন্তু তা কি সম্ভব? মৌলিক চিন্তা শিক্ষা-সাপেক্ষ, না জন্মগত প্রতিভই তার উৎস? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মতবিরোধ ঘটতে পারে। তবে সর্বজন-গ্রাহ্য একটি উত্তর হয়তো আছে। বিস্ময়কর মৌলিক চিন্তা হয়তো শুধু প্রতিভাবান ব্যক্তিই করতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি মৌলিক চিন্তা বোধ করি সাধারণভাবে সকলেই করতে পারে। আর এই ধরনের মৌলিক চিন্তারও ব্যবহারিক মূল্য কিছু কম নয়। উপরন্তু আমার মনে হয় মোটামুটিভাবে মৌলিক চিন্তা করতে করতে মনের গঠনটি যখন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে পড়বে তখন কারও পক্ষে বিস্ময়কর মৌলিক চিন্তাও হয়তো একদিন সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া চিন্তারও একটা বিজ্ঞান আছে। যে সব মনীষী অদ্যাবধি জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে অমূল্য মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁদের সেই সব চিন্তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে মৌলিক চিন্তার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। সেই সব তথ্যের আলোকে আমরা যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের চিন্তার ধারাটিকে নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে তাদের পক্ষেও মৌলিক চিন্তার, হয়তো বা বিস্ময়কর মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব হবেনা। বর্তমান নিবন্ধে আমরা মৌলিক চিন্তার এই রকম একটা সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো।

কিন্তু তা করবার আগে আমাদের আর একটা কথা ভেবে দেখতে হবে। মৌলিক চিন্তা করার আগে চিন্তা করার অভ্যাস দরকার। দুঃখের বিষয় আমরা চিন্তা করতে যেন ভয় পাই। ছকে বাঁধা দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেই ভালবাসি। জীবনে এতটুকু ছন্দ পতন ঘটলে, অর্থাৎ চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিলেই, বড়ো বেশী বিব্রত হয়ে পড়ি। আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেই রকম। তার জন্য দায়ী তারা নয়, আমরাই। সুরু থেকেই আমরা তাদের চিন্তা-বিমুখ করে তুলছি। আগেই বলেছি শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো মৌলিক চিন্তাশক্তির উন্মেষ সাধন করা। কিন্তু দুঃখের কথা, মৌলিক চিন্তা দূরে থাক, আমাদের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষালাভ করতে এসে চিন্তা করারই প্রয়োজন বোধ করে না। জ্ঞানার্জনের চাইতে পরীক্ষায় পাস করাটাই তাদের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে আমাদেরই দোষে। দুর্ভাগ্য বশতঃ পরীক্ষার পদ্ধতিটাও আমাদের এমনিই যে সেজন্য, শিক্ষণীয় বিষয় বুঝবার কোন দরকারই হয় না; তোতাপাখীর মতো না বুঝে বিষয়টা মুখস্থ করলেই চলে। তাই

বুঝবার জন্য যে মানসিক পরিশ্রম ও অনুশীলনের দরকার সেটা তাদের কাছে নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের মৌলিক চিন্তার অধিকারী করে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথমে তাই তাদের চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কী করে তা করা যায় সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলছি।

চিন্তার উদ্বোধন

[ক] চিন্তার অভ্যাস গোড়া থেকেই গঠন করতে হবে। চিন্তা করাটা যে একটা মজার খেলা, খেলার মতোই আনন্দদায়ক, এই অনুভূতিটা প্রথম থেকেই শিশুর মনে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। আর তা করা একেবারেই কঠিন নয়, কারণ শিশুর মন তো চিন্তা করার জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে। শিশু যা-কিছুর সংস্পর্শে আসে তার সম্বন্ধেই তার অদম্য কৌতূহল। কেন ? কেন ? কেন ?—এই তো শিশুর অবিরাম অক্লান্ত জিজ্ঞাসা। যা-কিছু তার সম্মুখে উপস্থিত হয় তা-ই তো তার কাছে অফুরন্ত সমস্যা নিয়ে আসে। সে আন্তরিক ভাবেই এই সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলে শিশুরা বুঝি বড়োদের চাইতেও বেশী আনন্দিত হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে চিন্তার অভ্যাস গঠন করা তো সহজ। চিন্তা করতে আমরা যদি তাদের ঠিক মতো সাহায্য করি তাহলে চিন্তা করাটা তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা আনন্দদায়ক খেলা হয়ে উঠবে। এজন্য আমাদের কী করতে হবে ? পরম ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং যত্নের সঙ্গে শিশুর প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে। উত্তরটা অবশ্য তার বোধগম্য অথচ যথার্থ হওয়া চাই। উত্তরটা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে পরে তা জেনে নিয়ে শিশুকে জানাতে হবে। নিজের অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টা ঠিক হবে না। কখনোই শিশুর প্রশ্নের প্রতি তাচ্ছিল্য বা ঔদাসীন্য দেখানো চলবে না, আমাদের হাজার অসুবিধা হলেও না। অবশ্যই প্রয়োজন হলে শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তার প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর যেন তাকে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও উৎসাহের অভাব যেন না ঘটে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর চারপাশে অহরহ তার বোধগম্য যে সব ঘটনা ঘটছে, শিশু নিজের থেকে লক্ষ্য না করলেও সেগুলির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তারপর ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এর ফলে শিশুর দৃষ্টি হয়ে উঠবে সমস্যা-সন্ধানী, তার মনে জাগবে সব কিছুকে তলিয়ে দেখবার অদম্য কৌতূহল। সে পরিবেশ

সম্পর্কে অলস ও উদাসীন না থেকে সক্রিয় ও সচেতন হয়ে উঠবে, চিন্তা করতে ভালবাসবে। কেউ কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন। বলতে পারেন—এতটুকু মনের ওপর রাজ্যের চিন্তার বোঝাটি চাপিয়ে দেওয়া কি সঙ্গত হবে? তাঁদের বলবো—চিন্তাটা শিশুর কাছে বোঝা নয়, তার মানসিক পরিপুষ্টির প্রাণরস। তার ক্ষিদে পেলে তাকে খেতে দেওয়াটা যদি সঙ্গত হয়, তাহলে তার জানবার ইচ্ছে হলে তাকে জানতে দেওয়াটাও সঙ্গত। খাদ্য গ্রহণ না করলে যেমন দেহের বৃদ্ধি হয় না, নব নব অভিজ্ঞতা লাভ না করলে, নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন না করলে তেমনি মনেরও পুষ্টি সাধিত হয় না। সুতরাং তার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলা শুধু সঙ্গতই নয়, একান্ত কর্তব্যও।

[খ] শিশুর মনটিকে সব সময়ই সতর্ক ও উন্মুখ রাখতে হবে। চারপাশে কী ঘটছে সেদিকে যেন সে লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ তার পর্যবেক্ষণ শক্তিটি বাড়াতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাকে তার চতুষ্পার্শ্বের বস্তু সামগ্রী ও ঘটনাবলীর সম্বন্ধে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সেই সব বিষয়ে তাকে কিছু বলবার বা লেখবার সুযোগও দেওয়া দরকার। তাছাড়া তার পরিচিত বস্তু সামগ্রী ও ঘটনাবলীর সম্বন্ধে সে যা লক্ষ্য করেনি তাও লক্ষ্য করতে সাহায্য করতে হবে তাকে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। শিশুর মনটিকে সতর্ক ও উন্মুখ রাখতে হবে একথা বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে তার মনটি সর্বদাই বহির্মুখী হয়ে থাকবে। আত্মস্থ হয়ে একাগ্রচিত্তে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে নির্দিষ্ট একটি কাজ করবার ক্ষমতাও তাকে অর্জন করতে হবে বৈকি। আর আমরা সকলেই জানি এই রকম মানসিক অভ্যাস মৌলিক চিন্তার পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য। সুতরাং শিশু সদা-চঞ্চল মন নিয়ে অহরহ অস্থিরতা প্রকাশ করুক এটা একেবারেই আমাদের বক্তব্য নয়। আমাদের বক্তব্য শিশুর মনটি যেন পর্যবেক্ষণ-শীল হয়। যেন পরিবেশ সম্বন্ধে সে কৌতূহলী হয়। যে একাগ্রতার কথা আমরা বললাম তা একদিনে আসবার কথা নয়। তা আসবে ধীরে ধীরে। সে রকম একাগ্রতা সাধনাসাপেক্ষ। শিশুর পক্ষে তেমন একাগ্রতা সত্যিই সম্ভব নয়। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল। তার মনটিকে জোর করে নির্দিষ্ট একটি কাজে দীর্ঘক্ষণের জন্য বাঁধতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাতে তার মনের স্ফূর্তি ব্যাহত হতে পারে। সুতরাং একাগ্রতার শিক্ষা তাকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে দিতে হবে। আর সে শিক্ষা আমরা দিতে পারি প্রধানতঃ দুটি উপায়ে। প্রথমতঃ যে জিনিস সে স্বাভাবিক কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছে তার ওপর একটু বেশীক্ষণ তার মনটিকে কেন্দ্রীভূত করে; আর দ্বিতীয়তঃ

চিন্তা কর্মটির প্রতি তার মনে একটি অনুরাগের সঞ্চার করে। তা করতে পারলে পরে প্রয়োজনের সময় সে নিজেই একাগ্র হয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারবে।

[গ] গল্প বানিয়ে লেখা এবং বলায় শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। তার পরিচিত বিষয়ে রচনা লিখতেও তাকে মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমরা সকলেই জানি গল্প শুনতে শিশু খুবই ভালবাসে। গল্প বলার জন্য শিশু আমাদের প্রায়ই পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু গল্প বানাতে ও বলতেও যে সে ভালবাসে এ খবরটা আমরা অনেকেই রাখিনা। এ বিষয়ে তাকে অনুপ্রাণিত করলে এবং তার বানানো গল্পের প্রশংসা করলে উৎসাহিত হয়ে নিজে নতুন নতুন গল্প রচনা করবে। হয়তো তার গল্প অবাস্তব বা অসম্ভব-ধর্মী হবে, হয়তো বা তার গল্পে অন্যের থেকে শোনা গল্পের অনেক কিছুই উপাদান থাকবে, কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। গল্প শোনার চেয়ে গল্প বানিয়ে লেখা বা বলাটা চিন্তাশক্তিকে বেশী উদ্দীপিত করে এবং এই ভাবেই মৌলিক বা সৃষ্টিশীল চিন্তার বীজটি মনের মাটিতে উপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং শিশুকে গল্প বলা যেমন দরকার, তাকে দিয়ে গল্প বানানোও তেমনি দরকার। রচনা লেখাতেও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে বর্ণনা বা বিশ্লেষণ-ধর্মী রচনার তুলনায় ঘটনা-প্রধান গল্প-কাহিনীর মধ্যে স্বভাবতঃই শিশুমন অধিক আনন্দের সন্ধান পায়। অবশ্য সুরু থেকে যত্ন নিলে শিশুমনে রচনার প্রতি আকর্ষণের সঞ্চার করা সহজ হবে। সমস্ত বিষয়টাই মূলতঃ একটা অভ্যাসের বিষয়।

[ঘ] নিখিলবিশ্ব আদিঅন্তহীন। আমরা শুধু দশটি দিকেরই নাম জানি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় দিকের সংখ্যা অনির্ণেয়। আদিঅন্তহীন যে স্থান বা আকাশ (Space) তার প্রতিটি বিন্দুই একটি বিশিষ্ট দিকের নির্দেশ করে। আমাদের চতুর্দিকে যে অনন্ত আকাশ তার প্রতিটি বিন্দুই একটি বিশিষ্ট দিক। তেমনি আমরা শুধু অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই তিনটি মাত্র কালেরই (Time) নাম জানি। কিন্তু এই অনাদি অনন্ত চির-প্রবহমান কাল-সমুদ্রের প্রত্যেকটি কাল-কণাই একটি বিশিষ্ট কালের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এই অনাদি অনন্ত স্থান-কালের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়, বস্তু বা ঘটনারও অজস্র দিক বা dimension আছে। এই বিষয়টার প্রতি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে। কোন একটা বিষয়ে কিছু বলতে বা লিখতে বললে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই যেন ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তারা যেটুকু মুখস্থ করেছে তার অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক আর কিছুই যেন বলবার বা লিখবার খুঁজে পায় না। চিন্তার এই দৈন্য সত্যিই বড়ো পীড়াদায়ক।

কিন্তু তারা যদি এটুকু জানতো যে. যে-কোন বিষয়েরই অজস্র dimension আছে তাহলে তারা যে-কোন নির্দিষ্ট বিষয়েই অজস্র প্রাসঙ্গিক কথা বলতে পারতো। একটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ধরা যাক 'গাছ' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে বলা হলো। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এই 'গাছ' সম্বন্ধে ভূরিভূরি কথা লেখা যায়। যেমন, গাছের গঠন ও প্রকারভেদের কথা, গাছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যপ্রণালী ও প্রয়োজনীয়তার কথা, বিবর্তনের দৃষ্টিতে গাছের তাৎপর্যের কথা, গাছের গঠন-প্রকৃতির ওপর ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাবের কথা, মানুষের জীবনে গাছের অজস্র প্রয়োজনীয়তার কথা, গাছের সমাবেশে সৃষ্ট অরণ্যানীর কথা, অরণ্যানীর সঙ্গে আরণ্যক পশুপক্ষীর নিবিড় আত্মীয়তার কথা, প্রাচীন ভারতে আরণ্যক সভ্যতার কথা, কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে বৃক্ষাদির বিশিষ্ট ভূমিকাটির কথা, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বনস্পতি ও বনানীর রূপান্তরের কথা; এই রকম আরও কত কত কথাই না লেখা যায়। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যা-কিছুই বলা হোক না কেন তা যেন অবান্তর না হয়ে প্রাসঙ্গিক হয়। জনৈক প্রখ্যাত বাগ্মী কখনোই কোন কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতেন না। যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে বললেই তিনি সে বিষয়ে অনায়াসে অনেক মূল্যবান কথা বলে শ্রোতাদের চমৎকৃত করে দিতেন। একবার তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পরীক্ষা করবার মতলবে /০। অর্থাৎ 'শূন্য' সম্বন্ধে কিছু বলতে তাকে অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'শূন্য' সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন আজও তা সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে। 'শূন্য' সম্বন্ধে তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতার রহস্যটি নিহিত আছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শূন্য সম্বন্ধে চিন্তা করবার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার মধ্যে।

[ঙ] পঠিত বা আলোচিত বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর দিতে গেলে নিছক মুখস্থ করা বিদ্যার ওপর নির্ভর না করে রীতিমত চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নগুলি হবে সমস্যা-মূলক ও চিন্তোদ্দীপক। যেমন, কোন একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু কেমন সরাসরি এই রকম প্রশ্ন না করে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও তাদের পোশাক-আশাকের বর্ণনা করে ও তদঞ্চলের পশুপাখীর বিবরণ দিয়ে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু কেমন হতে পারে সে সম্বন্ধে অনুমান করতে এবং অনুমানের সমর্থনে কী যুক্তি আছে দেখাতে বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার। ছাত্রছাত্রীদের কোনও সমস্যার সম্মুখীন করে সেই সমস্যার সমাধান করবার, অর্থাৎ সে বিষয়ে চিন্তা করবার যথেষ্ট

সুযোগ দিতে হবে তাদের। সমাধানটা তাদের সহজে বলে দেওয়া চলবে না। তাদের নিজেদেরই চিন্তা করে সমাধান আবিষ্কার করতে হবে।

চিন্তার অভ্যাস কীভাবে গঠন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনাকে আর দীর্ঘতর না করে চিন্তায় মৌলিকতার উন্মেষ সাধন করা যায় কেমন করে সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলছি।

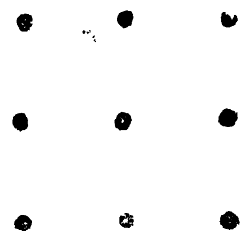
মৌলিক চিন্তার উদ্বোধন

[ক] প্রদত্ত পরিস্থিতি বা সমস্যার অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তার সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে মূল্যবান মৌলিক চিন্তার প্রমাণ দিয়েছেন। Gauss যখন মাত্র ছ'বছরের শিশু তখন তিনি তাঁর শ্রেণী শিক্ষককে একদিন অবাক করে দিয়েছিলেন। "১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০=কত?"—এই প্রশ্নটি করে শিক্ষক মশাই সকল ছাত্রকে উদ্বুদ্ধ করলেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে। সকলে যখন অংক কষায় ব্যস্ত, Gauss তখন অসম্ভব রকমের তৎপরতার সঙ্গে বলে উঠলেন—৫৫। বিস্মিত শিক্ষক জানতে চাইলেন এত শীগগির এই ছাত্রটি উত্তরটা পেলো কী করে। উত্তরে Gauss বললেন,—"কেন? ১+১০=১১; ২+৯=১১; ৩+৮=১১; এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় সাজালে প্রত্যেকটি জোড়ার যোগফল দেখছি ১১ হচ্ছে। যেহেতু দশটি, অর্থাৎ পাঁচ জোড়া, রাশি আছে সেই হেতু তাদের সবগুলির সমষ্টি হবে ১১×৫=৫৫।"

Gauss এত অল্প বয়সেই যে অদ্ভুত বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সকলের কাছে আশা করা যায় না। তবে এইরকম ক্ষমতা যাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তার জন্য শিক্ষা তাদের গোড়া থেকেই এবং সুযোগ পেলেই দিতে হবে। যেমন সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শেখাবার সময়ও আমরা ছেলেমেয়েদের মনকে বিশ্লেষণমুখী করে তুলতে পারি। গুণ যে সংক্ষিপ্ত যোগ এটা আমরা তাদের বোঝাতে পারি। তিনবার সাত যোগ করা আর সাতকে তিন দিয়ে গুণ করা যে একই ব্যাপার (৭+৭+৭=৭×৩ সহজেই, প্রয়োজন হলে সামান্য সামগ্রীর সাহায্যেই, এই মৌলিক সত্যটা তাদের বুঝিয়ে দিতে পারি। যোগ ও গুণের মধ্যে এবং তেমনিভাবে বিয়োগ ও ভাগের মধ্যে এই যে অচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক আছে সেটা না জেনে অনেক শিশুই এই প্রক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করে। আবার, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

করার পর উত্তরটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা যদি শিশ‍ুকে পরখ করে দেখবার শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে সে এই মৌলিক প্রক্রিয়াগ‍ুলির পারস্পরিক সম্বন্ধটা অন‍ুধাবন করতে পারবে এবং তার মধ্যে একটা অন্তদ‍ৃষ্টির উন্মেষ ঘটবে। যেমন ৭ থেকে ২ বিয়োগ করে ৫ পাওয়া গেল। উত্তরটা ঠিক হলো কিনা শিশ‍ু কীকরে তা নির্ধারিণ করবে? ৫-এর সঙ্গে ২ যোগ করে যদি ৭ হয়, অথবা ৭ থেকে ৫ বিয়োগ করলে যদি ২ হয় তাহলেই ব‍ুঝতে হবে উত্তরটা ঠিক হয়েছে। এই পরখ করবার পদ্ধতিগ‍ুলির সঙ্গে ম‍ূল অংকটার অভিন্নতা শিশ‍ুকে ব‍ুঝিয়ে দিতে হবে— অর্থাৎ ম‍ূলতঃ তিনটি অংকের তাৎপর্য যে একই সেটা ব‍ুঝতে তাকে সাহায্য করতে হবে।

(খ) অনেক সময় চিন্তা একটা নির্দিষ্ট পথেই আবর্তিত হবার ফলে সমস্যার সমাধান খ‍ুঁজে পাওয়া যায় না। চিন্তাকে এই আড়ষ্টতা ও আবদ্ধতা থেকে ম‍ুক্তি দিতে পারলে সমস্যার সমাধানে মৌলিকতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়।

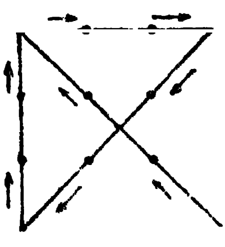


১নং চিত্র

যেমন, বলা হলো—পাশে যে নয়টি বিন্দ‍ু রয়েছে একটি বারের জন্যও পেন্সিল বা কলম না তুলে এমনভাবে রেখা টানো যেন প্রতিটি বিন্দ‍ুকেই অংকিত রেখাটি স্পর্শ করে।

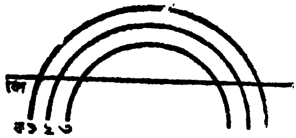
এক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করেন (অধিকাংশ লোকই তাই মনে করবেন) যে, বিন্দ‍ু দ্বারা বেষ্টিত বর্গক্ষেত্রের মধ্যেই রেখাগ‍ুলিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তাহলে কাজটা তিনি কিছ‍ুতেই করতে পারবেন না।

কিন্তু এমন তো কোন নির্দেশ দেওয়া নেই যে অঙ্কিত রেখাগ‍ুলি বিন্দ‍ুবেষ্টিত স্থানের বাইরে যেতে পারবে না। যাঁর চিন্তায় আড়ষ্টতা নেই তিনি একথাটা সহজেই ব‍ুঝতে পারবেন এবং পাশে যে রকম দেখানো হয়েছে তেমনি বা এই রকম আর কোনও ভাবে সমস্যাটির সমাধান করে দেবেন।



২ নং চিত্র

আবার যদি বলা হয়—তিনটি কঞ্চিকে এক কোপে নয়টি টুকরোয় ভাগ কর, আর কেউ যদি মনে করেন কঞ্চিগুলোকে সোজা অবস্থায় রেখেই কাজটি করতে হবে তাহলে কাজটা সম্ভব হবে না। কিন্তু সমস্যাটির মধ্যে কোথাও এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, কঞ্চিগুলোকে সোজা করে রাখতেই হবে। তাই চিন্তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে যদি মুক্তি দেওয়া যায় তহেলে সমাধানটা সহজ হবে। পাশের চিত্রে যে রকম করে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে বাঁকিয়ে ধরলে এক কোপেই তিনটি কঞ্চি নয়টি টুকরোয় ভাগ হয়ে যাবে।



৩ নং চিত্র

চিন্তার এইরকম বিমুক্তি বা স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কলাম্বাস সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কাহিনীরও উল্লেখ করতে পারি। কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে দেশে ফিরে এসেছেন। এই বিরাট আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে দেশবাসী তাঁর অপূর্ব কীর্তির গুণগানে পঞ্চমুখ। কিন্তু কলাম্বাসের কয়েক জন বন্ধু তাঁর এই প্রশংসা সহ্য করতে না পেরে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা দল বেঁধে এলেন কলাম্বাসের বাড়ি। সমস্বরে বললেন, তুমি এমন কী আর করেছো? তুমি তো একটা নতুন দেশ সৃষ্টি করনি। আমেরিকা দেশটা বহু যুগ ধরেই আছে। তুমি দৈবাং সে দেশটায় গিয়ে পড়েছো বৈতো নয়। সুতরাং তোমার কৃতিত্ব কোথায়? কলাম্বাস চুপ করে বন্ধুদের কথা শুনলেন। তারপর তাঁদের সামনে একটা ডিম এনে বললেন—বন্ধুগণ, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমরা এই ডিমটাকে টেবিলের ওপর সোজাভাবে বসাও তো দেখি। বন্ধুগণ একে একে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। পরে বললেন—কলাম্বাস, তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছো, নইলে এরকম অসম্ভব প্রস্তাব কেউ করে? কলাম্বাস মৃদু হেসে টেবিলের ওপর ডিমটার একটা প্রান্ত অল্প একটু ঠুকে দিলেন। ফলে সেই প্রান্তটা সামান্য থেংলে গেল। এখন তিনি সহজেই ডিমটাকে টেবিলের ওপর সোজাভাবে বসাতে পারলেন। তাই দেখে বন্ধুগণ তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠলেন—এ আর এমন কী, আমরাও পারতুম। কলাম্বাস বললেন—পারতে বটে, কিন্তু পারোনি তো! আমি তোমাদের বলেছিলুম সোজাভাবে ডিমটাকে বসাতে, এক দিক থেংলে দিয়ে বসাতে তো বারণ করিনি। সেই রকম আমেরিকা আবিষ্কার করা হয়তো একটা সহজ কাজ। কিন্তু এই সহজ কাজটা তো আর কেউ করেনি,

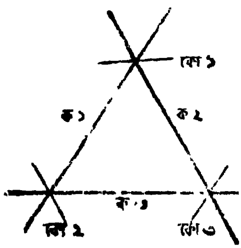
আমিই করেছি। সুতরাং কৃতিত্বটা যে আমারই তাতে সন্দেহ কী? এই কাহিনীর মধ্যে কলাম্বাসের চিন্তাধারায় যে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সেটা মূলতঃ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতা ও অনাড়ষ্টতার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। শিশুর চিন্তা যাতে ব্যাপক ও স্বচ্ছন্দ হতে পারে সেজন্য গোড়া থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। একই সমস্যাকে যাতে সে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে পারে সেই মতো শিক্ষা দিতে হবে তাকে। চিন্তাধারা ভুল পথে ধাবিত হয়ে কখনো যদি আটকে পড়ে তাহলে ভুলটা তাকে ধরিয়ে দিতে হবে এবং ঠিক পথে যাতে সে চিন্তা করতে শেখে তা দেখতে হবে। আমরা দেখতে পাই অনেক বুদ্ধিমান ছেলে মেয়েও অনেক সময় সহজ অঙ্ক কষতে পারছে না। তার কারণ ঠিক ঠিক পথে তার চিন্তা ধাবিত না হয়ে ভুল পথে চিন্তা করতে করতে সে সহজ সমস্যাটাকে জটিল করে তুলেছে।

[গ] কোন একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একটি দৃষ্টিকোণ অনুপযোগী প্রমাণিত হবার পর বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি বিচার করে অনেকেই সার্থক মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন কোপার্নিকাসের চিন্তাধারা। সাধারণ লোকের মতো বৈজ্ঞানিকগণও পূর্বে বিশ্বাস করতেন পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারপাশে ঘোরে। কিন্তু এই তত্ত্ব দিয়ে সৌরজগতের অনেক ঘটনাকেই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা গেল না। কোপার্নিকাস তখন মনে করলেন—বেশ তো, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না ভেবে যদি ভাবা যায় পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, তাহলে কী হয়? এই অনুমানের ভিত্তিতে তিনি সৌরজগতের ঘটনাবলী বিচার করতে সুরু করলেন এবং দেখতে পেলেন অনুমানটি যথার্থ ও যথেষ্ট। তেমনি নিউটন ভাবলেন—ফল আপনা থেকে ভূতলে নেমে আসছে না ভেবে যদি ভূতল তার দিকে ফলকে টানছে ভাবি তাহলে কী হয়? এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করতে করতে নিউটন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ধারণাটি গড়ে তুললেন। মনোবিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডও সেই রকম চেতন মনের সাহায্যে মানুষের অনেক আচরণের ব্যাখ্যা করতে না পেরে অচেতন মনের ধারণা করলেন এবং দেখলেন ধারণাটি পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। বিপরীত দিক থেকে একই জিনিসকে দেখবার শিক্ষা ছোটখাটো ব্যাপারেও আমরা শিশুকে দিতে পারি। যেমন, ধরা যাক শিশুকে ৯ × ৫ = কত? এই অঙ্কটি কষতে দেওয়া হলো। সাধারণ ভাবে এরকম ক্ষেত্রে তাকে পরের সংখ্যাটা দিয়ে আগের সংখ্যাটাকে গুণ করতে শেখানো হয়। কিন্তু শিশুটিকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে ৫-এর নামতা ধরে ৯ পর্যন্ত ডেকে গেলে যা পাওয়া যাবে, ৯-এর নামতা ধরে ৫ পর্যন্ত ডেকে গেলেও তাই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ

৯-কে ৫ দিয়ে গুণ করা যা, ৫-কে ৯ দিয়ে গুণ করাও তাই, তাহলে সে যে শুধু নির্ভুল উত্তরটাই পাবে তাই নয়, অল্প শ্রমে অল্প সময়েই সে অংকটা কষতে পারবে। তাছাড়া নানাভাবে এবং বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এই রকম শিক্ষা দিলে পরবর্তীকালে যে কোন সমস্যাকেই দুটি বিপরীত দিক থেকে বিচার করে দেখবার প্রবণতা তার মধ্যে জন্মলাভ করবে।

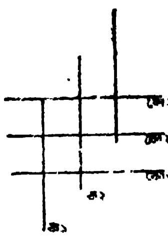
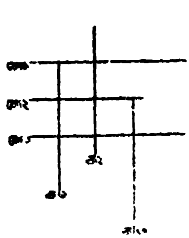
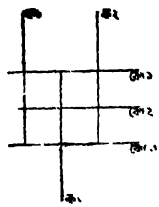
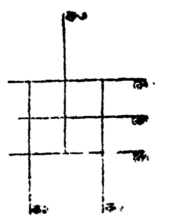
[ঘ] সমস্যার অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নানাভাবে সন্নিবিষ্ট করতে করতে অনেক সময় সমাধানের বিভিন্ন মৌলিক পন্থা খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—

সমস্যা—তিনটি কাঠিকে তিন কোণে নয় ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যিনি সমস্যাটির উত্থাপন করেছিলেন, সমাধানস্বরূপ পাশের চিত্রটি এঁকে দেখালেন।



৪ নং

কিন্তু যাঁর কাছে সমস্যাটি তুলে ধরা হলো তাঁর মনে হলো—এটাই কি সমাধানের একমাত্র উপায়? আর কি কোন উপায় নেই? নানাভাবে কাঠিগুলিকে তিনি সাজিয়ে সাজিয়ে দেখলেন আরও অনেক উপায়েই (নীচের চিত্রগুলি) এই সমস্যাটার সমাধান করা সম্ভব।

৫নং চিত্র ৬নং চিত্র ৭নং চিত্র ৮নং চিত্র

বলতে কী, প্রদত্ত বস্তুগুলিকে নানাভাবে সাজাতে সাজাতেই বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, পরীক্ষাগারে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে বিবিধ সম্ভাব্য সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ঘটিয়ে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন এত পরিমাণ একটি গ্যাসের সঙ্গে এত পরিমাণ আর একটি (বা একাধিক) গ্যাস মেশালে অমুক রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সামগ্রীকে নানান ছাঁদে সাজিয়ে নতুন

নতুন জিনিস তৈরী করার কাজে শিশুকে অনুপ্রাণিত করলে সে যে শুধু খেলার আনন্দ পাবে তাই নয়, কতকগুলি সামগ্রী দেওয়া থাকলে তাদের নতুন নতুন ভাবে সমাবিষ্ট করে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করবার একটি প্রবণতাও তার মধ্যে গড়ে উঠবে। এই ধরনের অনেক রকম খেলার কথা আমরা সকলেই জানি। যেমন কাঠি দিয়ে বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ তৈরী করা, খণ্ডিত চিত্রের অংশগুলিকে ঠিক ঠিক মতো জোড়া দিয়ে পূর্ণ চিত্র রচনা করা ; নানান রঙের কাঠের টুকরো সাজিয়ে নানাবিধ নক্সা তৈরী করা ; বিভিন্ন অংশের সংযোগে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা ; কাঠের টুকরো দিয়ে ঘরবাড়ি, সাঁকো ইত্যাদি নির্মাণ করা ; কয়েকটি প্রদত্ত অক্ষরের সাহায্যে যত বেশী সম্ভব শব্দ গঠন করা, কতকগুলি নির্দিষ্ট রঙের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই ধরনের নক্সা রঙ্ করা, ইত্যাদি। পারদর্শী শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই সমস্যা সমাধান করার জন্যে নানাভাবেই তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে পারেন।

[ঙ] বিস্ময়কর মৌলিক চিন্তার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা প্রচণ্ড গরজ বা তাগিদ থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই গরজ বা তাগিদটা আসে পারিপার্শ্বিক কারণে, কখনো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মন থেকেই। আর্কিমিডিসের কথা আমরা সকলেই জানি। রাজা একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়েছিলেন যার মধ্যে বিজ্ঞানীকে সমস্যার সমাধান করে দিতেই হবে। তাই সমাধানটি খুঁজে পাবার জন্য তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি উন্নত দেশের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট প্রতিযোগিতা চলেছে কে আগে মহাকাশের রহস্য উন্মোচন করবে তাই নিয়ে। এই প্রতিযোগিতার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র বলেই উভয় দেশের বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিশেষ একটি সভা বা গুণীসমাবেশে আপন মৌলিকতা প্রতিপন্ন করবার তাগিদেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অকস্মাৎ যেন তাঁর সিদ্ধান্তটি খুঁজে পেয়েছেন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, মর্যাদা হারাবার ভয়, সৃষ্টির আনন্দ, সৃষ্টি না করতে পারার বেদনা ইত্যাদি অনুভূতি থেকে ব্যক্তি মৌলিক চিন্তার গরজ বা তাগিদ বোধ করেন। এই বোধ যত প্রবল হয় মৌলিক চিন্তার উদ্ভাস হয় ততই ত্বরান্বিত। দৈনন্দিন জীবনেও একই জিনিস আমরা ঘটতে দেখি। আমাদের মরণ-বাঁচনের সঙ্গে জড়িত এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে মরিয়া হয়ে আমরা তার সমাধানের সন্ধান করি এবং সহজে সেটা পেয়েও যাই ; কিন্তু সমাধানের জন্য আন্তরিক তাগিদ না থাকলে তার নাগাল পেতে বেশ বিলম্ব হয়।

সৃজন-মূলক কাজে শিশু যাতে এই রকম গরজ বা তাগিদ বোধ করতে

পারে আমাদের সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রশংসা, পুরস্কার, সম্মান ইত্যাদি অর্জনে তাকে উদ্বুদ্ধ করে মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গঠনমূলক কোন কাজ তাকে দিয়ে করাতে পারলে তার মানসিক কাঠামোটি ধীরে ধীরে সৃজনশীল চিন্তার উপযোগী হয়ে উঠবে।

তাগিদ বোধ না থাকলে সৃষ্টির সম্ভাবনা যেমন সুদূর পরাহত, তেমনি আবার হন্তদন্ত হয়ে এই মুহূর্তেই একটা কিছু করে ফেলবো এরকম আশা করাটাও ভুল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মৌলিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে সমস্যাটি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করবার বেশ কিছু পরে। মনোবিদগণ বলেন কোন সমস্যার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করলে অবচেতন মন তার সমাধানের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। চেতন মনে সমস্যাটি সুস্পষ্টভাবে আর না থাকলেও এবং নানা কারণে চেতন মন বিক্ষিপ্ত থাকলেও অবচেতন মন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রচণ্ড জেদের সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করে চলে। অবচেতন মন সমাধানটি খুঁজে পেলে চেতন মনে অকস্মাৎ তার উদ্ভাস ঘটে। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, যে সমস্যার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে আমরা রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ি সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই তার সমাধানটা আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যেও অনুরূপ ঘটনা আমরা ঘটতে দেখি। সরস মাটিতে বীজ পুঁতে দিলেই চারা গজায় না। বীজের ভেতর লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে সুরু করে। তারপর একদিন হঠাৎ দেখা যায় বীজের ঢাকনা খুলে উদ্ভিদ-শিশু বহির্বিশ্বে উঁকি মারছে। তেমনি পাখী ডিম পাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভেতর থেকে ছানা বেরিয়ে আসে না। মা-পাখী ডিমের ওপর বসে তাতে তা দেয়। তা দেবার সময় ডিমের ভেতর বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় ডিমের খোলা ভেঙে ভেতর থেকে তুলোর মতো তুলতুলে ছানা আসে বেরিয়ে। মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এই রকম। সমস্যাটির ওপর অবচেতন মন যেন তা দিয়ে চলে ; ফলে এক সময় সমাধানটির উদ্গম ঘটে। তাই সমস্যার উপলব্ধি আর সমাধানের উদ্ভাসের অন্তর্বর্তী সময়টাকে মনোবিদগণ 'উদ্গম-কাল' (incubation period) বলে থাকেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে নষ্ট বীজ বা ডিম থেকে, অর্থাৎ যে বীজ বা ডিমের মধ্যে প্রাণস্ফুরণের সক্রিয় প্রয়াস নেই তা থেকে, যেমন সন্তানের উদ্ভব হয় না, সেই রকম যে সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তির মনে সক্রিয় তাগিদ বা গরজ নেই যথেষ্ট কালক্ষেপ করলেও তার সমাধান পাওয়া যাবে না। আসলে তাগিদ বা গরজটাই হলো সব চেয়ে বড়ো কথা। অনেক সময় সময়ের সীমা বেঁধে দিলে এই রকম তাগিদ বোধের সৃষ্টি হয়।

শিশুর মনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে হলে তাই তার মনে তাগিদ বোধের সঞ্চার করতে হবে এবং দেখতে হবে তার জন্য সময়ের যে সীমাটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে সেটা যেন 'উদ্গম-কাল' রূপে ব্যবহৃত হবার পক্ষে পরিমিত হয়।

[চ] অনেক কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু আমরা অনেক কিছুই করতে পারিনা, তার কারণ করবার প্রেরণা পাইনা বলে! না করতে করতে করবার ক্ষমতাটাও ভোঁতা হয়ে যায়। তাই শিশুর মনটিকে মৌলিক চিন্তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে প্রথম থেকেই তার মনে আবিষ্কারের প্রেরণা জাগাতে হবে, রহস্য উদ্ঘাটনের উদগ্র কামনার সঞ্চার করে দিতে হবে তার মনে, তার মানস সত্তাটিকে জ্বলন্ত প্রেরণায় প্রোজ্জ্বল করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তাকে যথোপযুক্ত সমস্যার সম্মুখীন করায় যে রকম কাজ হবে, সেই রকম কাজ হবে তাকে প্রাঞ্জল ও সরল ভাবে লেখা বিচিত্র আবিষ্কার কাহিনী পড়তে দিলে বা এই সব কাহিনী তাকে নিয়মিত শোনালে।

কীভাবে শিশু-মনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ সাধন করা যায় সে বিষয়ে কয়েকটি মাত্র পদ্ধতির আলোচনা করলাম। নিশ্চয়ই আরও অনেক পদ্ধতি আছে। মৌলিক চিন্তার অধিকারী মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আরও অনেক পদ্ধতি নিজেরাই আবিষ্কার করতে পারবেন।

শৈশব-দর্শন

সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস করি শিশুর কোন রকম দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না। আমাদের কাছে দর্শনের অর্থ বিজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিভিন্ন চিন্তাধারার সুসম্বন্ধ সমন্বয়। শিশুদের অভিজ্ঞতা নিতান্তই কম; তাই তাদের যে কোন দর্শন আছে, এ কথাটা আমরা সহজে মানিনা। কিন্তু শিশুরা প্রায়ই কথায় বার্তায় নানান প্রাকৃতিক ঘটনা, বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি ও মনের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে সব অভিমত প্রকাশ করে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদেরও একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে. তাদেরও চিন্তাধারা বিশেষ একটা পথ বেয়ে চলে। শিশুর বিশেষ চিন্তাধারারই নাম শৈশব-দর্শন।

প্রথমতঃ দেখা যায় শিশু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ খুবই ধীর গতিতে জাগরিত হয়। প্রথমে সে অন্যান্য ব্যক্তি অথবা বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। তাই তার আপন মনের অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনা তার কাছে বহির্জগতের সামগ্রী বলে মনে হয়। ছোটো ছোটো শিশুরা মনে করে চিন্তা এক রকম স্থূল দৈহিক ক্রিয়া মাত্র। চিন্তা আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন তফাৎ তারা বুঝতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে মুখ ও জিভের সাহায্যে আমরা চিন্তা করি। সাত থেকে দশ বছর বয়সের শিশুরা অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরই মতো মনে করে মাথার সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি। তবে তাদের বিশ্বাস মাথার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরের সাহায্যে চিন্তা করা হয়। কেউ কেউ বলে চিন্তাকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, কিন্তু যখন সে মুখের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন আঙুল দিয়ে তাকে ছোঁয়া যায়। চিন্তার আবাসভূমি দেহের মধ্যে একথা বিশ্বাস করলেও বহির্জগতের বস্তু থেকে চিন্তাকে তারা পৃথক্ করে ভাবতে পারে না। অনেক শিশুর ধারণা, যে বাতাস গাছে পাতায় মর্মর জাগায় আমাদের চিন্তারাশি সেই বাতাস দিয়ে তৈরী।

স্বপ্ন সম্বন্ধেও শিশুদের ধারণা অদ্ভুত। কেউ মনে করে রাত্তির বেলায় স্বপ্নের দল বাইরে থেকে এসে তার বিছানার চারপাশে পত্‌পত্‌ করে ঘুরে বেড়ায়। কারো বা ধারণা স্বপ্নগুলি ছোট ছোট ছবি, কিংবা ঝলমলে আলো। চাঁদা মামা, মেঘ, সুর্জি, বাতাস অথবা রাস্তার পাশে যে সব আলোক স্তম্ভ আছে তারাই রাত্তির হলে স্বপ্নদের চারিদিকে পাঠিয়ে দেয়। কোন একটা বিশেষ ঘরে অনেক সময় শিশুরা শুতে চায় না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—এ ঘরে স্বপ্ন

থাকে। একটু বড় হলে তারা মনে করে স্বপ্ন বাইরে নয়, তাদের নিজেদের মাথার ভেতরেই থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়লে বাইরে বেরিয়ে আসে, আবার জেগে উঠলেই মাথার ভেতর ঢুকে পড়ে। দশ এগারো বছর বয়েস হলে শিশুরা স্বপ্নের অলীকতা বুঝতে শেখে।

কোন বস্তু বা বিষয়ের নাম সম্বন্ধেও ছোটদের ধারণা অদ্ভুত। তারা মনে করে নামটা বস্তু বা বিষয়ের একটা নিজস্ব গুণ। সূর্যকে যেমন উজ্জ্বল গোলাকার একটা জিনিস ছাড়া আর কোন রকমেই ভাবা যায় না, সেই রকম তাকে 'সূর্যি' ছাড়া আর কোন নামও দেওয়া যায় না। নামটা বস্তুর একটা অপরিহার্য গুণ, নাম ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। শিশুদের ধারণা বস্তুটি তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা নামকরণ হয়ে গেছে এবং সে নামের রদ-বদল অসম্ভব।

আর একটা বিষয়েও শিশুদের চিন্তাধারাটা বেশ একটু অভিনব। সেটা হল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতির গতিবিধি। শিশুরা যখন পথ দিয়ে চলে তখন দেখে এই সব নৈসর্গিক বস্তুগুলিও যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে সুরু করেছে। ছোট ছোট শিশুরা মনে করে তারাই তাদের যাদুশক্তি দিয়ে এই সব বস্তুকে গতিশীল করে দেয়। নিজেদের এই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ভেবে তারা আনন্দে ও গর্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন একটু বড় হয়, তখন তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। তারা ক্রমে ক্রমে তাদের এই শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে, নৈসর্গিক বস্তুগুলিকেই জীবন্ত ও গতিশীল বলে ভাবতে সুরু করে। তারা মনে করে সূর্য চন্দ্র যখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তখন আপন খেয়ালেই চলে, তাদের আদেশে চলেনা।

জীবন ও চেতনা সম্বন্ধেও শিশুর ধারণা বিচিত্র। প্রথম প্রথম যে বস্তু কাজ করে এবং যার প্রয়োজনীয়তা আছে শিশু শুধু তাকেই প্রাণবন্ত ও চেতন বলে মনে করে। সূর্য আলো দেয়, মেঘ জল দেয়, বাতাস চলাচল করে আরাম দেয়, নদী বুকে করে ডিঙি বয়ে নিয়ে যায়। প্রায় সবকিছুই কিছু না কিছু কাজ করে এবং মানুষের কোন না কোন কাজে লাগে। তাই শিশুর মনে হয় বিশ্ব জগতে সব কিছুরই প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। ছ' সাত বছর বয়েস হলে জীবন সম্বন্ধে শিশুর ধারণা একটু বদলে যায়। সব কিছুকে সে আর তখন জীবন্ত মনে করে না। যে সব বস্তুর নড়াচড়া করার ক্ষমতা আছে শিশুর মতে শুধু তারাই প্রাণ ও চেতনার অধিকারী। সূর্য, চন্দ্র আকাশের ওপর ঘুরে বেড়ায়। বাতাস চারিপাশে দাপাদাপি করে। গাছের ঝরা পাতা, আকাশের হালকা মেঘ দিকে দিকে অভিযান করে। তাই সেগুলি সজীব ও সচেতন। কিন্তু

ঘর-বাড়ি, মাঠ, পাহাড় যাদের চলাচলের ক্ষমতা নেই, শিশুর দর্শনে তারা নির্জীব নিশ্চেতন। আট দশ বছর বয়েস হলে শিশু জীবনের গণ্ডিকে আরও একটু সংকীর্ণ করে ভাবতে শেখে। গতিশীল বস্তুমাত্রকেই সে আর প্রাণবন্ত মনে করে না। শুধু যে বস্তুর নিজস্ব গতি আছে, তাকেই সে সজীব ভাবে। তাই বাতাস সজীব, কিন্তু মেঘ নির্জীব, কারণ মেঘ নিজে চলে না, বাতাস তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এই কারণেই নদী জীবন্ত, কিন্তু ডিঙি জড়। নদী নিজে চলে, ডিঙি চলে জলের টানে। প্রায় এগারো বছর যখন তার বয়েস, তখন শিশু কেবলমাত্র জীবজন্তু ও গাছপালাকেই, এমন কি শুধু জীবজন্তুকেই প্রাণ ও চৈতন্যের অধিকারী মনে করে, বাকী যা কিছু সবই তার কাছে জড় জগতের অধিবাসী হয়ে পড়ে। বিশ্বজগৎ জীব এবং জড় এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধেও শিশুদের ধারণা বেশ কৌতুকপ্রদ। সাত আট বছরের শিশু প্রকৃতিকে মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করে। তার বিশ্বাস কোন এক সময়ে কোন একজন মানুষ একটা জ্বলন্ত গোলক তৈরী করে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেই গোলকটাই সূর্য। মাটি কেটে মানুষ খাল তৈরী করেছে। তারপর তার ভেতর জল ঢেলে নদী, পুকুর, ঝিল, বিলের সৃষ্টি করেছে। মাটির পর মাটি চাপিয়ে পাহাড় পর্বত তৈরী করেছে। মাটিকে জমাট করে পাথর গড়েছে। পাথর ভেঙে মাটি করেছে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শিশুর এই রকম ধারণা সত্ত্বেও প্রকৃতিকে জীবন্ত মনে করা শিশুর পক্ষে কষ্টকর হয় না। মানুষ যে সূর্য সৃষ্টি করেছে সেই সূর্যই শিশুকে অনুসরণ করে। মানুষের গড়া পাহাড় দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। দোকানী বীজ তৈরী করে পাতা এবং ফুলের জন্য তার ভেতর লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রঙ ভরে দেয়, কিন্তু সেই বীজ থেকে নিজে নিজেই অংকুরোদ্গম হয়, পাতা গজায়, ফুল ফোটে, ফল ধরে। শিশুর এই সব ধারণার পেছনে আছে তার বৈশিষ্ট্য। অল্পবয়স্ক শিশু অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। তার বিশ্বাস যা-কিছু আছে সব তারই সুখের জন্য। এই মনোভাব থেকেই সে ভেবে নেয় বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের জন্যই তৈরী হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মাতাপিতার শক্তির ওপর শিশুর অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের সে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বলেই মনে করে। তার চিন্তার এই বিশিষ্ঠতাই মানুষকে প্রকৃতির স্রষ্টা বলে তাকে ভাবতে শেখায়। শিশু ক্রমে ক্রমে যত বড় হতে থাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধে তার ধারণা ততই বাস্তব হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি ভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটে।

বিশ্বজগতের সব কিছুই মনকে আকর্ষণ করে। শিশু যা কিছুর সংস্পর্শে আসে তাকেই বুঝবার চেষ্টা করে এবং তার সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলে। সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে শিশুর ধারণা আলোচনা করা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয় বলেই কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান বিষয়েরই উল্লেখ করেছি। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সাহায্যে যে কেউ শৈশব সম্বন্ধে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন। এজন্যে তাঁদের শুধু শিশুমন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে হবে আর দৃষ্টিভঙ্গীটিকে করতে হবে স্বচ্ছ এবং সংস্কার মুক্ত।

শিশু-সাহিত্য

সাহিত্যের সার্থকতা যাচাই করবার কষ্টিপাথরটা কী সে বিষয়ে ভিন্ন জনের ভিন্ন মত থাকাই স্বাভাবিক। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে সাহিত্য সৃষ্টি তখনই সার্থক হয় যখন নাকি সেই সাহিত্য পাঠককে সামাজিক ও নীতিপরায়ণ হতে উব্দুদ্ধ করে। বিপক্ষশ্রেণীর সমালোচকেরা মনে করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য আর যাই হোক অন্ততঃ নীতিশিক্ষা বিতরণ করা নয়—তার জন্য আছে নানাবিধ ধর্মপুস্তক, বিবিধ নীতিগ্রন্থ। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন, সেটা কখনো পূর্ণ হতে পারে না যদি না সে সাহিত্য যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে তাদের সমগ্র চিত্তটিকে বিষয়বস্তুটির প্রতি উন্মুখ করে তুলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যের পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে।" মোট কথা, সাহিত্যের উদ্দেশ্যটি সফল হবার আগে রচনাটি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হওয়া দরকার। শিশু-সাহিত্যের সার্থকতা তাই নির্ভর করছে শিশু-মনে তার প্রভাবের পরিধি ও গভীরতা কী রকম তার ওপর।

অত্যন্ত দুঃখের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু-সাহিত্যের বিচারক—যাঁরা বয়স্ক তাঁরা, শিশুরা নয়। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই আমাদের যা ভালো লাগে শিশুর সেটা ভালো নাও লাগতে পারে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আমাদের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, আমাদের নানারকম সংস্কার যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটাকে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বভাবতঃই পৃথক করে রেখেছে একথাটা আমাদের মনে থাকে না। আমার মনে হয় এই অনধিকার চর্চার স্পৃহাটি সম্বরণ করতে হবে আমাদের। শিশু-সাহিত্যের হৃদয়গ্রাহিতার বিচার করবার ভার দিতে হবে শিশুকেই। শিশুর কোন্ বইটা ভালো লাগে, কোন্টা লাগে না, কেন লাগে বা লাগে না, সে সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে শিশুর মতামতের ভিত্তিতে।

শিশু মনের ওপর সাহিত্যের প্রভাবটাই যদি বড়ো কথা হয়, তাহলে যিনি সার্থক শিশু-সাহিত্যিক হতে চাইবেন তাঁকে শিশু-মনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হবে। তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসতে হবে শিশুদের। অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশতে হবে তাদের সঙ্গে। শিশু-মনস্তাত্ত্বিকেরা সুদীর্ঘ গবেষণার পর শিশু-মন সম্বন্ধে যে সব মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলি যত্নের সঙ্গে পাঠ করলেও তিনি সে সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্থ, বলিষ্ঠ অথচ বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

শিশু-সাহিত্যের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকতে পারে। যে কোন একটি

সাহিত্য সকল শিশুকেই সমানভাবে মুগ্ধ করে না। শিশুর বয়েস ও তার মানসিক পুষ্টির সঙ্গে সাহিত্যের ভাষা, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনের ভঙ্গীটির যদি সামঞ্জস্য থাকে তবেই সে সাহিত্য শিশুর মনের ওপর গভীর ভাবে রেখাপাত করতে পারবে।

শিশু-মনস্তাত্ত্বিকেরা লক্ষ্য করেছেন, তিন বছর বয়েস থেকে আরম্ভ করে শিশুর মনে সমাজের প্রভাব প্রবলতর হতে থাকে। তার দৃষ্টি জড়বস্তুর তুলনায় জীবজন্তু, বিশেষতঃ মানুষ এবং মানুষের আচার আচরণের প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট হয়। অন্যের কামনা বাসনা, আবেগ অনুভূতিকে সে নিজের মধ্যে আরোপ করে নিজের মতো করে অনুভব করে। তাই মনে হয় শিশু-সাহিত্যের এই স্তরে মানুষ এবং অপরাপর প্রাণী বিষয়ক আলোচনা থাকতে পারে।

শিশু স্বভাবতঃই কর্মচঞ্চল। তার প্রকৃতিগত প্রেরণাগুলি ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হয়ে তাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। কর্মের প্রতি, গতিশীলতার প্রতি শিশুর যে আকর্ষণ তার পরিচয় তার ভাষা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়। প্রাথমিক স্তরে শিশুর ভাষায় বিশেষ্য পদের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু বয়স্কদের অভিধান অনুযায়ী বিশেষ্য পদ হলেও শিশুর অভিধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি ক্রিয়াপদের মতোই কাজ করে, কারণ একটি মাত্র বিশেষ্য পদ অনেক সময় শিশুর একটি পূর্ণ অভিপ্রায়কেই প্রকাশ করে থাকে। যেমন, 'জল' এই শব্দটির সাহায্যে শিশু হয়তো বলতে চায়, 'আমাকে জল দাও' কিংবা 'আমি জল খাব না'। শিশুমনের এই দিকটির কথা ভেবে মনে হয় শিশু সাহিত্যে নানারকম কাজের উল্লেখ থাকলে—একটা চঞ্চলতা, একটা গতিশীলতা থাকলে শিশুর কাছে সেটা বেশী করে আকর্ষনীয় হয়ে উঠবে।

চার বছর বয়েস থেকে শিশুর কৌতূহল দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। বড়োদের কাছে যা অকিঞ্চিৎকর, যা নগণ্য, শিশুদের চোখে সেগুলিও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। জ্ঞান আহরণের জন্য শিশু তার বিকচমান ইন্দ্রিয়গুলির ওপর নির্ভর করে। তার চার পাশে অহরহ যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলি যত তুচ্ছই হোক না কেন তাদের লক্ষ্য করে। সংসারে নবাগত শিশুটির কাছে সব কিছুই বিস্ময়কর। শিশুর জগৎ আর আমাদের জগৎ এক নয়। আমাদের গণ্ডি বহু-বিস্তৃত, তাই আমাদের কৌতূহল বিক্ষিপ্ত, আমাদের অনুভূতি অগভীর। শিশুর সংসারটি ক্ষুদ্র; তাই তার কৌতুহলও নিবদ্ধ, তার অনুভূতি গভীর, নিবিড়। সে কোন্ জিনিসকে কী চোখে দেখে সেটা আমাদের জানতে হবে। সেই জিনিসটি সম্পর্কে তার যে অনুভূতি তারই কথা লিখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন, "কোন দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে, আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডী।" শিশু-সাহিত্যে ব্যাঙ্ আর নেড়ী কুকুরের যে স্থান তাকে স্বীকার করে না নিলে শিশু-সাহিত্য রচনা করা কোন দিনই সার্থক হতে পারে না।

শিশুর কল্পনা করবার ক্ষমতাটাও শিশু সাহিত্যিকের বিবেচনার বিষয়। শিশু-মনস্তাত্ত্বিক লক্ষ্য করেছেন ছ'বছর থেকে চৌদ্দ-বছরের শিশুর কল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় বাস্তবের মতোই জীবন্ত। এই সব শিশুর কল্পনা অনেক সময় এমনি সজীব হয়ে ওঠে যে তারা বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোন রকম সীমারেখা টানিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে শিশুরা (এবং অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিও) দৃশ্যের কল্পনা যত নিখুঁত ভাবে করতে পারে, শব্দ স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শের কল্পনা তত নিখুঁতভাবে করতে পারে না। সজীবতার দিক দিয়ে বিচার করলে দৃশ্যের পরেই শব্দের স্থান। তাই শিশুর সাহিত্যে যদি দৃশ্য ও শব্দের বর্ণনা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তাহলে সহজেই তার কল্পনা উজ্জীবিত হবে। বর্ণ-পরিচয়ের "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এই ক'টি কথার মধ্যে একটি চিরন্তন বর্ষানিবিড় ধ্বনিময় চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠছে বলেই শিশুর কাছে এই কথাগুলির আকর্ষণ এত বেশী।

সার্থক সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে পাঠক তার মনের অনেক রুদ্ধ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার পরোক্ষ চরিতার্থতা ঘটিয়ে আনন্দ পান। অতৃপ্ত কামনা বাসনাগুলি আত্মপ্রকাশের কোন রকম সুযোগ না পেলে মানুষ অস্বাভাবিক—এমন কি উন্মাদও হয়ে পড়তে পারে। সাহিত্য পাঠককে এই ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে। সুতরাং যে সাহিত্যের মধ্যে বিবিধ চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতানুভূতির মাধ্যমে শিশু তার অতৃপ্ত কামনা বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করবার বেশী সুযোগ পাবে সেই সাহিত্য তার মনকে বেশী করে নাড়া দেবে।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বাতন্ত্র্যবোধও বাড়তে থাকে। বড়োদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তার মতের অমিল ঘটে। অথচ ভয়ে, সম্ভ্রমে কিংবা সংকোচে সে দৃঢ়ভাবে নিজেকে জাহির করতে পারে না। তাই তার মনের ভেতর একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রূপকথা শিশুর এই ক্ষোভটাকে পরোক্ষভাবে চরিতার্থ হবার সুযোগ দেয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে রূপকথার রাজনন্দন ডাইনীর চোখে ধুলো দিয়েছে, দৈত্যদানবকে যুদ্ধে হারিয়ে বা হত্যা করে বন্দিনী রাজনন্দিনীকে উদ্ধার করে এনেছে। এখানে ডাইনী এবং দৈত্যদানব বয়স্কদের এবং রাজপুত্র শিশুর নিজেরই প্রতীক। তাই এই সব কাহিনী পাঠ

করে বড়োদের প্রতি তার যে ক্ষোভ শিশু পরোক্ষভাবে সেটাকেই প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

যে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের বিফল বাসনাগুলি সফল হয়ে উঠতে দেখি সেই সাহিত্যই আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু সাহিত্যকে চিত্তাকর্ষক করতে হলে যে তার মধ্যে আমাদের অপূর্ণ কামনারাশিকে পূর্ণ করে তুলতেই হবে এমনও কোন কথা নেই। সাহিত্যের মধ্যে যদি এমন কোন চরিত্রের সন্ধান পাই যে নাকি ঠিক আমারই মতো—যার সুখদুঃখ, ব্যথা বেদনার অনুভূতি আমার সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনারই মতন, যে আমারই মতো আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে,—অর্থাৎ যার মধ্যে আমি নিজেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হতে দেখি, তাহলে তার প্রতি সহজেই আমার চিত্তটি সহানুভূতিতে ভরে উঠবে, অতি সহজেই তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করতে পারবো, যার ফলে সাহিত্যটিও আমার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। শিশু-সাহিত্যকে শিশুর চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হলে তার সমস্যাগুলি কী জানা দরকার। আরও জানা দরকার এই সব সমস্যার কী ধরনের সমাধান সে চায়। তারপর তারই ভিত্তিতে তার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

শিশুর সাহিত্যে কোন বিষয়ে কিছু বলার সময় যদি সে সম্বন্ধে তার ধারণাটিকেই তুলে ধরা যায় তাহলে সহজেই সেটা শিশুমনকে আকর্ষণ করবে। আমরা আগেই বলেছি বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বয়েসের শিশুর ধারণা আলাদা। যেমন প্রথম প্রথম শিশু বিশ্বনিখিলের সব কিছুকেই জীবন্ত মনে করে, যেমন মনে করতো আদিম যুগের মানুষেরা। সুতরাং খুব অল্পবয়স্ক শিশদের সাহিত্যে এক টুকরো পাথরকেও প্রাণবন্ত বলে বর্ণনা করা চলে। শিশুর বয়েস যখন ছ'সাত বছর তখন সে শুধু সচল বস্তুকেই জীবন্ত ভাবে, জড় বা অচল বস্তু তখন তার কাছে প্রাণহীন। গাছের ঝরা পাতা, আকাশের হাল্‌কা মেঘ তার কাছে সজীব, কারণ তারা গতিশীল; কিন্তু ঘরবাড়ি, পাহাড় পর্বত নির্জীব। আট দশ বছরের শিশুর চোখে শুধু যে-বস্তুর নিজস্ব গতি আছে, সেটাই জীবন্ত; যার নিজস্ব গতি নেই তা প্রাণহীন। নদী জীবন্ত কারণ তার নিজস্ব গতি আছে, কিন্তু ডিঙি জড়, কারণ সে নিজে চলে না, নদীর স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যায়। একই কারণে বাতাস সজীব, কিন্তু মেঘ নির্জীব। আরও একটু বয়েস বাড়লে শিশু জীব ও জড়ের মধ্যেকার সীমারেখাটা বুঝতে পারে। কোন একটা বস্তুকে আমরা বড়োরা যে চোখে দেখি, শিশুরা সে চোখে দেখে না। আমাদের কাছে যেটা সহজ, শিশুদের কাছে সেটা দুর্বোধ্য। আমাদের কাছে যা অলীক শিশুর কাছে হয়তো

সেটাই চরম বাস্তব। তাই শিশুর সাহিত্যে যদি তার ধারণাগুলিকে যথা সম্ভব ঠাঁই দেওয়া হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হবে।

সাহিত্যকে শিশুর মনোগ্রাহী করতে হলে দেখতে হবে যেন বর্ণিত বিষয় বা ঘটনাগুলি তার কৌতূহল, আবেগানুভূতি এবং প্রেরণাগুলিকে (সহজাত ও অর্জিত) গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাহলে শিশু যতই পড়বে ততবেশী কৌতূহলী হয়ে উঠবে। কখনো খুশী হবে, কখনো রুষ্ট হবে, কখনো বা ভীত হয়ে পড়বে। কখনো বা পরাজয়ের গ্লানি তাকে নিরাশ করবে, আবার পর মুহূর্তেই জয়ের আনন্দ তাকে উচ্ছল করে তুলবে। সাহিত্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটলে তবেই সাহিত্য হয়ে উঠবে আকর্ষণীয়।

সাহিত্যকে চিত্তাকর্ষক করবার আরো অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিধি আছে। বিশেষ করে অল্পবয়স্ক শিশুর সাহিত্যে হরপগুলি যদি পরিষ্কার এবং বড়ো বড়ো হয় তাহলে শিশুর মন সাবলীল ভাবে রচনার মধ্যে নিবিষ্ট হবে। সাহিত্যে যে সব ঘটনার বর্ণনা থাকবে সেগুলি—অন্ততঃপক্ষে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি—যদি চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয় তাহলে শিশুমনে তারা গভীরভাবে রেখাপাত করবে। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক শিশুর মনে কল্পনার উদ্রেক করতে হলে শুধু ভাষাই যথেষ্ট নয়, ভাষার পরিপূরক হিসেবে চিত্রেরও দরকার আছে। আজকাল শিশু-সাহিত্যে ছবির ছড়াছড়ি দেখতে পাই। কিন্তু সাহিত্যে ছবির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে যেমন তেমন ছবি হলেই চলবে না। শিশু রঙ্ ভালবাসে, কিন্তু একরাশ রঙ্ দিয়ে ছবি আঁকলেই যে শিশুর ভালো লাগবে তা নয়। কোন্ রঙের সঙ্গে কী রঙ্ মেশালে তার আকর্ষণ বেশী হয় তাও জানতে হবে। অনেক সময় রঙীন ছবির চাইতে পেন্সিল স্কেচ্ কিংবা লিনো কাট্ মনের ওপর বেশী দাগ কাটতে পারে। শিশুর পক্ষে সেই রকম চিত্র বেশী উপযোগী হবে, যা নাকি তার কল্পনাকে উজ্জীবিত করবে। মোটের ওপর কোন্ বয়েসের শিশু কী ধরনের ছবি ভালবাসে গবেষণা করে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পীর মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা থাকতে হবে। বর্ণনার মধ্যে যদি ধ্বনির একটি সাবলীল ঝঙ্কার থাকে তাহলে সহজে তা শিশুর মনটিকে কেড়ে নেবে।

বিষয়বস্তুর মধ্যে নূতনত্ব থাকলে শিশুর মন সেদিকে আকৃষ্ট হবে। যেমনঃ হাট্টিমাটিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিঙ্, তারা হাট্টিমাটিম টিম।" বিশেষতঃ অঙ্কিত হাট্টিমাটিমটি যদি একটি কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ার হয় তাহলে তো কথাই নেই। সাধারণতঃ শিশুরা হাতি কিংবা ঘোড়াকে নাচতে দেখে না। তাই যখন তারা পড়ে "হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, কদমতলায় কে?" তখন স্বভাবতঃই তাদের কৌতূহল আর কৌতুকবোধ উদ্দাম হয়ে ওঠে। সুকুমার

রায়ের "আবোল তাবোল" তার নূতনত্বের জন্যই শিশুদের কাছে এত প্রিয়। অবশ্য এই জাতীয় ছড়া ও কবিতার মধ্যে সুমিষ্ট ধ্বনিরও একটা চমৎকার ব্যঞ্জনা আছে।

যথা সম্ভব শিশুর ভাষাতেই শিশুর সাহিত্য রচনা করা দরকার। আমাদের পরিপক্ক ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে রেখাপাত করা সহজ নয়। সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য গড়তে হলে শিশুর শব্দ-সম্ভার জানতে হবে। অনেক সময় কোন বস্তু বা প্রাণীর বর্ণনা প্রসঙ্গে যদি তার একটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করা হয় তাহলে সহজেই সেটা শিশুর মনকে কেড়ে নেয়। যেমন, 'দাদুর দস্তানা'র "কুটুর কুটুর নেংটী ইঁদুর"। নেংটী ইঁদুর কুটুর কুটুর শব্দ করে। নেংটী ইঁদুরের এই বিশেষণটা তাই খুবই স্বাভাবিক এবং শিশুর কাছে সহজবোধ্য।

শিশু-সাহিত্যককে মিশতে হবে শিশুর সঙ্গে। তার ভাষাবিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার মনোজগতে কী কী পরিবর্তন ঘটছে সেটা লক্ষ্য করতে হবে। তাছাড়া শিশুর লেখা ও বলা কবিতা-কাহিনী, শিশু তার কথাবার্তা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলেও শিশু-সাহিত্যিক বুঝতে পারবেন কী রকম ভাষা ব্যবহার করে এবং তার কল্পনার প্রকৃতিটাই বা কী রকম, তার চিন্তাধারার গতিটা কোন দিকে। সংস্কার-মুক্ত আপন শৈশব স্মৃতিও সার্থক শিশু-সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিকের যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে।

শিশুর আগ্রহ

মনের মতো কাজ না হলে সে কাজ কেউ করতে চায় না। বাধ্য হয়ে করতে হলে কাজটা দায়সারা গোছের হয়, তার সঙ্গে প্রাণের কোন যোগ থাকে না, কাজ করে কাজের আনন্দ (Job satisfaction) পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয় বলে কাজে মন বসে না। ভুল হয়, বিরক্তি আসে। কর্মী তার ভুলের জন্য অন্যাকে দোষ দেয়। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে তার মধ্যে হামবড়া ভাব দেখা দেয়। ফলে অন্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা সে ক্রমান্বয়ে হারাতে থাকে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজে আগ্রহ না থাকলে সমূহ ক্ষতি——কাজের ক্ষতি, কর্মীর ক্ষতি, নিয়োগকর্তার ক্ষতি সমাজের ক্ষতি সকলেরই ক্ষতি। ব্যক্তির আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাকে কাজে নিয়োগ করতে হবে। সহজ কথায়, যার যেমন আগ্রহ তাকে তেমন কাজ দিতে হবে। আগ্রহ রাতারাতি জন্মায় না। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। সেজন্য চাই অনুকূল পরিবেশ, উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনা, এবং দীর্ঘদিনের চর্চা।

দক্ষতা এবং আগ্রহের সম্পর্কটাও অবিচ্ছেদ্য। দক্ষতা থাকলে আগ্রহ আসে, না আগ্রহ থাকলে দক্ষতার সৃষ্টি হয় বলা ভারি শক্ত। মনে হয় দুটোই সত্যি। দক্ষতা আর আগ্রহ একে অন্যের ওপর নির্ভর করে, কোন্‌টা কারণ আর কোন্‌টা কার্য বলা মুস্কিল। যে গান গাইতে পারে তার গানে আগ্রহ জন্মায় কথাটা যেমন সত্যি, সেই রকম যে প্রাণ দিয়ে গান ভালবাসে চর্চা করলে সেও ভালো গান গাইতে পারবে এ কথাটাও প্রায় তেমনিই সত্যি।

যদিও আগ্রহ অথবা দক্ষতা কোনটাই আমরা নিয়ে জন্মাই না তবু মনে হয় দুটোই নির্ভর করে কিছুটা দেহ গঠন আর কিছুটা পরিবেশের প্রকৃতির ওপর। কারও যদি বিকৃত স্বরযন্ত্র এবং/কিংবা মারাত্মক রকমের বধিরত্ব থাকে, তাহলে তার পক্ষে গানে দক্ষতা বা আগ্রহ অর্জন করা সম্ভব হবে না। বিঠোফেনের মতো বধির সুরস্রষ্টা ব্যতিক্রম মাত্র। অপরপক্ষে কেউ যদি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও নিপুণ শ্রবণ শক্তির (অর্থাৎ সুর বিশ্লেষণী ক্ষমতা বা ছন্দ জ্ঞানের) অধিকারী হয় তাহলে তার পক্ষে গানে আগ্রহী এবং দক্ষ হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। সেই রকম যে বাড়িতে গানের চর্চা হয় সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই সঙ্গীতানুরাগী হয়ে থাকে। মোটের ওপর, আগ্রহ এবং দক্ষতা গড়ে ওঠা না ওঠা কেবলমাত্র দেহগত বৈশিষ্ট্য অথবা কেবলমাত্র পরিবেশের ওপর নির্ভর করে না, এ জন্য চাই দুয়ের সার্থক সমন্বয়।

আগ্রহ যেমন পরিবেশের ওপর নির্ভর করে, তেমনি আবার পরিবেশ সৃষ্টিও

করে থাকে। যার গানে আগ্রহ আছে সে গানের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা রকম সামগ্রী নিজে থেকেই জোগাড় করে—যেমন গানের বই, বাজনা, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। সে নিজের চেষ্টায় গান জানা লোক খুঁজে বের করে এবং তার কাছে তালিম নেয়। এমনি ভাবে সে গানের অনুকূল একটি পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়।

প্রতিটি শিশুর আগ্রহ কোন্ কোন্ বিষয়ে সেটা জানা দরকার। জানতে পারলে তার আগ্রহের ভিত্তিতে তাকে লেখাপড়া শেখানো যাবে এবং সেই মতো তালিম দিয়ে তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করাও সম্ভব হবে। প্রয়োজন মতো তার আগ্রহগুলিকে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্যও করতে পারবেন বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

কিন্তু কোন একটি শিশুর আগ্রহ কোন্ দিকে কেমন করে তা জানা যাবে? এজন্য মনোবিদেরা নানান রকমের অভীক্ষা (Test) তৈরী করেছেন। কিন্তু বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়া সেই সব অভীক্ষা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতে বিচলিত হবার কিছুই নেই, আরো অনেক সহজ উপায়ও রয়েছে যেগুলি সকলেই প্রয়োগ করতে পারেন। এই রকম কয়েকটি উপায়ের কথা এখন আমরা আলোচনা করছি।

শিশুর দৈনন্দিন স্বাভাবিক পরিবেশে তার ক্রিয়াকলাপ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে তার কী কী বিষয়ে আগ্রহ আছে সহজে তা বোঝা যায়। সারাদিনের মধ্যে শিশু সাধারণতঃ কী কী কাজ করে—বাধ্য হয়ে নয়, নিজের তাগিদে—বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তার আগ্রহ কী কী বিষয়ে।

শিশু তার নিজস্ব টাকা এবং সময় কীভাবে ব্যয় করে তার হিসেব নিলেই বোঝা যাবে তার আগ্রহের বিষয়গুলি কী কী। বড়রা মাঝে মাঝে শিশুদের যে টাকা দেন সেটা তারা জমিয়ে রাখে এবং পরে নিজেদের ইচ্ছে মতো খরচ করে। সেই টাকা দিয়ে তারা কী কিনলো, কোথায় গেল, কাকে দিল ইত্যাদি খবর নিলেই বোঝা যাবে তাদের আগ্রহ কোন্ কোন্ দিকে। তেমনি যে সময়টা শিশুর নিজস্ব সেটা সে কেমন করে কাটায়, কোন্ কোন্ কাজে বেশী সময় দেয় সে খবর পেলেও তার আগ্রহের ধরণধারণটা বোঝা যাবে। যার যে বিষয়ে আগ্রহ বেশী সেই রকম কাজে সে তার বেশী সময় নিয়োগ করবে।

বিশেষ ধরনের পরিবেশে বিশেষ বিশেষ সামগ্রী বা কাজকর্মের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেও তার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। যেমন রেডিও বা টেলিভিশনের কোন্ ধরনের প্রোগ্রাম তাদের ভালো লাগে, কোন একটা প্রদর্শনীতে বা মিউজিয়ামে গেলে কোন্ কোন্ জিনিস তাদের বেশী করে আকৃষ্ট

করে, খবর কাগজের কী ধরনের বিষয়—সংবাদ, না রবিবাসরীয়, না খেলাধুলা, না অন্য কিছু—তাদের বেশী আনন্দ দেয় ইত্যাদি জানতে পারলে তাদের আগ্রহ কেমন জানা যাবে। বাঙালী সমাজে অন্নপ্রাশনের সময় এই ধরনের একটা ব্যাপার আছে। শিশুটির সামনে থালায় করে ধান, মাটি, বই, কলম, সোনা ইত্যাদি বিচিত্র সামগ্রী হাজির করা হয়, সে যেটা তুলে নেয় মনে করা হয় বড় হলে সে সেই সেই বিষয়ে আগ্রহী ও নিপুণ হবে। যেমন বই ধরলে মনে করা হয় পণ্ডিত হবে, সোনা ধরলে মনে করা হয় ব্যবসায়ী হবে, মাটি ধরলে ভেবে নেওয়া হয় সে এককালে মস্ত কৃষক হবে। যদিও এ ধরনের অনুমান নিছক কল্পনা ভিত্তিক তবু পদ্ধতিটা যে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেটা অস্বীকার করা চলেনা। এতটুকু শিশুর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটা প্রযোজ্য নয় এই মাত্র।

শিশুর সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পটভূমিকা ও ক্রিয়াকর্মের ওপর সযত্ন রচিত প্রশ্নগুচ্ছের (Questionnaire) সাহায্যেও তার আগ্রহ নিরূপণ করা যায়। পরিবারের অন্যান্যদের সখ কী কী, সমাজে বা শিশুর পরিবেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা প্রধানতঃ কী কী বিষয়ে আগ্রহী, শিশুর সঙ্গীদের আগ্রহ কী রকম ইত্যাদি সম্বন্ধে সন্ধানী প্রশ্নের সাহায্যে নির্দিষ্ট শিশুটির আগ্রহ কী ধরনের হতে পারে সে সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। ইংরিজীতে একটা কথা আছে 'A man is known by the company he keeps', অর্থাৎ সঙ্গীসাথীদের প্রকৃতি জানা থাকলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃতিটিও জানা হয়ে যায়। আগ্রহের ব্যাপারে এ কথাটা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

যাঁরা শিশুটিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন তাঁদের মতামত নিলেও শিশুটির আগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। বাবা-মা শিক্ষক-শিক্ষিকা সঙ্গী-সাথী প্রভৃতির মতামত এ প্রসঙ্গে রীতিমত মূল্যবান, কারণ তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে শিশুটিকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করে আসছেন। কোন একটা বিষয়ে শিশুটির আগ্রহের পরিমাণ কী রকম সেটাও তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে জানা যেতে পারে, যদি সে বিষয়ে শিশুটিকে একটি মাপক রেখা (Rating Scale) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। যেমন খেলাধুলায় শিশুটির আগ্রহ কেমন ?—এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা এই ভাবে দিতে পারেন—

মাপক রেখা

খুব কম	কম	মাঝারি	বেশী	খুব বেশী
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

এই মাপক রেখার ভিত্তিতে অনেকের মতামত নিয়ে তার গড় কষলেই খেলা-ধুলো সম্বন্ধে শিশুটির আগ্রহের পরিমাণ মোটামুটি কী রকম তা বোঝা যাবে।

সাক্ষাৎকার (Interview)-এর মাধ্যমে শিশুর সঙ্গে বন্ধুভাবে খোলাখুলি আলোচনা করেও কোন্ কোন্ বিষয়ে তার আগ্রহ আছে এবং কোন্ বিষয়ে তার আগ্রহের পরিমাণ কী রকম তা বোঝা যাবে। এখানেও ওপরের মাপকরেখাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বর্তমান লেখক অন্যত্র আলোচনা করেছেন কেমন করে সাধারণ গ্রাফ কাগজের অথবা কোণ (Angle অথবা Theta) এবং ব্যাসার্ধ (Radius)-এর সাহায্যে একই সঙ্গে কোন এক ব্যক্তির আগ্রহের পরিধি বা ব্যাপকতা (range) এবং গভীরতা (depth) দুই-ই দেখান যায়। একে আমরা মাপক-লেখ (Rating Graph) বলতে পারি। সাধারণ গ্রাফ কাগজের X-অক্ষকে ব্যাপকতা বা পরিধির এবং Y-অক্ষকে গভীরতার অনুরূপভাবে কোণকে ব্যাপকতা বা পরিধির এবং ব্যাসার্ধকে গভীরতার—সূচক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

স্মরণ শক্তির ওপর ছোট ছোট পরীক্ষা করেও আমরা শিশুর আগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে (যেমন খেলাধুলা, প্রাণী, উদ্ভিদ, সঙ্গীত, ইত্যাদি) দশটি করে তথ্য শিশুকে মুখস্থ করতে বলা যেতে পারে। যে বিষয়ের তথ্য সে তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে মুখস্থ করতে পারবে এবং বেশী দিন মনে রাখতে পারবে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সেই সেই বিষয়ে তার আগ্রহ অধিক। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যগুলি এমনি হবে যেন সেগুলি আগে থেকে শিশুর জানা না থাকে। যথেষ্ট যত্ন এবং সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা-গুলি করতে হবে।

বিভিন্ন বিষয়ে লেখা বই-এর অংশ বিশেষ শিশু কী রকম দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে পড়তে পারে অথবা বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে কত তাড়াতাড়ি ও নিখুঁতভাবে সে লিখতে পারে তা থেকেও তার আগ্রহের পরিধি ও গভীরতার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যে বিষয়ে তার ভুল যত কম হবে এবং যত বেশী তাড়াতাড়ি সে লিখতে বলতে পড়তে পারবে সে বিষয়ে তার আগ্রহ

তুলনামূলকভাবে বেশী এ কথাটা সাধারণভাবে নেওয়া মেনে যেতে পারে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে শিশুটির পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলেও তার আগ্রহ কোন্ দিকে, কী রকম এবং কী পরিমাণ জানা যাবে। যে যে বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী শিশু স্বাভাবিক ভাবেই সেই সেই বিষয়ে বেশী মন দেবে, বেশী যত্ন করে পড়বে, তার পরীক্ষার ফলও সেই সেই বিষয়ে বেশী ভালো হবে। মোটামুটিভাবে এ কথাটা আমরা মেনে নিতে পারি।

বর্তমান লেখক একটি নতুন পদ্ধতির কথা বলেছেন, তার নাম স্ব-রচিত প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (self-framed question—Answer Method)। এই পদ্ধতিতে যার আগ্রহ নির্ধারণ করা হচ্ছে তাকে বলা হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী সম্ভব ছোট ছোট, নৈর্ব্যক্তিক (objective), এবং তথ্য সন্ধানী প্রশ্ন তাকে তৈরী করতে হবে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে তার সঠিক উত্তরটিও তাকেই লিখে দিতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাকে প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একই পরিমাণ সময় দেওয়া হবে। যে বিষয়ে সে যত বেশী স্বরচিত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে সে বিষয়ে তার আগ্রহের তীব্রতা সেই রকম ধরে নিতে হবে। কেউ যদি উদ্ভিদ জগতের ওপর দশ মিনিটে তিরিশটি প্রশ্ন তৈরী করে পঁচিশটির ঠিক উত্তর দিতে পারে, আর দশ মিনিটে ক্রীড়া জগৎ সম্বন্ধে চল্লিশটা প্রশ্ন রচনা করে কুড়িটার সঠিক উত্তর দেয় তাহলে বুঝতে হবে উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে ক্রীড়া জগতের তুলনায় তার আগ্রহ বেশী। অর্থাৎ শুধু বেশী প্রশ্ন রচনা করলেই চলবে না, এমন প্রশ্ন রচনা করতে হবে যার সঠিক উত্তরটা তার জানা আছে। এই পদ্ধতিটি যে ধারণার ওপর গড়ে উঠেছে সেটি হলো এই যে—যার যে বিষয়ে আগ্রহ যত বেশী সে বিষয়ে তার তত বেশী নির্ভুল তথ্য জানা আছে। একটু বেশী বয়েসের শিশুদের ওপর এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি সাধারণ তথ্যমূলক জ্ঞানমাপক অভীক্ষা (Information Test) থেকে আলাদা। তার কারণ এখানে ব্যক্তিটিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে না বলে সে তার রুচি মতো প্রশ্ন নিজেই তৈরী করে তার উত্তর দেয়। নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে আগ্রহের অভাব আছে এ কথাটা সব সময় সত্যি নাও হতে পারে, কারণ সব

জিনিস তো সকলের জানা থাকে না। অথচ নিজে থেকে প্রশ্ন করতে বললে আমার সত্যিকারের আগ্রহ প্রকাশ পাবে। আমাকেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, এবং আমার উত্তরগুলো বিশেষজ্ঞরা বিচার করে দেখবেন এ কথা জানা থাকলে আমি আবোল তাবোল প্রশ্ন তৈরী করতে পারবো না, সুতরাং যে বিষয়ে আমার সত্যিকারের আগ্রহ, সেই বিষয়েই আমি বেশী প্রশ্ন করবো এবং বেশী সংখ্যক প্রশ্নেরই (সবগুলোও হতে পারে) সঠিক হবার সম্ভবনা থাকবে।

এমনিকরে শিশুর আগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়ে তাকে প্রয়োজন মতো নির্দেশনা দিতে হবে। তার আগ্রহগুলিকে সে যাতে বিকশিত করে তুলতে পারে সে বিষয়েও তাকে সাহায্য করতে হবে।

মাতাপিতা ও শিশু

শিশু-মনের গোড়াতেই এমন কতকগুলি শিশুর উল্লেখ করেছি, যাদের নিয়ে মাতাপিতাকে প্রচুর বেগ পেতে হয়। তাঁরা বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত, জ্বালাতন হয়ে ওঠেন। বিরক্ত হন তাদের ওপর। সন্তানের ব্যবহারে অন্যের কাছে তাঁদের লজ্জিত হতে হয়। কখন কী অঘটন ঘটে সেজন্য দিনরাত্তির তাঁদের সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এই সব শিশু মাতাপিতার কাছে এক একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের বলা হয় 'সমস্যা-শিশু'। বিচিত্র ধরনের সমস্যা-শিশুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অকালপক্কতা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা অথবা গভীর আলস্য-স্বপ্নবিলাস, খিটখিটে মেজাজ, অকারণ ভয়, অবাধ্যতা, কলহপ্রীতি, ভীষণ জেদ, অভব্য ও অশিষ্ট আচরণ, মিথ্যা ভাষণ, পরস্ব অপহরণ, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, নিজেকে জাহির করার উৎকট প্রয়াস, শঙ্কা ও সংকোচ, পাঠশালা পলায়ন, নিশিচারণ ইত্যাদি বহু বিচিত্র শিশু-সমস্যার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। মাতাপিতা এই সব শিশু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চান। বর্তমান প্রবন্ধে সমস্যা-শিশুকে সংশোধন করে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তারই আলোচনা করছি।

সর্বপ্রথম আমাদের দেখতে হবে বিবিধ শিশু-সমস্যার কারণ কী। ডালপালা বিস্তার করে যে সমস্যাটি আমাদের সামনে আজ অতি জটিল রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তার বীজটির সন্ধান করা আগে দরকার। মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন শিশুর প্রতি মাতাপিতার অদ্ভুত আচরণ ও মনোভাবই শিশুকে সমস্যা-শিশু করে তোলার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কোন শিশুই সমস্যা-শিশু হয়ে জন্মায় না, তার পরিবেশই তাকে সমস্যামূলক করে তোলে। মাতাপিতাই শিশুর প্রথম জীবনের পরিবেশ। তাঁরাই কীভাবে সহজ সরল শিশুটিকে জটিল করে, বাঁকা করে গড়ে তোলেন সে কথাই বলছি।

অনেক মাতাপিতা শিশুর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। শিশুর বিরুদ্ধে যেন একটা অন্ধ আক্রোশ তাঁদের অন্তরের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেই শিশু-পালন বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতা নেই। পুরুষেরা মনে করেন শিশুদের মানুষ করা একমাত্র মেয়েদেরই কাজ। কিন্তু মেয়েরা ঘরকরনার কাজ করে ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো সামলে উঠতে পারেন না। জ্বালাতন হয়ে ওঠেন। যে সময়টা তাঁরা ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যয় করেন সেই সময়টা আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হতে পারতো। তাই শিশুর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ, একটা আক্রোশ তাঁদের মনের গহনে সঞ্চিত হয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

অনেক সময় শিশুকে মাতা অথবা পিতা আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও মনে করেন। শিশু যদি পিতার বিশেষ স্নেহভাজন হয় তাহলে মাতার অন্তরে ঈর্ষার সঞ্চার ঘটে। আবার স্বামী যদি লক্ষ্য করেন স্ত্রী সর্বদাই সন্তানের চিন্তায় বিভোর, তাহলে শিশুর প্রতি তাঁর মনেও একটা দ্বেষ-কলুষিত বৈরী-ভাবের উদ্রেক হয়।

এক ধরনের মা আছেন যাঁরা অলস প্রকৃতির মানুষ, পরনির্ভরশীল। কিন্তু বাধ্য হয়েই তাঁদের সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও করতে হয়। তাঁদের ওপর ছেলেমেয়েদের এই নির্ভরতাকে তাঁরা সহজ মনে মেনে নিতে পারেন না। পদে পদে তাদের তিরস্কার করেন, পীড়ন করেন।

যে মাতা শিশু অবস্থায় নিজে উপযুক্ত স্নেহযত্ন পাননি তাঁর পক্ষেও নিজের সন্তানদের অবহেলা করা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বধূর ওপর শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা প্রায় পৌরাণিক উপাখ্যানের মতোই প্রাচীন। বধূ অবস্থায় যে বালিকাটি যতো বেশী নির্যাতিত হয়েছে, দেখা গেছে শাশুড়ী অবস্থায় তার পুত্রবধূদের ওপর সে ততো বেশী নিপীড়ন করেছে। অবশ্যই সে যে সব সময় জেনে শুনে এরকম করেছে তা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তার অবচেতন মনেরই প্রতিক্রিয়া। ঠিক একই কারণে যে মহিলাটি শিশু অবস্থায় অবহেলা পেয়েছেন তাঁরও অবচেতন মনে আপন সন্তানদের অবহেলা করবার একটা প্রবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক।

তাছাড়া সন্তান ধারণের যে যন্ত্রণা তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যও অনেক রমণীকে আকুল হয়ে পড়তে দেখা যায়। তাঁরা গর্ভসঞ্চারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি তাঁদের মন তাই বিরূপ হয়ে ওঠে। এই বিরক্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরও থেকে যায়। ফলে নতুন অতিথিটিকে জননী সাদর সম্বর্ধনা জানাতে পারেন না। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি জননীর মনোভাব আরও অনেক কারণেই বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। যে নারী অবাঞ্ছিত স্বামীর সন্তান ধারণ করতে বাধ্য হন, অথবা অবৈধ মিলনের ফলে যাঁর গর্ভ-সঞ্চার হয় তিনিও সাধারণতঃ নবাগতটিকে সহজ মনে মেনে নিতে পারেন না। ফলে মাতাপিতার স্নেহ যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে শিশুর মনে একটা গভীর অসহায় বোধ দেখা দেয়। তার মনে ভয়, শঙ্কা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়! সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে তার মনটি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না।

আর এক ধরনের মাতাপিতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁরা অতিরিক্ত আদরযত্ন দিয়ে আপন সন্তানদের 'আলালের ঘরে দুলাল' করে গড়ে তোলেন।

এই সব স্নেহপুত্তলিরা যখন যা আবদার করে তাই পায়। মাতাপিতা তাদের খুশী করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তারা যদি একমাত্র সন্তান হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। এঁদের ধারণা শিশু যা চাইবে তাকে তাই দেওয়া উচিত। কিন্তু চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বেশ বড়ো রকমের যে একটা সীমারেখা আছে একথাটা তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না। এই সীমারেখার মধ্যে শিশুর যতগুলি চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করা যায় ততোই ভালো, কিন্তু তার চাওয়া যখন সীমা ছাড়িয়ে যাবে তখন তাকে সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা দিতেই হবে। দুঃখের কথা অনেক মাতাপিতা এ বিষয়টা ঠিক মতো বুঝতে পারেন না। শৈশবকালে যে সব জনক-জননীর অনেক সাধ পূর্ণ হয়নি তাঁরা আপন আপন শিশুর সাধ সাধ্যমতো মেটাতে চেষ্টা করেন। তাঁদের বিশ্বাস শৈশবে যদি তাঁদের সকল আশা পূর্ণ হতো তাহলে তাঁরা আরও অনেক বেশী উন্নতি করতে পারতেন। তাই আপন শিশুকে নিরাশ করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন। শিশুদের যত বেশী আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় ততোই ভালো, কিন্তু তাদের মধ্যে যেন বেশ একটি বলিষ্ঠ সমাজচেতনা ও নীতিবোধ জাগরিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সংযম সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিতে হবে তাদের। তা যদি না করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে শিশু যখন বাস্তব জগতে পদার্পণ করে দেখবে বিশ্বজগতের সকলেই তার মাতাপিতা নয়, সেখানে সফলতার পাশে রয়েছে বিফলতা, চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, তখন সে নিজেকে জগতের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। তার ফলে নিজের এবং অপরের প্রতি তার মনে অসহ্য ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে তাকে অসুস্থ করে তুলবে।

এমন অনেক মা বাবা দেখা যায়, যাঁরা সব সময়ই শিশুর ওপর কর্তৃত্ব করতে ভালবাসেন। পদে পদে তাকে বাধা দেন, তার সমালোচনা করেন। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁরা চান তাঁদেরই ইচ্ছেমতো শিশুটি উঠবে বসবে। মাতাপিতার এ ধরনের মনোভাবের অনেক কারণ থাকতে পারে। কর্তৃত্ব করার প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত, কিন্তু তাই বলে তার প্রকাশ যে রূঢ় কটু অসুস্থ হবে তেমন কোন কথা নেই। অনেক স্ত্রী স্বামীকে মোহমুগ্ধ, বশীভূত করে রাখতে চান। কিন্তু স্বামীর স্বাতন্ত্র্যবোধ যদি প্রচণ্ড হয়, কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি যদি বার বার স্ত্রীর পাতা মোহজাল কেটে পালিয়ে যান, তাহলে স্ত্রীর সমূহ কর্তৃত্বস্পৃহা গিয়ে পড়বে শিশুর ওপর। তাঁর অতিরিক্ত শাসনের ভারে শিশুটি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হয় সে অতিমাত্রায় লাজুক, অথবা পরনির্ভরশীল, না হয় রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

খোকাখুকি যে দিন দিন বড় হচ্ছে, তাদেরও যে স্বতন্ত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ আছে, কোন কোন কাজ করবার যোগ্যতা আছে, কোন কোন কাজ করবার যোগ্যতা নেই এ কথাটা অনেক সময়ই মা-বাবা ভুলে থাকেন। প্রায়ই তাঁরা শিশুর সঙ্গে একাত্মবোধ করে তার থেকে এমন অনেক কিছু দাবি করেন, যা পূরণ করতে গিয়ে তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাঁরা শিশুকে এমন অনেক কাজ করতে প্ররোচিত করেন, যা করলে সে অন্যের প্রশংসা পাবে, আর তাঁরাও তার গর্বে গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠবেন। কিন্তু এ কাজটা করবার যোগ্যতা শিশুর আছে কি না, সে সম্বন্ধে একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না। ফলে বার বার ব্যর্থ হয়ে শিশুর মনে গভীর হীনমন্যতার ভাব, আত্মনিগ্রহের প্রচণ্ড প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনেক বাবা সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস শিশুকে আদর যত্ন করার, তার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলার একটাই অর্থ তাকে প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করা। তাই শিশুর সঙ্গে তাঁরা যে সম্পর্ক স্থাপন করেন সেটা চাবুকের সম্পর্ক, নিপীড়ন ও নির্যাতনের সম্পর্ক। এই সব শিশু অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির হয় এবং তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিটাও খুব প্রবল হয়ে ওঠে।

আর এক ধরনের বাবা আছেন, যাঁরা খুব ভাল মানুষ। শিশুর সঙ্গে কোন রকম কঠিন আচরণ করতে পারেন না। শিশু অন্যায় করলেও তাকে বকাবকি করতে তাঁদের কষ্ট হয়। এরকম ক্ষেত্রেও শিশু চাপা প্রকৃতির হয়ে ওঠে, তার কারণ সে তার 'ভালমানুষ' বাবার প্রতি কোন রকম বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। অথচ তাঁর সকল কাজ সে পুরোপুরি মেনে নিতেও পারে না বলে স্বভাবতঃই তাঁর বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভ এবং উষ্মা জমতে থাকে। এতে তার মনের বিকাশ ব্যাহত হয়।

অনেক সময় দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনটি কোন কারণে নীরস ও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। এরকম ক্ষেত্রে কোন কোন মাতাপিতা কোন একটি সন্তানকে তাঁদের কাম-জীবনের অবলম্বন করে থাকেন। স্ত্রী সাধারণতঃ কোন একটি পুত্রকে স্বামীর প্রতিনিধি এবং স্বামী একটি কন্যাকে স্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেন। এ ধরনের বাবা-মা তাঁদের অজ্ঞাতসারেই পুত্রকন্যার কামপ্রবৃত্তিকে নানাভাবে উত্তেজিত করে থাকেন। তাকে অতিরিক্ত চুম্বন করেন, নিবিড় আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করে ফেলেন, ইত্যাদি। মাতাপিতার এরকম অসংযত ও কামময় আচরণ শিশুর যৌনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাকে অস্বাভাবিক করে তোলে।

অনেক মাতাপিতা আবার চরম আদর্শবাদী। তাঁরা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জনের পক্ষপাতী। কিন্তু আদর্শ কোনকালেই অর্জনীয় নয়, তাই কোন কিছুতেই তাঁরা খুশী হতে পারেন না; কোন সাফল্যেই তাঁদের মন ভরে না। চরম উৎকর্ষবাদী মাতাপিতারা তাঁদের শিশু সন্তানকে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে প্রয়াস পান। তাকে এমন সব কাজকর্মে প্রণোদিত করেন, যা করতে গিয়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; আত্মবিশ্বাস হারিয়ে তার মনে একটা গভীর দীনতাবোধ ও অসহায়ত্বের সৃষ্টি হয়।

মাতাপিতাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে—শিশু যেন কখনও নিজেকে অসহায় বা হীন না ভাবে। কারণ এমনি করেই স্বাভাবিক শিশু 'সমস্যা-শিশু' হয়ে দাঁড়ায়। তার মনে অকারণ শঙ্কা, সঙ্কোচ ও ভয়ের সৃষ্টি হয়। সে ধীরে ধীরে বহির্জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, যখন তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকমশাই-এর কথা মন দিয়ে না শোনার জন্য পড়াশুনোয় অকৃতকার্য হয়। মাতাপিতা ও শিক্ষকের তিরস্কার লেখাপড়ার প্রতি তাকে আরও বেশী বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ করে তোলে, যার ফলে বিদ্যালয় হতে পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি জাগে তার মনে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু ঠিক মতো দেখতে বা শুনতে পায় না বলেই পড়াশুনো ভালো করে করতে পারে না। মাতাপিতা ও শিক্ষক তাকে বুদ্ধিহীন মনে করে নানাভাবে তিরস্কার ও উপেক্ষা করে থাকেন, ফলে সেও নিজেকে তুচ্ছ ও অপদার্থ মনে করে এবং লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়।

অতিমাত্রায় অসহায় বোধ করার ফলে কোন কোন শিশু খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, অথবা দুষ্টামি করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। শিশুর মনে অসহায়ত্বের অনুভূতি শুধু যে মা-বাবার আচরণের জন্যেই হয়ে থাকে তা নয়, এর আর একটা প্রধান কারণ তার মধ্যে যে সব অসামাজিক প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে বার বার জেগে ওঠে শাসন ও তিরস্কারের ভয়ে তাদের দমন করে রাখার জন্য তার অক্লান্ত চেষ্টা। মানুষের মধ্যে দেব ভাব ও পশুভাব দুই আছে। অন্যকে আক্রমণ করার, অন্যের সম্পদ চুরি করার বা কেড়ে নেবার, যৌনজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হবার সহজাত প্রেরণা সকলেরই আছে এবং ক্রমাগত সেগুলি আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শিশু এই সব প্রবৃত্তিকে দমন করার চেষ্টা করে, কারণ এগুলি প্রকাশ পেলে সে অন্যের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে, শাস্তি পাবে, তিরস্কৃত হবে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে শিশু অনেক সময়ই আড়ষ্ট, উৎকণ্ঠিত ও ভীরু হয়ে থাকে। শিশুর মনে এইরকম আত্মসংঘাত যতো মৃদু হয় ততোই ভালো। এ কথার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, শিশুর পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। মাতাপিতাকে মনে

রাখতে হবে যে, শাসন ও তিরস্কার না করেও এই প্রবৃত্তিগুলির উন্নয়ন করা সম্ভব। শিশুর পশু প্রবৃত্তি প্রকাশ পেলেই রুষ্ট হবার কিছুই নেই। ধৈর্যের সঙ্গে সহজাত প্রেরণাগুলিকে নাড়াচাড়া করতে হয়। অনেক মাতাপিতার ধারণা শাসন না করলে তাঁদের সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা ঠিক নয়। শাসনে যে ফল হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শিশু স্বভাবতঃই বড়দের ভয় করে। তার কারণ সে জানে বড়রা তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তাই বড়দের সঙ্গে সংঘাত এড়াবার জন্য সে সাময়িকভাবে তাঁদের কথা শোনে। তিরস্কার ও শাসনের মাত্রা অধিক হলে তার মনে বিদ্রোহ অথবা ভয়ের সৃষ্টি হয়। ভালবেসে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সহজ। মাতাপিতার ভালবাসার বিনিময়ে শিশু তাঁদের যথাসাধ্য খুশী করতে চায়, তাঁরা যা বলেন তাই করতে চেষ্টা করে। মোটের ওপর শিশুর সঙ্গে এমন আচরণ করা দরকার, যাতে সে মনে করে মা-বাবা তাকে ভালবাসেন ; যেন সে বুঝতে পারে, এই বিপুল বিশ্বে সে একা নয়, তাঁরা সব সময়ই রয়েছেন তার কাছে। কিন্তু শিশুর প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা যেন অন্ধ না হয়। তাঁদের শিশুটি চিরকাল আর শিশুটি থাকবে না ; বহির্জগতে একদিন তাকে পা বাড়াতেই হবে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, হরেক রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই সমাজ-জীবনের জন্য যথারীতি শিক্ষা দিতে হবে তাকে। তার মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতাপিতার মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-স্পৃহা আছে আগেই বলেছি সেটা সন্তানকে কেন্দ্র করে সহজেই তৃপ্তি লাভ করে। তাই তাকে স্বাধীনতা দান করা হয়তো তাঁদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তি মেটাতে গিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোনরকম অধিকার নেই তাঁদের। শিশুলালন ব্যাপারে আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা, মাতাপিতার আচরণ যেন যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুসম্বদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাঁদের ব্যবহারে যেন কোন রকম দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও অসংলগ্নতা না থাকে। তাহলে শিশুর মধ্যে বেশ একটা বলিষ্ঠ বিবেকের ও নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা হবে। কী ভাল, কী মন্দ, কী ন্যায়, কী অন্যায় সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করে সে অকারণ মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। মাতাপিতা শিশুকে বলেন—মিথ্যা বলো না, অথচ অনেক সময় তাঁরা নিজেরাই মিথ্যে কথা বলে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে শিশু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, মিথ্যে কথা বলা উচিত কি না।

আরও একটা কথা, শিশুর কাজকে 'ছেলেমানুষি' বলে কখনো হেসে উড়িয়ে

দিতে নেই। তাতে তার মনে আত্মপ্রত্যয় ও কর্মপ্রীতির অভাব ঘটে। তার আগ্রহ ও কৌতূহল শুরুতেই নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় শিশুর নানারকম প্রশ্নে আমরা বিরক্তি প্রকাশ করি। তার বিচিত্র জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না, কিংবা তার অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত বোধ করি। এইভাবে শিশুর প্রকাশোন্মুখ জ্ঞান-পিপাসা বাধা পেয়ে অবাঞ্ছিত পথে ধাবিত হয়। সহিষ্ণুতার সঙ্গে যথাসম্ভব শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের উত্তরগুলো যেন তার বোধগম্য হয়। মা-বাবাকে মনে রাখতে হবে শিশু যেন কখনও নিজেকে অসহায়, অবাঞ্ছিত, অশক্ত বা তুচ্ছ মনে না করে।

যে কোন রকম কাজ করতে হলেই দেহ মনের একটা বিশেষ পুষ্টির দরকার। সাধ্যাতীত কাজ করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। পায়ের স্নায়ু এবং পেশীগুলো পুষ্ট হবার আগেই যদি শিশুকে বার বার উঠে দাঁড়াবার জন্যে প্ররোচিত করা হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হবে। অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য যেরকম মননশক্তির দরকার সে শক্তি যার নেই তাকে যদি মা-বাবা জোর করে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করায় প্রবৃত্ত করেন তাহলে সেও অকৃতকার্য হবে। এই অসাফল্য শিশুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। সে নূতন কিছু শিখতে ভয় পাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরাভূত হয়ে তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটি অন্যান্য ক্ষেত্রে চরিতার্থতার সন্ধান করে ঘুরবে। সমস্যা-মূলক নানারকম আচরণের মাধ্যমে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেকে জাহির করতে চাইবে; কিংবা বার বার বিফল হয়ে কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠবে। তার মধ্যে নানারকম মানসিক পীড়ারও উদ্ভব ঘটতে পারে। তাই দুর্লভ আদর্শের মোহ সৃষ্টি না করে শিশুকে এমন কাজ দিতে হবে যা করবার ক্ষমতা তার আছে। সে নিখুঁতভাবে এই সব কাজ করছে কি না সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ধীরে ধীরে এই সকল কাজে সে উন্নতি লাভ করছে কি না সেদিকেই নজর রাখতে হবে। যে শিশুর নানারকম অপূর্ণতা আছে তার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাও সমীচীন নয়। স্বাভাবিক শিশুর থেকে তাকে পৃথক্ করে দেখলে সেও নিজেকে অযোগ্য অপদার্থ ও করুণার পাত্র বলে মনে করতে শিখবে, আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ফেলবে হারিয়ে। এরকম ক্ষেত্রে তাই বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে শিশুর অজ্ঞাতসারেই তার অপূর্ণতা ও অক্ষমতাগুলি দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

একটি শিশু পাঠশালায় ভর্তি হবার কিছুদিন পরে ক্লাসে যাবার সময় হলেই

অজ্ঞান হয়ে পড়তো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে হাসিমুখে পাঠশালা যেত। যখন কারণটা আবিষ্কৃত হলো তখন বোঝা গেল প্রথম ঘণ্টায় যে শিক্ষক ক্লাস নিতেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী। কথায় কথায় ছেলেদের শাস্তি দিতেন, ভীষণ চীৎকার করতেন এবং নির্মমভাবে তাদের মারধোর করতেন। যে শিশুটির কথা বলছি তাকে অবশ্য তিনি কখনো মারেন নি, তার কারণ সে ছিল খুব ছোট এবং তার বাবা ছিলেন পণ্ডিত মশায়ের বন্ধু। তার বাবা শিশুটির সামনেই পণ্ডিত মশাইকে তার যত্ন নিতে বলেছিলেন। পণ্ডিত মশাই যদিও তাকে কখনো প্রহার করেন নি তবু তারই সম্মুখে অন্য শিশুদের নির্মমভাবে প্রহার করতেন। তাই শিশুটি তার নিজেরও ভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। অথচ পণ্ডিত মশাই-এর বিরুদ্ধে বাবার কাছে সে নালিশও করতে পারেনি, কারণ তিনি তো কখনো তাকে শাস্তি দেননি। পাঠশালায় যেতে (প্রথম ঘণ্টায়) সে কখনো আপত্তি করতো না, কারণ জানতো আপত্তি করলে তার মা-বাবা তাকে ভালবাসবেন না। সুতরাং তাঁদের খুশী করার ইচ্ছে এবং পণ্ডিত মশায়ের প্রতি ভয় এই দ্বন্দ্বের ফলে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার মধ্যে ভিরমি রোগের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞান হয়ে পড়াটা তার অপরাধ নয়; সুতরাং এজন্য বাবা-মা তার প্রতি ক্ষুণ্ণ হতে পারেন না, অথচ অজ্ঞান হয়ে পড়লে পণ্ডিত মশাইকে এড়ানো যায়। সুতরাং ভিরমি রোগটা শিশুর উভয় সংকটের সহজ সমাধান।

আর একটি ছেলে নিপুণভাবে তার বাবার কাছে আপন কৃতিত্ব সম্বন্ধে নানারকম মিথ্যে কথা বলতো। তার কারণ তার দাদা লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল, সেজন্য তার বাবা তাকে খুব ভালবাসতেন, সকলের সামনে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। এই ছেলেটি কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তাই বাবার ভালবাসা লাভের চেষ্টায় সে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিল। যেমন, অন্য কাউকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে কিংবা ছবি আঁকিয়ে তাঁর কাছে বলতো সে নিজেই এসব করেছে। শিশুরা এই রকম অনেক সময় তাদের গভীর হীনতা-বোধ ঢাকবার চেষ্টায় এবং অন্যের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের, ভালবাসা অর্জন করার লোভে নানারকম মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই সব শিশুকে তাদের যোগ্যতানুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেওয়া দরকার। তাদের ভালবেসে নানাভাবে উৎসাহিত করা দরকার। অনেক সময় শিশুরা মজা করেও মিথ্যে কথা বলে। এদের সঙ্গে মাতাপিতার এমন ব্যবহার করা উচিত যেন তারা বুঝতে পারে তাঁরা মিথ্যেটাকে মজা হিসেবেই নিয়েছেন। তাহলে তারা মিথ্যার আশ্রয় ছেড়ে দেবে। মাতাপিতা শিশুর মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে অন্য জিনিসের দিকে তার দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে পারেন ; এবং সেটাই করা ভাল, নইলে শিশুর আত্ম-সম্মানবোধ ব্যাহত হতে পারে।

সহজ সরল শিশুটিকে জটিল সমস্যায় পরিণত করতে মাতাপিতার মনোভাব কতটা দায়ী আমরা এতক্ষণ সে আলোচনাই করেছি। মাতাপিতার অসুস্থ মনোভাব শিশুর আচরণকে দুর্বোধ্য করে তোলার একটি প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ছাড়া আরও অনেক কারণও থাকতে পারে। জড়বুদ্ধিতা এমনি একটি কারণ। পৃথিবীতে সকল মানুষের গায়ের রঙ, উচ্চতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন এক রকম নয়, তেমনি তাদের বুদ্ধিও আলাদা। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান বা প্রতিভাশালী লোকও যেমন আছেন, তেমনি অনেক নির্বোধ ব্যক্তিও আছে। নির্বোধ ব্যক্তিদের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের বুদ্ধির থেকেও কম। বুদ্ধির অভাববশতঃ তারা নিজেদের কাজের ফলাফল বুঝতে পারে না, তাই সহজেই কুপথে চালিত হয়।

শিশুকে সমস্যামূলক করে তোলার পক্ষে কুসঙ্গ আরো একটি কারণ। বাড়ির চারপাশে যারা রয়েছে, চোখের সামনে শিশু যাদের প্রায় সব সময়ই দেখতে পাচ্ছে তারা যদি খারাপ লোক হয় তাহলে অনুকরণপ্রিয় শিশু তাদের অনুকরণ করে খারাপ হয়ে উঠবে। বিশেষতঃ যে সব শিশু বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে তিরস্কৃত হয় তারা সহজেই কুসঙ্গের প্রভাবে পড়ে এবং নানারকম অন্যায় কাজ করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। এই সব শিশুকে সংশোধন করার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক তাদের দীর্ঘকালের তরে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে তারা তখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা, বাড়িতে আনন্দ আয়োজনের অভাব, সমাজের কঠিন শাসন, নীতিশিক্ষার অভাব ইত্যাদি আরো অনেক ছোট বড় কারণেও শিশু অশিষ্ট এবং দুরন্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রতিটি শিশুই একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সকলের জীবনেতিহাসও এক নয়। তা ছাড়া মানুষের মনটি সংবেদনশীল। অন্যের, এমন কি নিজেরও অলক্ষ্যে কখন কী একটি তুচ্ছতম ঘটনা গভীরভাবে একের মনে রেখাপাত করে যায় এবং সকলের অজ্ঞাতে কী করে তার জীবনের মোড়টাকেই পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয় সেকথা সহজে বলা যায় না। যে ঘটনাটি একটি শিশুকে সমস্যামূলক করে তুলেছে অন্য একটি শিশুর ওপর তার তেমন কোন প্রভাব নাও থাকতে পারে, কারণ দুটি শিশুর মন তো একই উপাদানে তৈরী নয়, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার খাতায় যেসব সামগ্রী

জমা হয়ে আছে সেগুলিও আলাদা। এইজন্য শারীর চিকিৎসকের মতো মনোবিজ্ঞানীও শিশুকে দেখা মাত্রই কোন বাঁধাধরা নিয়মে প্রতিষেধের তালিকা তৈরী করে দিতে পারেন না। এজন্য চাই মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা।

শিশু যাতে সমস্যা-শিশুতে পরিণত না হয় বা অপরাধপ্রবণ হয়ে না ওঠে সে জন্য মা-বাবাকে সুরু থেকেই সতর্ক হতে হবে। যতদূর সম্ভব তাঁদের সঙ্গ দিতে হবে শিশুকে। তাকে বুঝতে দিতে হবে যে তাঁরা তাকে ভালোবাসেন এবং সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মাঝে মাঝে তার খোঁজখবর নিতে হবে, সে কী করছে না করছে, তার লেখাপড়া খেলাধুলা বা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত কোন সমস্যা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে খোলাখুলিভাবে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং তার সমস্যা কী সহানুভূতির সঙ্গে বুঝে তার সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁরা যে শিশু ও তার সমস্যার প্রতি উদাসীন নন, তাঁরা যে তার কথা ভাবেন এবং তাকে সাহায্য করতে চান একথাটা শিশুকে বোঝাতে হবে।

শিশুকে লেখাপড়া, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, ইত্যাদি যে কোন ভালো কাজে উৎসাহ দিতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে এবং তার সাফল্যের জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে।

মা বাবা ছেলে মেয়ে সবাইকে সম্ভব হলে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা, তা নাহলে অন্ততঃ ছুটির দিনগুলোতে এক সঙ্গে বসে আহার করতে হবে এবং সে সময় প্রাণ খুলে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। সে সময় শিশুদের নিজস্ব নানারকম অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা যেতে পারে এবং সে সম্বন্ধে সবাই মিলে আলোচনা করা যেতে পারে। খাবার টেবিল বা রান্নাঘর পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসবার একটা প্রকৃষ্ট জায়গা।

সংসারের বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর মতামত নেওয়া যেতে পারে। বৈঠকখানা বা শোয়ার ঘরটা কী রকম সাজানো যেতে পারে, অতিথি এলে তাঁকে কী কী খাওয়ানো যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি খুঁটিনাটি ছোট খাটো ব্যাপারে শিশুর মতামত নিয়ে তাকে মর্যাদা দিলে সে মা-বাবার সঙ্গে একাত্ম হবে এবং নিজেকে বাঞ্ছিত ও স্বীকৃত মনে করবে।

মাঝে মাঝে, বিশেষ করে ছুটি ছাটার দিনে, মা-বাবা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানান রকম চিত্তাকর্ষক কাজে মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন—যেমন কাছে পিঠে

বেড়াতে যাওয়া, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি যাওয়া, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করা, লুডো দাবা ক্যারাম ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা করা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী নেওয়া, ইত্যাদি।

মা-বাবা মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু উপহার দিলে—তা সে বই, রঙের বাক্স, টফি লজেন্স, রঙ পেনসিল, যাই হোক না কেন—ছেলেমেয়েরা খুশী হবে, উৎসাহ বোধ করবে, এবং মা-বাবা যে তাদের ভালবাসেন সেটা বুঝতে পারবে। উপহার যে দামী হতে হবে তেমন কোন কথা নেই, উপহারটাই বড়ো কথা, তার দামটা নয়।

সপ্তাহের বিশেষ একটা দিন মা-বাবা তাঁদের একটি সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। যেমন সোমবারটা ভায়ের জন্য এবং বৃহস্পতিবারটা বোনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন তাঁরা। যে দিনটা যার জন্য নির্দিষ্ট সেদিন তাকে বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে, তার মনের মতো অন্ততঃ একটা খাবার তৈরী করতে হবে, অর্থাৎ সেদিনটা হবে তার দিন, সেদিন সেই-ই মুখ্য। এরকম করলে প্রত্যেকটি শিশুই নিজেকে যথেষ্ট বাঞ্ছিত এবং আদৃত মনে করবে, তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের মনোভাব গড়ে উঠবে।

যত অনাড়ম্বর ভাবেই হোক না কেন প্রতিটি শিশুর জন্মদিনটি পালন করা উচিত। সেদিন তাকে ফুলের মালা চন্দন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে যা হোক কিছু উপহার দিলে এবং তাকে ঘিরে আনন্দ আহ্লাদ করলে সে বুঝবে সকলেই তাকে চায়, তাকে মূল্য দেয়।

প্রত্যেকটি শিশুর নামে মা-বাবা একটি করে লক্ষ্মীর ঝাঁপি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, এবং প্রতিদিনই এক পয়সা দু পয়সা যা পারেন তাতে সঞ্চয় করতে পারেন। তেমনি সম্ভব হলে প্রতিটি শিশুর নামে ব্যাংকে বা পোষ্টাপিসে একটা করে একাউন্ট্ খুলতে পারেন এবং নিয়মিত যা হোক কিছু জমা দিতে পারেন। তবে শিশুকে বোঝাতে হবে যে এ টাকাটা তারই, তার নিজের জন্যই ভবিষ্যতে এ টাকা ব্যয় করা হবে। তাহলে শিশুর মধ্যে একটা অধিকার বোধ, নিরাপত্তা বোধ এবং সুস্থ আত্মবোধ গড়ে উঠবে।

শিশু বিদ্যালয় থেকে বা আত্মীয় স্বজনদের থেকে যে সব প্রশংসাপত্র বা উপহার পাবে সেগুলি বাড়িতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। এজন্যে তাকে নির্দিষ্ট একটা জায়গা এবং আলমারি বা বাক্স দিতে পারলে ভালো হয়। এমনি করে তার মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করবার অভ্যেস গঠিত হবে এবং সে নিজেকে ভালবাসতে ও মূল্য দিতে শিখবে।

এই রকম ব্যবস্থা নিলে মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্পর্কটি সহজ স্বচ্ছন্দ ও মধুর হবে এবং তারা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠবে।

ছেলেমেয়েরা মা-বাবাদের এড়িয়ে চলে কেন ?

ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা-বাবারা অনেক সময় অনেক রকম সমস্যায় পড়েন। মা-বাবাকে লুকিয়ে কাজ করবার প্রবণতা এই রকম একটা সমস্যা। অনেক সময় বাবা-মাকে বলতে শোনা যায়—আমার ছেলেটি তো আগে এমন ছিল না, যা-কিছু করতো আমাকে জানিয়ে, আমার মত নিয়ে তবে করতো। আজকাল সে আমাকে লুকিয়ে অনেক কিছু করে, ধরা পড়ে গেলে হয় চুপ করে থাকে, না হয় মিথ্যে কথা বলে।

কিন্তু তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন এমনটা হলো কেমন করে ? আর এজন্য দায়ীই বা কে ? সহজ সরল শিশুটি যে একদিন বাবা-মাকে অকপটে তার মনের সমস্ত কথা খুলে বলতো, আজ কেন সে তাঁদের এড়িয়ে চলছে ? কেন তাঁদের কাছে তার মনের কথা লুকিয়ে রাখছে ?

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে শিশুর এ ধরনের আচরণের অনেক কারণই থাকতে পারে। বড়রা বড় বলেই, তাঁদের গায়ের জোর বেশী বলে, সংসারে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিটা মোক্ষম বলেই স্বভাবতঃ শিশু বড়দের ভয় করে থাকে। তার ওপর যদি সে দেখে, যা-কিছু সে করতে চায় বড়রা তাতেই বাধা দিচ্ছেন তাহলে ধীরে ধীরে সে বড়দের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শিশু যতই বড় হয় ততই বাইরের আকর্ষণ তার কাছে বাড়তে থাকে, ঘরের চার-দেওয়ালের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। বড় হলে তার বাইরে যাবার দরকারও আছে। কারণ বাইরে তো তাকে একদিন যেতেই হবে, তার জন্য একটা প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে বৈকি। অথচ এমন অনেক বাবা-মা আছেন যাঁরা কিছুতেই শিশুর এই প্রয়োজনটা বুঝতে চান না। তাঁদের আশঙ্কা বাইরে বেরোলেই হয় কুসঙ্গে শিশু খারাপ হয়ে যাবে, নয় তো বা সে কোন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে। শিশু যে বড় হচ্ছে, তার মনের চাহিদা যে বদলে যাচ্ছে, এই বাস্তব সত্য কথাটি অনেক বাবা-মা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। ফলে তাঁদের না জানিয়ে শিশু যদি মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে পালিয়ে যায় তাহলে অবাক হবার কী আছে ? তাঁদের না জানিয়ে এভাবে পালিয়ে যাবার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে, অপরিপক্ক কোমল-মতি শিশুটি কুসংসর্গের প্রভাবে পড়ে বিগড়েও যেতে পারে। বাবা-মা যদি সহানুভূতি-শীল হতেন এবং তার সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক হতেন তাহলে শিশুর এই চাহিদাটার পূরণ হতে পারতো এবং সুসঙ্গে তার সামাজিক বিকাশটিও সুষ্ঠু হতে পারতো।

বাবা-মা যদি শিশুর প্রতি উদাসীন হন তাহলে সে তার মনের কথা তাঁদের জানাবার প্রয়োজন বোধ করে না। কী হবে তাঁদের জানিয়ে ? তাঁদের কিছু বলা আর না বলা দুই-ই তো সমান। উদাসীন বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েরা এমনি করে ধীরে ধীরে চাপা প্রকৃতির হয়ে ওঠে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যথা-বেদনা তারা নিজের মধ্যে চেপে রাখে, আর তার ফলে তাদের মনের ওপর চাপ পড়ে খুব বেশী। তাদের মনে মা-বাবার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাবও দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

বাবা-মা যদি ছেলেমেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ হন তাহলে শিশু তাঁদের কাছে কিছু চেয়ে তাঁদের বিরক্ত করতে চায় না, মনের কথা মনের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে। বাবা-মার প্রতি তার ভালবাসা গভীর হলে সে নিজেকে সংযত করে, তানাহলে অন্যায়ভাবে সে তার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।

এমন অনেক বাবা-মা আছেন বিশেষ করে বাবারা, যাঁরা অত্যন্ত রাশভারী। নিজের ছেলেমেয়েরাও তাঁদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। তাঁরা তাঁদের এই স্বভাবের জন্য আবার অনেক সময় গর্ব বোধও করেন। এ জন্য তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের একটা দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, ফলে শিশুরা এবং আখেরে তাঁরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শিশু কোন এক সময় তার মা-বাবার অপছন্দ কোন কাজ করে বসলে অনেক সময়ই তাঁরা তাকে বুঝতে চেষ্টা না করে, ভালবেসে তার দোষটা তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে, তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকেন, তাকে তিরস্কার করেন, কখনো কখনো মারধোর পর্যন্ত করে বসেন। অনেক সময় বিনা দোষেই তাঁরা শিশুকে তিরস্কার করেন। যেমন, অপটু হাতে ছোট্ট শিশুটি যদি কিছু একটা আনতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তাহলে বাবা-মা তাকে বকাবকি শুরু করে দেন। তাঁরা বুঝতে চান না যে শিশুটি ইচ্ছে করে জিনিসটা ভেঙে ফেলেনি, বরং সেটা এনে দিয়ে তাঁদের খুশী করতেই চেয়েছিল সে। বাবা-মা যদি অহরহ শিশুর প্রতি এই রকম আচরণ করেন তাহলে কেমন করে আশা করা যাবে যে সে তাঁদের বিশ্বাস করে তার মনের কথা তাঁদের কাছে খুলে বলতে উৎসাহ বোধ করবে ?

শিশু যত বড় হয় ততই তার অহং-বোধটি দৃঢ়তর হতে থাকে, সে নিজেকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে ভাবতে শুরু করে, আত্ম-সম্মান বোধ তার মধ্যে তীব্রতর হয়। মা-বাবারা যদি তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে সব সময় তাঁদের ইচ্ছে মতো তাকে চলতে বাধ্য করেন তাহলে তাঁদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা আর সহজ থাকতে পারে না, তাঁদের লুকিয়ে সে অনেক কিছুই করতে শুরু করে দেয়।

এমনিতর অনেক কারণেই শিশুরা তাদের বাবা-মার কাছ থেকে নিজেদের ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং বাইরের অবাঞ্ছিত প্রভাবে পড়ে অনেক সময় কুপথে পা বাড়ায়। পরিণামে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুই-ই নষ্ট হয় এবং বাবা-মারও দুঃখ কষ্টের অন্ত থাকে না। এমন সময় তাঁদের হুঁশ হয় যখন আর করবার মত কিছুই থাকে না।

তাই ছেলেমেয়েদের এবং আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের দেখতে হবে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা যেন সহজ হয়। গভীরভাবে তাদের ভালবাসলে, তাদের অভাব-অভিযোগগুলি দরদ দিয়ে বুঝবার এবং যথাসাধ্য মেটাবার চেষ্টা করলে, তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করলে, ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের তিরস্কার ও পীড়ন না করে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সংশোধন করে দিলে, তাদের মতামতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিলে তারা বুঝতে পারবে বাবা-মা তাদের কতো আপন। তখন তাঁদের লুকিয়ে কিছু করবার ইচ্ছে আর তাদের হবে না। কোন কারণে বাবা-মা তাদের সকল ইচ্ছে পূরণ করতে না পারলেও তাদের মনে তখন কোন ক্ষোভ থাকবে না, কারণ তারা বুঝতে পারবে তাদের জন্য তাঁদের মন জুড়ে আছে গভীর ভালবাসা আর প্রগাঢ় আন্তরিকতা।

বাবা-মা নিজেরা যদি সহানুভূতিশীল হন, যদি ভালবেসে তাদের আপন করে নিতে পারেন তাহলে শিশুরাও নিশ্চয়ই ভালো হবে, বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে সকল শিশুর সঙ্গে মিশলেও নিজেরাই ঠিক ঠিক সঙ্গী বেছে নিতে পারবে। শিশুর সব ইচ্ছেকেই যে মেনে নিতে হবে এমন নয়, এমন অনেক ইচ্ছে থাকতে পারে যা মেনে নেওয়া চলে না। সে সব ক্ষেত্রে বাবা-মাকে একটু শক্ত হতে হবে বৈকি। কিন্তু তাতে কী? শিশু যদি সত্যি বুঝতে পারে তাঁরা তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তাহলে তাঁদের বারণ, এমন কি মৃদু শাসনেও সে ক্ষুণ্ণ হবে না। বিশ্বকবি তাই তো বলেছেন—"শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো"।

আরও একটা কথা। বড়দের আচরণের অসঙ্গতিও অনেক সময় শিশুদের থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যে কাজটা এখন তাঁরা দেখেও দেখছেন না, অথবা মেনে নিচ্ছেন, কিংবা নিজেরাই করতে বলছেন, অন্য সময় আবার তারই জন্য শিশুকে তাঁরা তিরস্কার করছেন। যেমন, কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাই শিশুকে দিনের বেলা ঘুমোতে বলেন, কিন্তু কোন এক সময় সে যদি নিজে থেকে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়ে—হয়তো বা দৈহিক অসুস্থতা কিংবা ক্লান্তির জন্যই, তাহলে তাঁরাই আবার তাকে এজন্য বকাবকি শুরু করে দেন। শিশু তাই ঠিক

বুঝে উঠতে পারে না তাঁরা তার কাছে ঠিক কী চান। তাই সে তাঁদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলার ব্যাপারে বাবা এবং মায়ের ভূমিকা পরিপূরক। স্বাভাবিক কারণেই মায়ের হৃদয়টি কোমল এবং স্নেহপরায়ণ বলে তাঁর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের অন্তরঙ্গতাটা একটু বেশী হয়, অনেক সময় মাকেই বাবা আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। সুতরাং তাঁর ভূমিকাটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। তবে দায়িত্ব উভয়েরই সমান। নানা কাজে ব্যস্ততা এবং সময়াভাবের জন্য বাবা যেখানে ছেলেমেয়েদের ঠিক মত সঙ্গ দিতে পারেন না সেখানে মাকেই বেশী করে ঘাটতিটা পুষিয়ে দিতে হবে, আর মা যখন গৃহ-কাজে অথবা অন্য কোন কিছুতে ব্যাপৃত থাকবেন তখন বাবাকেই সময় করে নিতে হবে ছেলেমেয়েদের জন্যে। ছুটিছাটার দিনে, অবসর মুহূর্তে তিনি তা নিশ্চয়ই করতে পারবেন। সব সময়ই যে শিশুকে সময় দিতে হবে এমনও নয়. কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের একটু আধটু মিষ্টি কথা বললে তাতেও অনেক কাজ হবে। ইচ্ছে থাকলে আর সন্তানের প্রতি যথার্থ দরদ থাকলে অনেক সমস্যারই সমাধান তাঁরা সহজেই করে ফেলতে পারবেন।

শিশুমনের স্বাস্থ্য বিধান

শিশুকে সার্থকভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে যেমন দৃষ্টি দিতে হবে তার দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে, তেমনি সতর্ক হতে হবে তার মনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও। দেহ-মনের নিবিড় সম্পর্কের কথা আমরা আগেই বলেছি। সুস্থ দেহ যেমন সুস্থ মনের আধার, তেমনি বলা চলে সুস্থ মনও সুস্থ দেহের নিয়ামক। আমরা সকলেই জানি দেহ সুস্থ থাকলে মনও সতেজ থাকে, আবার মনের সুস্থতা দেহকেও সঞ্জীবিত করে। সুতরাং শিশুকে সার্থক ও সুন্দরভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে শুধু তার দেহের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে না, দৃষ্টি দিতে হবে তার মনের স্বাস্থ্যের দিকেও।

'মনের স্বাস্থ্য'—কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানতে হবে। স্বাস্থ্য বলতে সাধারণতঃ আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যই বুঝে থাকি; কিন্তু সেটাই সব নয়। মনেরও একটা স্বাস্থ্য আছে। মনের যে নানারকম ব্যাধি আছে একথাটা তো আজকাল প্রায় সকলেরই জানা। ব্যাপকতর অর্থে মনের ব্যাধিমুক্ত অবস্থাকেই মনের স্বাস্থ্য বলা চলে। বিশেষ একটি ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ভালো তখনই বলা চলে যখন (ক) তার মনের ক্রিয়াকলাপ ঠিক ঠিক মতো সম্পন্ন হয়; (খ) তার মানসিক ক্ষমতাগুলি যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করে এবং (গ) সে নিজের ও অপরের সঙ্গে সহজভাবে মানিয়ে চলতে পারে। মনের বহু বিচিত্র ক্রিয়াকলাপকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি—জ্ঞান (cognition), বোধ (affect) ও কর্মপ্রেরণা (conation)। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায়ও মনের এই তিনটি প্রধান বিভাগের কথাই বলা হয়েছে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ (ভক্তি এক প্রকার অনুভূতি বা বোধ) ও কর্মযোগের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে। একটা উদাহরণ দিলে মনের এই তিন রকম কাজের অর্থ সহজে বোঝা যাবে। কোন একজন পথিক পথের ধারে একটি ফুল ফুটে থাকতে দেখে সেটি তুলে নিল। তার এই আচরণটা বিশ্লেষণ করলে তিন রকম কাজের খোঁজ মিলবে। প্রথমতঃ সে ফুলটি দেখলে, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তার জ্ঞান জন্মালো, সে ফুলটিকে জানলো। দ্বিতীয়তঃ ফুলটি দেখে সে খুশী হলো, অর্থাৎ ফুলের সৌন্দর্য তার মনে আনন্দের অনুভূতি জাগালো। তৃতীয়তঃ ফুলটি তার খুবই ভালো লাগায় সেটি সে তুলে নেবার প্রেরণা অনুভব করলে এবং তার এই প্রেরণাই পরিণতি লাভ করলো তার কাজের ভেতর। এই উদাহরণে মনের তিনটি দিকের পরিচয় সহজ করে দেওয়া হলো। কিন্তু আসলে

মনের কাজগুলি এত সরল নয়। জানা, শেখা, মনে রাখা, মনে করা, চিন্তা করা, কল্পনা করা, বিচার বিবেচনা করা, ইত্যাদি কাজগুলি মনের জ্ঞানাত্মক (cognitive) কাজ। ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, আক্রোশ, ভালবাসা, বিরক্তি, বিস্ময়, মোহ, মমতা ইত্যাদি অজস্র অনুভূতি বোধ করা মনের বোধাত্মক (affective) কাজ। আর ছুটে পালানোর, এগিয়ে যাবার, স্থির হয়ে থাকার, নাড়াচাড়া করার, ভেঙেচুরে ফেলার, আক্রমণ করার—এক কথায় কোন কিছু কাজ করবার প্রেরণা মাত্রই মনের কর্মাত্মক (conative) কাজের উদাহরণ।

যিনি সুস্থ মনের অধিকারী তাঁর এই তিন ধরনের কাজের মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকবে এবং তাঁর বিভিন্ন ক্ষমতাগুলির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। সুস্থ মানুষ বন্ধুদর্শনে খুশী হয়ে তাকে আপ্যায়ন করে, এটাই স্বাভাবিক এবং জ্ঞান, বোধ ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতির পরিচায়ক। কেউ যদি বন্ধুকে দেখে তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে অথবা তাকে আক্রমণ করে তাহলে বুঝতে হবে তার মনের সঙ্গতি নষ্ট হয়েছে। তেমনি কেউ যদি আনন্দের সংবাদ শুনে কাঁদতে সুরু করে দেয় কিংবা শোকের সংবাদ পেয়ে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচ জুড়ে দেয় তাহলে তারও মানসিক ভারসাম্য সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে। আসল কথাটা হলো, ঠিকঠিক অনুভূতি বোধ করা এবং সেই মতো আচরণ করাই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। এ বিষয়ে শিশুকে গোড়া থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার। সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্যের দিকে, দুঃস্থের দুর্দশার দিকে, মাননীয়ের মহত্ত্বের দিকে, ভয়ংকরের ভয়াবহতার দিকে, ঘৃণ্য বিষয়ের কদর্যতার দিকে—এই রকম অজস্র বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা পরিবেশের মূল বিশিষ্টতাগুলির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং তার সামনে আদর্শ আচরণের উদাহরণ স্থাপন করে তাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শিক্ষায় গলদ থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই মনের সামগ্রিক বিকাশ ঘটতে পারে না ; কোন দিকে উন্নতি হয়, কোন দিক বা অবহেলিত থেকে যায়। তাই অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও কোমল চিত্তবৃত্তির সন্ধান পাইনা ; অনেক প্রকৃত কবির কবি-প্রতিভাকে আত্মপ্রকাশের প্রেরণার অভাবে নীরব কবিত্বে পর্যবসিত হতে দেখি। এমনিভাবে কত না উজ্জ্বল সম্ভাবনা অপ্রকাশের অন্ধকারেই থেকে যায়। শিশুর মনে জ্ঞান বোধ ও কর্মের দিকগুলির যাতে সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক দিকের বিকাশ ব্যাহত হয়ে অন্য দিকের বিকাশ সম্পন্ন হলে তাকে সুস্থ বিকাশ বলা যায় না। শিশুকে তার পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলতে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার শিখন (learning), স্মরণ (recall), চিন্তন (thinking),

কল্পন (imagination) ইত্যাদি জ্ঞানাত্মক মানসিক প্রক্রিয়াগুলির যথাযথ উৎকর্ষ ঘটাতে হবে। যথার্থ জ্ঞান যাতে তার মনে যথার্থ অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং উপযুক্ত আচরণের মধ্যে যাতে সেই অনুভূতির প্রকাশ ঘটে সেই রকম শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে। তাহলেই সে একটি সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে নিজের এবং অন্যের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি (adjustment) রক্ষা করে চলতে পারবে।

যিনি নিজেকে নিয়ে খুশী নন—যিনি নিজেকে রিক্ত অসমর্থ অপদার্থ ভাবেন, অহরহ অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হন ; যিনি অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারেন না, পদে পদে অন্যের সঙ্গে যাঁর বিরোধ বাধে ; যিনি অতি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসচেতন ; যিনি অল্প আঘাতেই ভেঙে পড়েন, অকারণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ক্ষত বিক্ষত হন, তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যটি যে বিড়ম্বিত সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন এমন হয় ?

মনঃসমীক্ষকদের (psychoanalysts) মতে অপসঙ্গতির (maladjustment) প্রধান কারণটিই হলো দুর্বিষহ অন্তর্দ্বন্দ্ব (conflict)। অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে আছে বাসনা বা ইচ্ছার অপূর্ণতা। যেটা প্রচণ্ড ভাবে চাই সেটা যখন পাইনা, তখন মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় ; মনকে হতাশায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। এরকম ক্ষেত্রে মানুষ তার নিজের ওপর আস্থা এবং শ্রদ্ধা দুইই হারিয়ে ফেলে। তার ইচ্ছাপূর্তির অন্তরায় ভেবে কারণে অকারণে অন্যকে সে দায়ী করে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। এই ভাবে তার আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে শিশুরা কী চায় এবং যথা সম্ভব সেগুলি মেটাবার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন তারা নিজেরাই নিজেদের আকাঙ্ক্ষার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করতে পারে। উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে। প্রত্যেকটি শিশু (বড়রাও) চায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা, কৃতিত্বের গৌরব, ভালবাসা এবং নিরাপত্তা। যদি আমরা তাকে তার যোগ্যতারিক্ত কাজের দায়িত্ব দিই এবং তার বিফলতার জন্যে তিরস্কার করি ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাফল্যকে উপেক্ষা করে যদি তাকে প্রশংসা ও উৎসাহ দানে বিরত থাকি ; যদি অহর্নিশ তার ত্রুটিগুলোর দিকেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে বুঝিয়ে দিই যে সে আমাদের ভালবাসার অনুপযুক্ত ; যদি আমাদের আচরণে আমাদের ওপর আস্থা হারিয়ে সে নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করে তাহলেও কি আমরা আশা করবো যে তার মানসিক স্বাস্থ্যটি অক্ষুণ্ণ থাকবে ? আমাদের এরকম আচরণের ফলে তার মনে কি প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে না, সে কি নিজেকে বঞ্চিত

ভেবে সন্ত্রস্ত বা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না? অতএব শিশুদের মৌলিক চাহিদাগুলি কী (আমরা পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি) আমাদের জানতে হবে এবং যথাসাধ্য সেগুলি পূরণ করতে হবে। অবশ্য, শিশু অনেক সময় এমন অনেক কিছুই আশা করে যা পূরণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। যেমন, কোনও ধনীর দুলালের দামী খেলনা দেখে আমার শিশুটিও হয়তো তেমনি একটা খেলনা চাইলো যা কিনে দেবার সঙ্গতি আমার নেই। এক্ষেত্রে অল্প মূল্যের একটা খেলনা কিনে দিয়ে ঘাটতিটা আমি অনায়াসেই পূরণ করে দিতে পারি আমার অজস্র স্নেহ আর সহানুভূতি দিয়ে। আমার সন্তান যদি আমার অফুরন্ত স্নেহের সন্ধান পায় তাহলে নিশ্চয়ই আমার স্নেহের উপঢৌকণটি, তা সে যতই ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ হোক না কেন, হাসি মুখে গ্রহণ করবে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের একটু ভালবাসা, একটু স্নেহ সহজেই শিশুর অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। কখনো কখনো শিশুর কামনা-বাসনা ও আচার-আচরণ অনৈতিক বা অসামাজিকও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে তার ওপর রাগ না করে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাকে ভালবাসলেও তার এই সব কামনা-বাসনা বা আচার-আচরণ সমর্থন করা চলেনা। সে নিজেকে সংশোধন করবে তখনই, যখন বুঝতে পারবে এরকম ক্ষেত্রে সে বড়দের ভালবাসা হারায় নি, তার প্রতি তাঁদের ভালবাসা আগের মতোই অটুট আছে।

কোন একটি কামনা পূরণ না হবার প্রধান কারণ দুটি—একটি পরিবেশের প্রতিকূলতা, অন্যটি নীতিবোধের সঙ্গে কামনাটির অসঙ্গতি। মনে করা যাক গাছে পাকা আম দেখে শিশুর সেটি খেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু ফলটা অনেক উঁচুতে থাকায়, সে গাছে উঠতে না জানায়, তাকে সাহায্য করবার মতো অন্য কেউ কাছে না থাকায় তার এই ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে পারলো না। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা পূর্তির অন্তরায় যেটা তা হলো পরিবেশের প্রতিকূলতা। আবার অনেক পীড়াপীড়ি করেও বন্ধুর খেলনার মতো একটা খেলনা না পেয়ে একটি শিশুর ইচ্ছে করলো বন্ধুর খেলনাটি চুরি করবার। সুযোগও পেলো সে, কিন্তু বাধা এলো তার নিজের ভেতর থেকে। সে বার বার শুনেছে চুরি করা মহাপাপ এবং এ ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গাঁথা হয়ে গেছে। সেটা এতই প্রচন্ড যে সুযোগ পেয়েও খেলনাটা সে চুরি করতে পারলো না। এখানে তার নীতিবোধ তার ইচ্ছা পূরণের অন্তরায়।

কখনো কখনো যুক্তি দিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছা পূরণের অসম্ভাব্যতা

বুঝতে পারি এবং স্বেচ্ছায় সে ইচ্ছে ত্যাগ বা নিরোধ (suppress) করে অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছেটি এমনি প্রবল, আর আমাদের নীতিবোধের সঙ্গে তার সংঘাতটাও এতই প্রচণ্ড যে, সেটা কোন যুক্তিরই ধার ধারে না। অথচ তার পূরণও সম্ভব নয়। এ রকম অবস্থায় ইচ্ছাটি আমাদের চেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়ে, অর্থাৎ অবদমিত (repressed) হয়ে, অবচেতন মনে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অবদমিত হলেও সেটি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে না; অবিরাম চেষ্টা করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরিতার্থ হতে। তার ফলে আমাদের আচরণে নানারকম অপসঙ্গতির লক্ষণ দেখা দেয়। এই ধরনের কতকগুলি লক্ষণ এবং তাদের কারণ ও প্রতিবিধানের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

আমাদের যে সব আশা বাস্তবে পূরণ হয়না সাধারণতঃ দিবাস্বপ্নের (day-dreaming) মাধ্যমে আমরা সেগুলি পূরণ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু দিবাস্বপ্নের মাত্রা এবং গভীরতা যদি বাস্তব বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাহলে সেটা অপসঙ্গতিরই লক্ষণ। গয়লানী আর তার দুধের হাঁড়ির গল্প তো সকলেরই জানা। দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে সে তার সামান্য সম্বলটুকুও খুইয়েছিল। দিবাস্বপ্ন স্বাভাবিকতার সীমানা ছাড়িয়ে গেলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। তখন কল্পনা বাস্তবের মতোই সজীব হয়ে ওঠে এবং কল্পনার বস্তুকে বাস্তব বলে ভুল করে আমরা নানারকম অসঙ্গত আচরণ করে থাকি। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অনেক বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি বাস্তব বুদ্ধি হারিয়ে কল্পিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, তাদের আস্ফালন করছে, আক্রমণ করছে। এদের বেলা নানা রকম অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) ঘটে থাকে, অর্থাৎ এরা বাস্তবে যা নেই তা-ই প্রত্যক্ষ করে। দিবাস্বপ্ন চরম হলে মানুষ চিত্তভ্রংশীবাতুলতা (schizophrenia) ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তখন সে ধীরে ধীরে নিজেকে বাস্তব জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে কল্পনার জগতে নিমজ্জিত হয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে মৌলিক জৈব চাহিদাগুলি মেটাবার ক্ষমতা টুকুও সে হারিয়ে ফেলে এবং তার যত্ন নেবার যদি কেউ না থাকে তাহলে অকালে মৃত্যু বরণ করে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে শিশু যেন খুব বেশী কল্পনাপ্রবণ না হয়। যে শিশু প্রায়ই একলা থাকতে ভালবাসে, আলস্যভরে যখন তখন বিছানায় শুয়ে কাটায়, কোন কিছুতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না, প্রায়ই অসুস্থতার কথা বলে, বুঝতে হবে তার মধ্যে দিবাস্বপ্নের মাত্রাধিক্য ঘটেছে। এরকম ক্ষেত্রে তাকে সঙ্গ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, ভালবাসা ও সহানুভূতি জানিয়ে, নানারকম মজার মজার

কাজের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে, মনের কথা খুলে বলতে উৎসাহ দিয়ে, এবং তার সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে, বাস্তবমুখী করতে হবে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিস্তার পাবার আর একটা উপায় হলো অবাস্তব যুক্তি স্থাপন বা অহেতুকতা (rationalisation)। অনেক সময় আমরা বাসনা পূরণ না হলে তার সপক্ষে একটা যুক্তি খাড়া করি আঙুর ফলে বঞ্চিত শেয়ালের মতো, কিংবা বলি যা ঘটে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঘটে থাকে। যেমন পরীক্ষায় ফেল করলে বলি ব্যর্থতাই সাফল্যের ভিত্তি স্তম্ভ Failure is the pillar of success)। আবার, প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন একটা অন্যায় কাজ করে ফেললে, কিংবা নিজের মনে অন্যায় চিন্তার উদয় হলে আমাদের আহত নীতিবোধটাকে শান্ত করবার জন্যও নানা রকম উদ্ভট যুক্তির অবতারণা করি। যেমন বলি সকলেই এ কাজ করে, সুতরাং আমার আর অপরাধ কোথায়? না বলে অন্যের জিনিস নিয়ে এসে বলি—কোন জিনিসেই কারো জন্মগত অধিকার থাকতে পারে না; ওর অনেক, আমার একটাও নেই; সুতরাং এটা নিয়ে এসে আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি। অবান্তর যুক্তি স্থাপনের মাত্রা যদি অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায় তাহলে ব্যক্তি তার নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে নানারকম অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে নির্দ্বিধায় নিজেকে লিপ্ত করবে এবং সমাজের পক্ষে সে রীতিমত ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে শিশু যেন তার কাজের বা ইচ্ছার ভালোমন্দ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। এজন্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে হবে; উদাহরণ ও উপদেশের সাহায্যে তার নীতিবোধটিকে সুস্থ করে গড়ে তুলতে হবে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে আমরা অনেক সময় আমাদের অসাফল্যের জন্য অন্যকে দায়ী করে থাকি। এই মানসিক প্রক্রিয়াটির নাম প্রক্ষেপ বা অভিক্ষেপ (projection)। 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা', 'A bad workman quarrels with his tools', ইত্যাদি প্রবাদবাক্যগুলি অভিক্ষেপের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরীক্ষায় ফেল করে নিজেকে দোষ না দিয়ে দোষ দিই অন্যকে —বলি বই ছিল না, ইস্কুলে পড়া হয়নি, শিক্ষক ভাল নয়, ইত্যাদি। ভুলে যাই যে একই অবস্থায়, এমনকি আরও শোচনীয় অবস্থায় থেকেও আমারই অন্যান্য সহপাঠীরা কৃতিত্ব অর্জন করেছে। নিজেকে অক্ষম ভাবতে কেউ চায় না; কেউই চায় না নিজেকে অপরাধী মনে করতে। তাই আত্মগ্লানির হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই। অতিরিক্ত

প্রক্ষেপের ফলে সন্দেহবাতিকতা বা ভ্রমবাতুলতা (paranoia) ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই রকম ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অন্যকে অকারণে সন্দেহ করে এবং সে তার ক্ষতি করতে বা প্রাণনাশ করতে চেষ্টা করছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাকে আক্রমণ, এমন কি হত্যাও করতে পারে। এরা সমাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। অন্যান্য বিষয়ে এরা স্বাভাবিক বলে লোকে এদের সহজে বুঝতে পারে না।

যারা প্রতি কাজে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য অন্যকে দোষ দেয় বুঝতে হবে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার, সত্যের সম্মুখীন হবার, সংস্কারমুক্তভাবে আত্মবিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। এরকম লোক কখনোই মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। এই সব ক্ষমতা যাতে শিশুর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের তাই সদাসতর্ক থাকতে হবে। নিজের ত্রুটি না দেখতে পারলে আত্মোন্নতি সম্ভব নয়। অবশ্য দোষটা নিজের মতো অন্যেরও থাকতে পারে। আসল কথাটা হলো, নিজের যেটুকু দায়িত্ব তাকে অস্বীকার করলে চলবে না ; বিশ্লেষণটাকে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত হতে হবে।

একটা ক্ষেত্রে না পাবার জ্বালা আমরা অনেক সময় অন্য ক্ষেত্রে অতিপূর্তি বা ক্ষতি পূরণের (compensation) মাধ্যমে জুড়োতে চাই। যে খেলা ধুলোয় অক্ষম, দুর্বল বা পঙ্গু সে তার রিক্ততার বেদনা ভুলতে চায় লেখাপড়া, ছবি আঁকা, গান গাওয়া বা এই রকম অন্য কোন কাজে কৃতিত্ব অর্জন করে। কিন্তু এই সব কৃতিত্ব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে সে নিজেকে অনেক বড় এবং অন্যকে অনেক ছোট ভাবতে সুরু করে। অন্য কারো মতামত গ্রহণ করতে পারে না, কোন রকম বিরোধিতা সহ্য করতে পারেনা, নিজেকে সব সময় জাহির করতে চেষ্টা করে, অন্যের প্রতিটি কাজে দোষ ধরে, অপরের সমূহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তার এই অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘা (sense of superiority) তাকে অন্যের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। তার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে লোকে তাকে উপেক্ষা উপহাস বা করুণা করে থাকে, অন্যের সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারেনা। আমরা বলেছি কোন্ শিশুর কী কী বিষয়ে উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা আছে সেগুলি আবিষ্কার করে তাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যেন নিজেকে খুব বেশী মূল্য দিয়ে সে অসম্ভব রকমের অহংকারী হয়ে না ওঠে, অন্যকে ছোট না ভাবে।

মানসিক অস্বাস্থ্য বা আচরণগত অপসঙ্গতির দেহগত কারণও (physical factors) থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের অপুষ্টি শুধু শরীরের শক্তিই হ্রাস করে না, সহ্যশক্তিকেও ব্যাহত করে, যার ফলে অল্প আঘাতেই মানুষ ভেঙে

পড়ে। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর আমাদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির (endocrine glands) প্রভাবও অনেক। যেমন থাইরয়েড গ্রন্থির রসক্ষরণে ঘাটতি দেখা দিলে দেহের পুষ্টি যেমন ব্যাহত হয়, মনের বিকাশও (বিশেষ করে বুদ্ধিগত) তেমনি বাধা পায়। এই গ্রন্থিটির অতিরিক্ত রসক্ষরণে মানুষ অত্যধিক চঞ্চল, ভীরু, খিট্‌খিটে ওয়ে ওঠে, তার মেজাজের সুরটা যেন সব সময়ই সপ্তমে সাধা থাকে। দাঁতের রোগ এবং টন্‌সিলের অসুখে দীর্ঘ কাল ভুগলে দেহ ও মন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব শারীরিক অবস্থা অনেক সময় ব্যক্তি জন্মগতভাবেই পেয়ে থাকে, আবার কখনো বা পরিবেশই এজন্য দায়ী। টাইফয়েড্‌ বা এই ধরনের কঠিন ব্যাধি অনেক সময় মস্তিষ্ক কিংবা গ্রন্থিগুলিকে অংশতঃ বিকল করে দেয় এবং তার ফলে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে স্নায়ুতন্ত্রে অনেক সময় রীতিমত বিপর্যয় ঘটে যায়, যার ফলে মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সাবধান এবং সতর্ক হলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে শিশুকে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত রাখা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হতে পারে।

Jacoboson প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অন্যতম প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত পরিশ্রম বা মনের ওপর অতিমাত্রায় চাপ এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও অবকাশ বিনোদনের সুষ্ঠু আয়োজনের অভাব। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে চূড়ান্ত ক্লান্তি ঘটে এবং দেহমনের অবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। আশা আকাঙ্ক্ষা যদি ক্রমাগত এবং দীর্ঘকাল ধরে অপূর্ণ থেকে যায় তাহলে অবরুদ্ধ আবেগরাশি মনকে ক্লান্ত ও দুর্বল করে দেয়। এরকম অবস্থায় মানুষ সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এবং তার আচরণে নানা রকম অপসঙ্গতি প্রকাশ পায়। Jacobson তাই তাঁর বিনোদন তত্ত্বে (Theory of Relaxation) আনন্দময় অবকাশের ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমার একটি ছাত্রের কথা না বলে পারছিনা। তিনি দেশ ভাগের পর পশ্চিম বঙ্গে চলে আসেন এবং খুবই অনটনের ভেতর কোন রকমে পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন। একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকেই ট্রেনিং নেবার জন্যে কলেজে ভর্তি হন। ভদ্রলোক ছিলেন স্থির ধীর। প্রথম পরীক্ষায় তিনি অনেকগুলি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর কৃতিত্ব এবং সকলের সপ্রসংশ উৎসাহ তাঁকে পড়াশোনায় আরও অনেক উদ্বুদ্ধ করে তোলে, অবশ্য এমনিতেই তিনি ছিলেন যথেষ্ট পঠনপ্রিয়। কিন্তু শুধু বই নিয়ে বসে থাকলেই চলেনা, তাঁকে সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, স্কুলের পড়া পড়াতে হয়, কলেজে আসতেও হয়। আবার কলেজ থেকে ফিরে টুইশানীতে

বেরিয়ে যান। রাত্রি সাড়ে নটায় বাড়ী ফিরে আবার পড়তে বসেন। পরে শুনেছি অনেক দিনই তিনি অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো করতেন। স্বভাবতঃই এত পরিশ্রম তাঁর সহ্য হলোনা। ক্রমে ক্রমে তাঁর মস্তিষ্কের বিকার দেখা দিল, নিদ্রা তাঁকে ত্যাগ করলো, তাঁর আচরণে অসঙ্গতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলো এবং ট্রেনিং শেষ না করেই তাঁকে আশ্রয় নিতে হলো উন্মদাগারে। এই উদাহরণটি Jacobson-এর মতবাদের সমর্থন করে। সুতরাং শিশুর দেহমনের ওপর যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সে দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। অনেক বাবা-মাকে দেখেছি সব সময়ই তাঁদের ছেলেমেয়েকে পড়তে বলেন, গাদা গাদা পাঠের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেন, এমন কি যখন খেলবার সময় তখনও। এর ফলে তারা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয় এবং লেখাপড়ায় তাদের আগ্রহ থাকে না। এমনি করে কত বুদ্ধিমান শিশু আগ্রহ হারিয়ে লেখাপড়ায় অকৃতকার্য হয়, তাদের আচরণে নানারকম অপসঙ্গতি দেখা দেয়।

আর একটি মতবাদ হলো—বহু কারণ তত্ত্ব (Multiple Factor Theory)। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে মানসিক ভারসাম্য হারাবার মূলে একটা নয়, অনেকগুলি কারণের সম্মিলিত প্রভাব বর্তমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কতকগুলি সৈন্যের ক্ষেত্রে দেখা গেল উপবাস, অনিদ্রা এবং ক্লেশকর পরিস্থিতির চাপেও তারা ভেঙে পড়েনি, কিন্তু যখন তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলো তখন আর মনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। অকস্মাৎ বা একদিনেই মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়না, বহু দিনের বহু পুঞ্জীভূত প্রভাব ধীরে ধীরে মনের ওপর ক্রিয়া করতে থাকে এবং শেষে একদিন নানাবিধ লক্ষণের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে। প্রায় সকলক্ষেত্রেই একটা না একটা নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনের বিকার ঘটে থাকে —যেমন, মা বা বাবার মৃত্যুতে প্রচণ্ড শোক পেলে, কিংবা পরীক্ষায় ফেল করলে, কিংবা অতি নগণ্য বা আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে—যেমন আমার পরিচিত কোন এক ব্যক্তি একটা আবেগাত্মক কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে সে উত্তেজনাকে আর সংযত করতে না পেরে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। যে ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মস্তিষ্ক বিকৃতির সূত্রপাত হয় তাকে বলা হয় প্ররোচক। (precipitating factor)। প্ররোচক মস্তিষ্ক বিকৃতির আসল কারণ নয়, একটা উপলক্ষ মাত্র। মাথা খারাপ হবার, প্রবণতা আগে থেকেই থাকে, প্ররোচক সেই প্রবণতাটাকে উস্কে দেয়।

আর একটি মতবাদ এই যে, উদ্দীপনা (stimulation) অথবা প্রতিক্রিয়ার (response) আধিক্য কিংবা অল্পতার জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটতে

পারে। যে পরিবেশে বৈচিত্র্য নেই, মনের পরিপুষ্টির অনুকূল যথেষ্ট আয়োজন নেই, সেখানে শিশুমনের সুস্থ বিকাশ ঘটতে পারে না। এই কারণে সাধারণতঃ গ্রামের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ শহরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় মন্থর হতে দেখা যায়। কিন্তু অতিরিক্ত উদ্দীপনাও ভালো নয়। যদি আয়ত্তীকরণ (assimilation) করবার সুযোগ না দিয়ে শিশুকে অবিরাম নতুন নতুন বিষয় শেখানো যায় তাহলে কোনটাই সে ঠিকমত শিখতে পারবেনা, হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আজকের দিনে সমাজে অপসঙ্গতি যে ভাবে ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে তার অন্যতম প্রধান কারণই হলো বর্তমান সভ্যতায় অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও অজস্র উদ্দীপকের বিভ্রান্তিকর অনুপ্রবেশ। মানুষ যেন দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে, মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রামের সময় নেই। হাজারো আকর্ষণ তার মনের ওপর ক্রিয়া করছে, অজস্র দাবি তার মনের ওপর দুর্বহ চাপের সৃষ্টি করে চলেছে। তাই সে আজ বিমূঢ়, বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধি। কেউ হিপি সেজে মুক্তি চাইছে, কেউ হরে কৃষ্ণ সংঘের সদস্য হয়ে নিষ্কৃতির পথ খুঁজছে, কেউ বা প্রচলিত নীতিবোধে জলাঞ্জলি দিয়ে নাশকতামূলক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ ঘোষণা করছে। আধুনিক যুগের পলায়নী বৃত্তি (escapism) ও উচ্ছৃংখলতার (indiscipline) মূলে আছে মানব মনের ওপর এই দুর্বিষহ চাপ। আবার একথাটাও সত্যি যে, শিশুকে যদি বাধা-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখা হয়, 'পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে বেঁধে বেঁধে' রাখা যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে তাকে সাড়া দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, যদি তার অবরুদ্ধ আবেগ রাশির বিমুক্তির অবকাশ না থাকে, তাহলে সে আড়ষ্ট ও সংকুচিত হয়ে অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সুতরাং অতিরিক্ত সক্রিয়তা বা অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়তা কোনটাই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ তার মধ্যে একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবন দর্শন গড়ে তুলতে হবে যাতে সে বাস্তবকে—তার জয়-পরাজয়, বাধা-বিপত্তি, রিক্ততা-পূর্ণতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন সে আমাদের কাছে তার সমূহ সমস্যার কথা খুলে বলে, যেন মনের কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে গুমরে গুমরে কষ্ট না পায়। তৃতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তার সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন আঘাতে সে জর্জরিত না হয়; আঘাত সহ্য করতে পারে। তাকে স্নেহাঞ্চলে আড়াল করে না রেখে স্বাধীনতা দিতে হবে, দায়িত্ব দিতে হবে, সাহস দিতে হবে। চতুর্থতঃ

তার অবরুদ্ধ আবেগরাশি যাতে খেলাধূলা ও বিবিধ সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে বিমুক্তি লাভ করে তার সুযোগে করে দিতে হবে। শিশুর আচরণে অতিমাত্রায় অপসঙ্গতি ঘটলে কালক্ষেপ না করে মনস্তাত্ত্বিক, মনঃসমীক্ষক বা মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

শিশু-সম্পর্কিত প্রবাদ-প্রবচন

বিভিন্ন দেশে বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। কে কবে প্রবাদগুলি রচনা করেছিল তা কেউ জানে না। Encyclopaedia Britannica (Vol. 18) এবং Encyclopaedia of the Social Sciences (Vols. 9 & 10) গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে, প্রবাদগুলির উৎস সন্ধান করা নানা কারণেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রবাদগুলির প্রাচীনত্ব, তাদের ক্রমান্বয় পরিবর্তন, পুরাতন প্রবাদকে কেন্দ্র করে নূতন প্রবাদের উদ্ভব—গবেষণার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদগুলি ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত নয়, সেগুলি গণমনের ফসল, বহু মানুষের যুগ্ম-চিন্তার (collective thinking) ফলশ্রুতি ; তাদের ভিত্তি জনসাধারণের যুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা। যুগ-যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ করে মানুষ যে সত্য উপলব্ধি করেছে তাই সে প্রকাশ করেছে প্রবাদ-প্রবচনের আকারে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে মুখে মুখে প্রবাদগুলি চলে এসেছে, কেউ কেউ তাদের রূপ বদলেছে, নতুন নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তারপর মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর তারা লিপিবদ্ধ হয়ে লোকসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আজও নতুন নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি ধীরে ধীরে প্রবাদের মর্যাদা অর্জন করছে, কত অখ্যাত মননশীল মানুষের উক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে তাদের নিজস্ব আবেষ্টনীর সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রবাদে পরিণত হয়ে চলেছে কেউ তার খোঁজ রাখছে না।

The Oxford Dictionary of English Proverbs এবং The Oxford Dictionary of Quotations প্রবাদ-প্রবচনের দুটি মহামূল্য সংকলন গ্রন্থ। বিচিত্র বিষয়ের ওপর অজস্র প্রবাদ ও প্রবচনের এই সংগ্রহ ও সমন্বয়চেষ্টা শুধু প্রশংসার্হ নয়, রীতিমত বিস্ময়করও। বর্তমান নিবন্ধে শিশু সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদ ও প্রবচন এই দুটি গ্রন্থ থেকে চয়ন করে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য সুস্পষ্ট। তুলনীয় কিছু কিছু বাংলা প্রবাদেরও উল্লেখ করেছি।

মনোবিদগণ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে সত্য আবিষ্কার করেছেন

প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে তারই প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের প্রধান কারণ প্রবাদ-প্রবচনগুলি হঠাৎ গড়ে ওঠেনি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতেই, অর্থাৎ সুদীর্ঘ সযত্ন পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পুনঃ-পুনঃ পরখ (verification)-এর ভিত্তিতেই তাদের সৃষ্টি।

সত্যিকারের ভালবাসার অনুভূতি আপন সন্তানকে কেন্দ্র করেই মানুষ লাভ করতে পারে। পশু-পাখী মানুষের ভালবাসা পুরোপুরি বুঝতে পারে না, যতটুকু বোঝে তাও প্রকাশ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া ভালবাসার সার্থক বিনিময় সমগোত্রের মধ্যেই সম্ভব। বড়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। তাই দুজন বয়স্ক ব্যক্তির ভালবাসা সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ হওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে শিশুর রমণীয় নির্ভরতা, বিশেষ করে আপন সন্তানটির ক্ষেত্রে, তার প্রতি বড়দের ভালবাসাকে উৎসারিত করে। মাতাপিতার ভালবাসা শিশু স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অজস্র ভালবাসা দিয়ে তাঁদের নন্দিত করে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রকৃত ভালবাসা যে কী তা আমরা বুঝতে পারি। তাই বলা হয়েছে—He that has no children knows not what is love. এই কথাটিই আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নীচের প্রবচনটিতে।

So for the mother's sake the child was dear, And dearer was the mother for the child. বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে।

নারীর সার্থকতা মাতৃত্বে। যে নারীর কোলে শিশু আসেনি তার নারীত্ব নিষ্ফল। তেমনি মায়ের কোলে শিশুকে যেমন সুন্দর লাগে আর কোথাও তেমনটি লাগে না। তাই সঞ্জীবচন্দ্রের এই উক্তিটি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

মাতাপিতার ভালবাসা শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এই ভালবাসা যদি অন্ধ হয়, যদি অসংযত হয়, তাহলে তা শিশুর চরিত্রে নানারকম অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে তাকে বিপথগামী করবে, এমনকি কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হতে পারে। A child may have

too much of his mother's blessing (Mothers are oftentimes too tender and fond of their children who are ruined and spoiled by their cockering and indulgence); Love is a boy, by poets styl'd, then spare the rod, and spoil the child এবং Go practise if you please with men and women : leave a child alone for Christ's particular love's sake! So I say—এই ধরনের প্রবাদ-প্রবচনগুলির এটাই মূল বক্তব্য : শিব গড়তে বাঁদর—এই বাংলা প্রবাদটির অর্থও তা-ই।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বর্তমানের মধ্যেই নিহিত থাকে। সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে ভবিষ্যতে সে কেমন হবে তার আভাস পাওয়া যায়। শিশুকে ঠিক ঠিক মতো পরিচালনা করতে হলে তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে! The child is father of the man; the childhood shows the man, as morning shows the day, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু পরিচালনার গুরুত্বের ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছে। উঠন্তি মূলো পত্তনিতেই চেনা যায়—একটি তুলনীয় বাংলা প্রবচন।

শৈশবকালই অভ্যাস গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল সময়। এই সময় মনটি থাকে কোমল, সংবেদনশীল, এবং গ্রহণক্ষম। তার বিচারশক্তি অপরিপক্ব বলেই শিশু যেসব বয়স্কদের ভালবাসে তাঁদের নির্দেশ নির্বিবাদে মেনে চলবার চেষ্টা করে। তাই বড়দের উচিত এই সময়েই শিশুদের মধ্যে উপযুক্ত অভ্যাস এবং মনোভঙ্গির সৃষ্টি করা। শৈশবে মানুষ যে রকম শিক্ষালাভ করে জীবনভর তার প্রভাব থেকে যায়। এই জন্যই মনঃসমীক্ষকগণ জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্যের "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি"—উপদেশটির তাৎপর্যও তা-ই। Give me a child for the first seven years, and you may do what you like with him afterwards এবং Train up a child in the way he should go : and when he is old, he will not depart from it—এ দুটি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও আমরা সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

Children pick up words as pigeons peas, and utter them again as God shall please—এই প্রবাদটির মধ্যে শিশুর বিস্ময়কর

অনুকরণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। শিশু বড়দের অনুকরণ করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শুধু ভাষাই শিক্ষা করেনা ; আচার-আচরণ, হাব-ভাব, চিন্তার ধরণ-ধারণ প্রায় সব কিছুই আয়ত্ত করে থাকে। সুতরাং শিশুর সামনে বড়দের সুন্দর আচরণ করে উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। তাই বলে—আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়। ইংরাজিতে বলা হয়—Example is better than precept. সুতরাং শিশুর সঙ্গে বড়দের আচরণ যথেষ্ট সংযত ও সুন্দর হওয়া দরকার।

আগেকার প্রবাদটির অন্যতম তাৎপর্যটি হলো শিশুর সরলতা। সে যা শোনে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করবার ক্ষমতা তার থাকে না বলে সহজেই তা প্রকাশ করে ফেলে। সুতরাং শিশুদের সম্মুখে গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা করা সঙ্গত নয়। What children hear at home soon flies abroad এবং Children and fools cannot lie- এই দুটি প্রবাদ বাক্যের বক্তব্যটিও অনুরূপ।

শিশু সদানন্দময়। সামান্য জিনিসেই সে তৃপ্ত। Children and fools have merry lives ; Behold the child, by nature's kind law, pleased with a rattle, tickled with a straw, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু-চরিত্রের এই সহজ সন্তুষ্টির দিকটাই তুলে ধরেছে।

When children stand quiet, they must have done some ill—এই প্রবাদটির মধ্যে শিশুর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও অবিরল চঞ্চলতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শিশু এক মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তার মধ্যে বিকচমান অজস্র প্রেরণা তাকে সর্বদা চঞ্চল করে রাখে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখলেই বুঝতে হবে সে নিশ্চয়ই কোন একটা নিষিদ্ধ কর্ম করে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে কিংবা কোন একটা মতলব ভাঁজছে।

Around the child bend all three sweet graces ; Faith, Hope, Charity.

Around the man bend other faces, Pride, Envy, Malice, are his graces—শিশু সহজে বিশ্বাস করে, আশা পোষণ করে ; তার আসক্তি কম, তাই এ মুহূর্তে যে বস্তুটার জন্য সে ব্যাকুল, পর মুহূর্তেই সেটার প্রতি তার মোহ আর থাকেনা। সে যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে অহমিকা, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিস্তার ঘটে, কিন্তু সরলতা হ্রাস পায়। তাই বলা হয়—In wit a man; simplicity a child.

কবির কথায়—আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ।

বড়দের আবেগ-জীবনে শিশুদের স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সান্নিধ্য আমাদের মনের গুরুভার লাঘব করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনে। Home they brought their warrior dead কবিতায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে কীর্তিত হয়েছে। মৃত যোদ্ধাকে দেখে শোকাকুলা পত্নী যখন বেদনায় নিস্পন্দ, নির্বাক তখন একমাত্র আপন সন্তানকে দেখেই অজস্র অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর মনের সহজ অবস্থা। তাই একটি প্রবচনে বলা হয়েছে— n sorrow thou shalt bring forth children.

"ভাবি যা হারিয়ে গেছে হারায়নি তা"—যে শৈশব আমরা দূর অতীতে ফেলে এসেছি তার প্রভাব, তার সুখ-স্মৃতি আজও আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই কবি বলেছেন—

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky;
So it was when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die!

শৈশব-স্মৃতি, শৈশবের রুচি, শৈশবের সুখ সারা জীবনের অমূল্য সম্পদ; আমাদের অবকাশ মুহূর্তগুলিকে, আমাদের একান্ত নিজস্ব দুনিয়াটিকে তারা মধুময় করে রাখে। তাই শৈশবকে আমরা ভুলতে চাইনা, ভুলতে পারি না। বলি—শরীর বুড়ো হয়, মন তো বুড়ো হয় না।

আজকের সদা চঞ্চল আনন্দময় শিশুটি কালক্রমে বড় হয়ে জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হবে একথা চিন্তা করে কবির আক্ষেপের আর অন্ত নেই। ব্যথিত চিত্তে তাই তিনি খেদোক্তি করেছেন—

Child of a day, thou knowest not
The tears that overflow thy urn.

কিন্তু সব কিছুরই ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে মাতা-পিতার আনন্দ বিস্তার লাভ করে যেমন, তেমনি স্নেহান্ধ মাতা-পিতার প্রশ্রয় লাভ করে শিশু যখন বড় হয়ে বদমেজাজী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন মাতা-পিতার দুর্ভোগের আর লেখা-জোখা থাকে না। এই রকম অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে একটি প্রবাদের—Children when they are young make parents fools, when they are great they make them mad. অতএব সন্তান-লালনে সতর্কতার প্রয়োজন খুব বেশী।